ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২২ (১৪২১ বঙ্গাব্দ)

মোঃ সাদেকুজ্জামান, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান
উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র
মোঃ রেজাউল করিম
প্রত্ননগর মাহীসন্তোষ : উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি
সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার: উদ্দেশ্য ও ফলাফল
মোঃ মাহমুদ আলম
বাচনিক ইতিহাস: প্রত্যয়, প্রকৃতি ও প্রয়োগ
সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
আইনসভার ভেতরে-বাইরে রাজনীতি ও চিত্তরঞ্জন দাশ
জি. এম. মনিরুজ্জামান
বাংলাদেশের ত্রিপুরা : ধর্মাচার ও সংস্কৃতি
মোঃ আবদুল মজিদ
ফররুখ আহমদ-এর কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী'
মোঃ মোরশেদুল আলম
সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ
শামীম আরা
মমতাজউদদীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধের নাটক
নূর-ই এলিস আকতার জাহান
বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চরিত্র

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২২ (১৪২১ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
এম মোস্তফা কামাল

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (বাংলা), সংখ্যা ২২ (১৪২১ বঙ্গাব্দ)
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ২০১৬

প্রকাশক
মোঃ জিয়াউল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Journal of the Institute of Bangladesh Studies (Bangla), volume 22 (1421 bs). Edited by Swarochish Sarker, director of the Institute of Bangladesh Studies. Published by Md. Ziaul Alam, Secretary of the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Bangladesh. Published in April 2016. Price: Tk 200, US $ 10

ISSN 1561-798X

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
অধ্যাপক ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাহী সম্পাদক
এম মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য
সনৎ কুমার সাহা
অধ্যাপক (অবঃ), অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নুরুল হোসেন চৌধুরী
অধ্যাপক (অবঃ), ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ কে এম আব্দুল মজিদ
অধ্যাপক, ফাইন্যান্স বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নুল আবেদীন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কামরুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
বাংলাদেশ ৬২০৫

ফোন: ০৭২১-৭৫০৭৮৫
ফ্যাক্স: ০৭২১-৭১১১৮৫
ই-মেইল: jibs@ru.ac.bd

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ ছাপা হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে;
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে;
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে;
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান অনুযায়ী, তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;
- শিকাগো শৈলী অনুযায়ী প্রবন্ধের তথ্যনির্দেশ পাদটীকায় প্রদান করতে হবে; এবং
- প্রবন্ধের পরিসর ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকের ঠিকানায় প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি এবং jibs@ru.ac.bd ই-মেইলে একটি সফ্‌ট কপি জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে 'বিজয়' সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman। প্রবন্ধের আখ্যাপত্রে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোঃ সাদেকুজ্জামান, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ৭
উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র: প্রকরণ ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য

মোঃ রেজাউল করিম ৩৫
প্রত্ননগর মাহীসন্তোষ : উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি

সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী ৫৫
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব

মোহাম্মদ নাজিমুল হক ৬৯
মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার: উদ্দেশ্য ও ফলাফল

মোঃ মাহমুদ আলম ৮১
বাচনিক ইতিহাস: প্রত্যয়, প্রকৃতি ও প্রয়োগ

সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ৯৫
আইনসভার ভেতরে-বাইরে রাজনীতি ও চিত্তরঞ্জন দাশ

জি. এম. মনিরুজ্জামান ১০১
বাংলাদেশের ত্রিপুরা : ধর্মাচার ও সংস্কৃতি

মোঃ আবদুল মজিদ ১২১
ফররুখ আহমদ-এর কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী': একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোরশেদুল আলম ১৪৭
সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

শামীম আরা ১৬১
মমতাজউদদীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধের নাটক : প্রতিবাদী চেতনার শিল্পিত প্রকাশ

নূর-ই এলিস আকতার জাহান ১৭৩
বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চরিত্র

উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র: প্রকরণ ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য

মোঃ সাদেকুজ্জামান, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান*

Abstract: The use of pottery began in the history of human civilization in the era of Neolithic settlement. Pottery has occupied a very significant place in the continuation of culture and history in case of art work. The aim of this research paper is to make systematic analysis of the typology, the morphological aspects of the typology and technological features in the discovered sample of the pottery at *Wari-Bateshwar* excavation site. The purpose of this paper is to show that the universalism of the pottery samples found in the different archaeological sites caries significance for archaeological researches. The researcher tried to collect and include huge information about the typology of pottery assemblage and the morphological features of sample discovered at *Wari-Bateshwar* excavation site through the documentation of the pottery's sample in the lab observation, and, typological, morphological and technological features through primary analysis that may provide important directions or ways for further investigations in this particular field.

ভূমিকা

মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও শিল্পকর্মের ইতিহাসে মৃৎপাত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নবোপলীয় স্থায়ী বসতির যুগে মৃৎপাত্রের সূত্রপাত। মৃৎপাত্র নির্মাণ ঐতিহ্যগতভাবেই স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সাথে জড়িত এবং যাযাবর জীবনের তুলনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার মাত্রা মৃৎপাত্র উৎপাদনের প্রত্যক্ষ সহায়ক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।[১] মৃৎপাত্রের মূল উপাদান কাদামাটি। কাদামাটিকে বিশেষ আকার দিয়ে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে আগুনে পোড়ানো হয়। কাদামাটির তাপরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে তাপ প্রয়োগে খাদ্য সিদ্ধ ও প্রস্তুত সহজতর হওয়ায় মানুষ মৃৎপাত্র তৈরি ও ব্যবহার শুরু করে। তাছাড়া মৃৎপাত্রে তৈরি খাদ্য অধিক হজমযোগ্য ও রুচিকর হয়। কিছু উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্যের বিষক্রিয়া মুক্ত করতে এগুলোকে মাটির পাত্রে সিদ্ধ করে রান্না করা হয়, যা অধিক নিরাপদ। এছাড়া মৃৎপাত্রে তরল জিনিস বা শস্য জাতীয় দ্রব্য সংরক্ষণ করা সহজ। মানব

---

* মোঃ সাদেকুজ্জামান, প্রভাষক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Dean E. Arnold, *Ceramic Theory & Cultural Process* (Cambridge: Cambridge University press, 1985).

জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহারের কারণেই মৃৎশিল্পের উদ্ভব ঘটেছে।[২] জাপানের জুমন সংস্কৃতিতে প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইরাকের জারগস সংস্কৃতিতে ৬ষ্ঠ সহস্রাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগ মতান্তরে ৭৫০০-৬৩০০ খ্রিস্টপূর্বে মৃৎপাত্র উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়।[৩] ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাক-হরপ্পা যুগে নবোপলীয় মৃৎপাত্র তৈরির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলায় মৃৎপাত্র নির্মাণ এক বিশেষ শিল্পকর্ম হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের মাটি মৃৎপাত্র তৈরির জন্য উৎকৃষ্ট। নদীমাতৃক বাংলার ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণে প্রস্তরের দুষ্প্রাপ্যতা থাকলেও পলিমাটির রয়েছে অফুরান সম্ভার। যৌক্তিক কারণে এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা মৃৎপাত্র তৈরিতে প্রকৃতির এই সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়েছে। কাঁচামালের সহজলভ্যতা ছাড়াও কাদামাটির নমনীয়তা প্রাচীনকাল থেকে মৃৎশিল্প বিকাশে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশের উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়, ভাসুবিহার, রাজা হরিশচন্দ্রের বাড়ি, শালবন বিহার, পাহাড়পুর প্রভৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নস্থান পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষদল, ভরতপুর, মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, বাণগড়, রাজবাড়িডাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নস্থান থেকে অনেক ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন, কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, রুলেটেড মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, অ্যামফোরা, ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র প্রভৃতি।[৪]

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র নমুনার সর্বব্যাপিতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বিধায় মৃৎপাত্র বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় কালানুক্রম নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে অতীত মানুষের অর্থনৈতিক সংগঠন, উৎপাদন কৌশল, জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করে। সে কারণেই আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় মৃৎপাত্রের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মৃৎপাত্রের গুরুত্ব অতীতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুভূত হলেও প্রত্নতত্ত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীত মানুষের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতাকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তথা অতীত মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের গুরুত্ব বেশি অনুভূত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মৃৎপাত্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। মৃৎপাত্র অধ্যয়নে বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডীয় পর্ব অনুসারে মৃৎপাত্র বিশ্লেষণ শিল্প ঐতিহাসিক (Art historical), প্রকারতাত্ত্বিক (Typological) পর্যায় পেরিয়ে প্রেক্ষিতগত পর্বে এসে পৌঁছেছে, ফলে আধুনিক মৃৎপাত্র বিশ্লেষণে গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় জাতিপ্রত্নতাত্ত্বিক (Ethnoarchaeological) গবেষণার মাধ্যমে মৃৎপাত্রের প্রস্তুতপ্রণালী, মৃৎপাত্রের ক্রিয়াকলাপ, শ্রমবিভাজন, সামাজিক সংগঠন, মৃৎপাত্র উৎপাদন ও বিপণনের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও স্থানিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা যায়।[৫] বর্তমানে জাতিপ্রত্নতত্ত্বের একটি উপভাগ হিসেবে সিরামিক

---

[২] Ibid.

[৩] M. Prudence Rice, *Pottery Analysis* (Chicago: University of Chicago press, 1987); G. Clark, *World Prehistory in New Perspective* (Cambridge: Cambridge University press, 1989); Ashok Datta, *Black-&-Red Ware Culture in West Bengal* (Delhi, 1995).

[৪] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, "মৃৎপাত্র," *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭)।

[৫] C. Kramer, "Pots and People," *Bebliotheca Mesopotemica* (1977), vol .7, pp. 77-91.

জাতিপ্রত্নতত্ত্ব পরিগণিত হতে শুরু করেছে।[৬]

আদি-ঐতিহাসিক সময়পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান উয়ারী-বটেশ্বর। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণার মাধ্যমে দ্বিতীয় নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এ প্রত্নস্থানটির সাথে ভারতীয় অন্যান্য আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থান, রোমান সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।[৭] এই প্রত্নস্থান থেকে আদি-ঐতিহাসিক সময়পর্বের বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যায় মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা ভূখণ্ডে মৃৎপাত্র গবেষণার ইতিহাস অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের এবং এ বিষয়ক বিস্তারিত গবেষণা খুব বেশি সম্পাদিত হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে, উয়ারী-বটেশ্বরসহ অন্যান্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র নমুনার উপর সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ একটি প্রাথমিক গবেষণা পরিচালনা করেন। এ গবেষণায় প্রথাগতভাবে মৃৎপাত্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, মৃৎপাত্র নমুনার বর্ণনা, শৈল্পিক, নান্দনিক, ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিককালে অধিকাংশ মৃৎপাত্র গবেষণাতেই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, শ্রেণীকরণ, অলংকরণ ও গাঠনিক বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণার লক্ষ্যসমূহ

কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মকে পরিচালনা করা হয়েছে; লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থানে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র নমুনার আকৃতি ও নির্মাণ কৌশলের উপর ভিত্তি করে সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়করণ এবং মৃৎপাত্র শ্রেণীকরণ।

২. উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থানে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রধারার সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি ও তুলনামূলক কাল নিরূপণ।

গবেষণা এলাকার অবস্থান

উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব ইউনিয়নের অন্তর্গত দুটি প্রতিবেশী গ্রাম। বেলাব উপজেলা সদর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই গ্রামদ্বয় অবস্থিত। উয়ারী-বটেশ্বর গবেষণা এলাকাটি যথাক্রমে ২০° ০৫′ ৪৬″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০° ৪৯′ ৪২″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৪° ০৫′ ৩৪″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০° ৪৯′ ৪০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৫০টি প্রত্নস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষণা অঞ্চলের বেশিরভাগ প্রত্নবস্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার, স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুঁতি, কাচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, ছাপাঙ্কিত রোপ্যমুদ্রা, লৌহনির্মিত প্রত্নবস্তু, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, ইটের স্থাপত্য, রাস্তা প্রভৃতি। মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে মুখ্য নমুনাসমূহ হলো কৃষ্ণ-ও-রক্তিম মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, রুলেটেড মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, ধূসর মৃৎপাত্র, ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র। উয়ারী-বটেশ্বর এবং সংলগ্ন সোনারুতলা, রাইঙ্গারটেক, আলগারটেক, পুবেরটেক, কান্দুয়া, টঙ্গীরটেক, পোড়াদিয়া, কামরাব, কুমারটেক, জানখাঁরটেক, মন্দিরভিটা ও মরজাল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। এছাড়া বেলাব, শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী ও পলাশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে একই প্রকৃতির প্রত্নবস্তু অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

---

[৬] M. T. Stark, "Current Issues in Ceramic Ethnoarchaeology," *Journal of Archaeological Research,* vol 11, 2003, p. 202.

[৭] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, "উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত কাচের পুঁতি: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা," *প্রত্নতত্ত্ব* (ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩)।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্ননিদর্শনের আধিক্যের কারণে এবং এর সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী প্রত্নস্থান সহকারে এ প্রত্নাঞ্চলকে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত সকল মৃৎপাত্র নমুনা 'প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখনন: উয়ারী-বটেশ্বর ২০০৪-০৫' এ উয়ারী-বটেশ্বর গড়ের ভিতরের দিকে বসতির ধরন ও বিস্তার অনুধাবনের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে উৎখননকৃত টেঞ্চ$_2$ থেকে প্রাপ্ত। মৃৎপাত্র নমুনা বিশ্লেষণের সময় উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি এবং আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য যা উৎখননের সময় প্রত্নস্থান গঠন প্রক্রিয়া এবং তথ্য সংগ্রহ ব্যাহত করতে পারে তা বিবেচনায় রেখে শ্রেণীকরণের একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

নথিবদ্ধকরণ

নথিবদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে মৃৎপাত্রের নমুনাসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা, শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্রের নমুনা (Diagnostic) যার অন্তর্গত হলো মৃৎপাত্রের বৃত্তাকার প্রান্ত (Rim) , গলা (Neck), দেহ (Body) এবং ভিত্তি তলদেশ (Base) এবং শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন মৃৎপাত্রের নমুনা (Un-diagnostic)। এই নথিবদ্ধকরণ মৃৎপাত্রের আকৃতির তুলনামূলক প্রাচুর্য সন্ধানে সহায়তা করে। এই শ্রেণীবিভাজন বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত/আবিষ্কৃত প্রত্যেক শ্রেণীর মৃৎপাত্র নমুনার নির্মাণ পদ্ধতির উপরও নির্ভরশীল। বর্তমান গবেষণাকে অধিকতর সহজ করার উদ্দেশ্যে সকল শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্রের নমুনাকে একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রত্নস্থানে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশে পদ্ধতিগত গবেষণার মূল তথ্যভান্ডার গঠিত হয়। গবেষণায় পর্যবেক্ষণকৃত মৃৎপাত্রের মোট নমুনার সংখ্যা ১৪৫৮টি। এগুলোর মধ্যে শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত নমুনা ১২৫৮টি এবং শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন নমুনা ২০০টি। বিশ্লেষণমূলক ১২৫৮টি নমুনার প্রত্যেকটি যথাযথভাবে গবেষণাগারে পর্যবেক্ষণ করে সকল তথ্যাবলি তথ্য তালিকায় নথিভুক্ত করা হয় (সাদেকুজ্জামান ২০০৫)।[৮] বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র নমুনাসমূহকে প্রকরণ, প্রকরণের অঙ্গসংস্থানিক ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করা।

নিম্নে প্রদত্ত তথ্য উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৃৎপাত্রের শ্রেণীকরণ এবং এর অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

প্রাথমিক শ্রেণীকরণ

সম্পূর্ণ প্রত্নসন্নিবেশটিকে প্রথমে স্থানিক বিবেচনায় অর্থাৎ প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে পর্যায়করণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ, স্তর ও গর্ত বসতি বিবেচনায় আনা হয়। উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত পাত্র, লাল মসৃণ মৃৎপাত্র, ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র, ধূসর রঙের মৃৎপাত্র ধারার সাথে সামান্য সংখ্যায় কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, রুলেটেড মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। শ্রেণীকরণের এ পর্যায়ে এদের সকলকেই পৃথক শ্রেণীতে বিভাজিত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের সাধারণ অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, বর্ণ, অলংকরণ এবং পৃষ্ঠদেশের কারুকার্য প্রভৃতি মৃৎপাত্র শ্রেণীকরণের নির্ণায়ক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[৮] সাদেকুজ্জামান, উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র : একটি প্রাথমিক উৎসনির্ভর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, এমএ থিসিস, অপ্রকাশিত (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০৫)।

শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন মৃৎপাত্রের শ্রেণীকরণ

মৃৎপাত্র সন্নিবেশের নমুনা সমূহকে শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন এই দুই মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্র চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত মৃৎপাত্রের বৃত্তাকার প্রান্ত, গলা, দেহ এবং ভিত্তি তলদেশকে বিবেচনায় আনা হয়, যা থেকে পাত্রটিকে হাড়ি, বাটি, গামলা, থালা, বয়েম/গোলাকার দীর্ঘ পাত্রবিশেষ, পুষ্পাধার, কলস/তরল পদার্থের পাত্র, ধারকযুক্ত পাত্র; যথা, থামের-উপর-থালা ও থামের-উপর-বাটি হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব। যে সকল মৃৎপাত্রের নমুনা উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করতে পারে না তাদের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন নমুনা শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়। উভয় শ্রেণীতে আবার বর্ণ, অলংকরণ এবং পৃষ্ঠদেশ-কারুকার্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়। যেসব মৃৎপাত্রের নমুনা থেকে পাত্রের আকৃতি, অলংকার ও পৃষ্ঠ সম্পর্কে জানা যায় তা শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে।

শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্রের অঙ্গসংস্থানিক ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

গবেষণার এ পর্যায়ে মৃৎপাত্রের বিশ্লেষণমূলক নমুনাসমূহকে পরীক্ষা করা হয়। এসকল বিশ্লেষণমূলক নমুনা পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধারার মৃৎপাত্র এর পৌনঃপুনিকতা, শ্রেণী, ব্যাস, কাঠিন্য, মর্মবস্তু, পুরুত্ব এবং পৃষ্ঠদেশ কারুকার্য চিহ্নিত করা হয় এবং এ অনুসারে শ্রেণীকরণ করে একত্রিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, গবেষণাকালীন সময়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মৃৎপাত্র যেমন – কৃষ্ণ-এবং-রক্তিম মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, রুলেটেড মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র এবং অন্যান্য বিশ্লেষণধর্মী নমুনার মধ্যে যেগুলো বড়ো আকারের ও আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণযোগ্য সে সবের উপর বিশদ পরীক্ষা চালানো হয়।

শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্রের নমুনা পরীক্ষায় মূলত অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা চালানো হয়। এ গবেষণায় নমুনার আকৃতি, ব্যাস, উচ্চতা, বৃত্তাকার প্রান্তের বৈশিষ্ট্য, পাত্রের গলা ও দেহ এবং ভিত্তি তলদেশ বিবেচনা করা হয়। সাধারণত আঙ্গিকভাবে একটি পাত্রের বৃত্তাকার প্রান্ত, গলা, কাঁধ, দেহ ও তলদেশের চারটি বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায় এগুলো হলো প্রান্ত (End point), কৌণিক প্রান্ত (Corner point), স্ফীত মাত্রা (Vertical tangency) এবং বক্র প্রান্ত (Inflection point)। একটি পাত্রের Lip-কে 'End point' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেখানে পাত্রের ঢাল সূক্ষ্মভাবে বাঁক নেয় সে অংশকে 'Corner point' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কৌণিক প্রান্তের অপর নাম 'Carination'। যে অংশে পাত্রের ঢাল উলম্ব মাত্রায় থাকে সে অংশে পাত্রের ব্যাস সর্বোচ্চ হয়। পাত্রের এ অংশকে 'Point of vertical tangency' বলা হয়। যে অংশে পাত্রের বাঁক অবতল থাকে সে অংশেকে 'Inflection point' বলা হয়।

এছাড়া নমুনার প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য যথা, নির্মাণ কৌশল, পৃষ্ঠবর্ণ, পৃষ্ঠভাগের কারুকার্য, অভ্যন্তরীণ গঠন, ভগ্নাংশের প্রকৃতি ও বিন্যাস, পৃষ্ঠদেশের মসৃণতা, উজ্জ্বলতা, বুনন, গ্রন্থন, অগ্নিদগ্ধকরণ, মৃৎপাত্রের core-এর বুনন বিন্যাস ও ভগ্ন প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়।

পরিমাপ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলি

তথ্য তালিকায় পরিমাপযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে বৃত্তাকার অংশের ব্যাস (Rim Diametre), পাত্রের উচ্চতা এবং ভিত্তি তলদেশ বিবেচনা করা হয়। একটি ব্যাস সারণি (Diametre Chart) ব্যবহার করে বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ও ভিত্তি তলদেশ পরিমাপ করা হয়। এই ব্যাস বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বৃত্তাকার অংশ থেকে পাত্রের সম্পূর্ণ আকার

অনুধাবন করা যায়। অপরপক্ষে নমুনার উচ্চতাও বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে নির্ণয় করা হয়। এই নির্ণয়কৃত উচ্চতার সাহায্যেও ঐ পাত্রের আকার ও আকৃতি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব।

স্কেচ ১
মৃৎপাত্রের বিভিন্ন অংশ

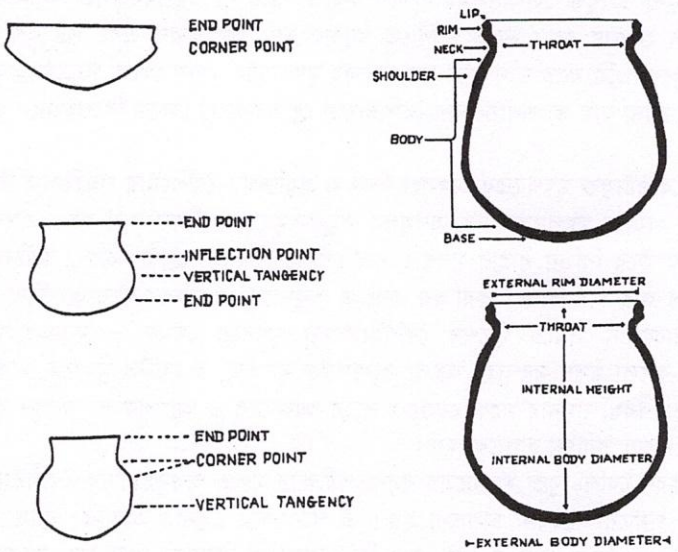

পৃষ্ঠভাগের কারুকার্যকরণ ও মসৃণকরণ

মৃৎপাত্রের পৃষ্ঠদেশ কারুকার্যকরণ বা পৃষ্ঠদেশ মসৃণকরণ পাত্রের নির্মাণ প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক অংশ। নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরেই কাদা নরম থাকা অবস্থায় পৃষ্ঠদেশে কারুকার্য সম্পাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পাত্রটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়। প্রায়োগিক অথবা সজ্জাকরণ যে উদ্দেশ্যেই মৃৎপাত্র নির্মাণ করা হোক না কেন প্রায়শই উভয় ক্ষেত্রেই এর পৃষ্ঠদেশ কারুকার্য করা হয় (Dales and Kenoer 1986)।[৯] এ পর্যায়ে মৃৎপাত্রের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পৃষ্ঠদেশের কারুকার্য নথিভূক্ত করা হয়। উন্নতমানের কাদার প্রলেপ/পাতলা স্তর (প্রকৃতপক্ষে পানি মিশ্রিত কাদার আস্তরণ) যা মৃৎপাত্রের মসৃণকরণ প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে পৃষ্ঠদেশের বর্ণ ও বুনন উন্নত করে।[১০] মসৃণকরণ প্রলেপ ঐ পাত্রের সরন্ধ্রতা হ্রাস করে।

---

[৯] George F. Dales and Jonathan M. Kenoyer, *Excavation at Mohenjo Dara* (Pakistan: The Pottery, USA, University of Pensylvania Museum, 1986)

[10] Anna O Shepard, *Ceramics for the Archaeologist* (Washington D.C, Carnegic Institution of Washington, 1956).

মৃৎপাত্রের আকৃতি অঙ্কন

গবেষণায় অধিকাংশ মৃৎপাত্রের বৃত্তাকার প্রান্ত (Rim) এর চিত্র অঙ্কন করা হয়। বৃত্তাকার প্রান্ত এবং ভিত্তি তলদেশ এর অঙ্কিত চিত্র মৃৎপাত্রের আংশিক বা সম্পূর্ণ আকৃতি পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া মৃৎপাত্রের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের বৃত্তাকার প্রান্ত এক-কেন্দ্র এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যাস বিশিষ্ট একাধিক বৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত মানচিত্রের উপর বসিয়ে একটি ভেঙে যাওয়া মৃৎপাত্রের আকার ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক বিশেষ আকৃতির অলংকৃত মৃৎপাত্রের নমুনা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয় কেননা মৃৎপাত্রের ভিন্নতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে এবং একই সাথে অলংকরণ ধারাসমূহও বিনির্মাণে সহায়ক হবে। মৃৎপাত্রের শ্রেণীকরণ এবং মৃৎপাত্র নমুনার চিত্র অঙ্কন সমাপ্ত করণের মাধ্যমে উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ হতে আবিষ্কৃত আদি-ঐতিহাসিক পর্বের মৃৎপাত্র ধারার অঙ্গসংস্থানিক শ্রেণীকরণ সমাপ্ত হয়।

মৃৎপাত্র ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজন

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে মূখ্য নমুনাসমূহ হলো কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, নব্যুক্ত মৃৎপাত্র, স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্র, চিত্রিত মৃৎপাত্র, লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, ফ্যাকাশ লাল মৃৎপাত্র, ধূসর মৃৎপাত্র, মোটা অমসৃণ লাল মৃৎপাত্র।

আলোকচিত্র ১

ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্রের নমুনা

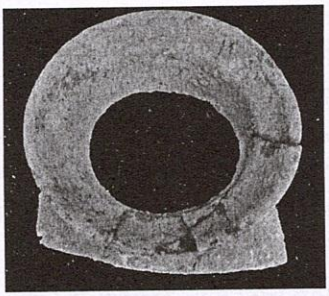

কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে টেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকে মৃৎপাত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তাকার প্রান্তসহ গলা ও কিছু ভগ্নাংশকে কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ০.৭৯ শতাংশ (সারণি ১০)। কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলির অভ্যন্তর-ভাগ এবং বহির্দেশের উপরের অংশ কালো এবং বহির্দেশের অবশিষ্ট অংশের রং লাল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, বিশেষ ধরনের চুল্লিতে পোড়ানোর ফলে মৃৎপাত্রের রং এরকম হয়েছে। অনেক অবশ্য দু-বার পোড়ানোর কথাও বলেন। কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সাধারণত চাকার মাধ্যমে তৈরি, তবে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে কিছু সংখ্যক হাতে তৈরি নমুনা

পাওয়া গিয়েছে। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের বুনন মাঝারি মানের। তবে আদি ও শেষ পার্যায়ে কিছু সংখ্যক নিম্ন মানের কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র পরিলক্ষিত হয়।

কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সংস্কৃতি তাম্র-প্রস্তর যুগ থেকে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পরবর্তী যুগ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উপমহাদেশে বিকাশ লাভ করেছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ১০৫টি প্রত্নস্থানে এবং উয়ারী-বটেশ্বরে সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক খননে কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরম তারিখ (Absolute dating) ও স্তরবিন্যাস থেকে জানা যায়, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাত্রা শুরু করে কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র তাম্র প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে ঐতিহাসিক যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও সীমিত আকারে প্রচলিত ছিল (রহমান ও পাঠান ২০১২)।[১১] পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবোপলীয় সংস্কৃতি কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সমসাময়িক। কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সংস্কৃতি পর্বে পশ্চিমবঙ্গে সীমিত পরিমাণে তামার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তবে অনুমান করা হয়, তামা গলানোর পদ্ধতির সাথে এ অঞ্চলের মানুষ পরিচিত ছিল না। পক্ষান্তরে লোহার হরেক রকম প্রত্নবস্তু দেখে মনে হয় যে, কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র সংস্কৃতি পর্বের অধিবাসীরা লোহা গলানোর পদ্ধতির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত ছিল।[১২]

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে টেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকেবেশ কিছু নমুনাকে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ১৪.৭৯ শতাংশ (সারণি ১০)। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য হলো মৃৎপাত্রের বনুন সাধারণত সূক্ষ্ম ও পাতলা হয়। এটি তৈরির সময় মাটিকে ভালোভাবে মথিত করা হতো, পান (temparing) উপাদান কম থাকলেও এটি আকর্ষণীয় উজ্জ্বল হয়। পাত্রের মজ্জা কালো থেকে ধূসর রঙের হয়, তবে লালচে রঙও অনুপস্থিত নয়। যদিও ৯০ শতাংশ উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের রঙ জমকালো এবং বাদামি কালো, ১০ শতাংশের রঙ নীল, গোলাপি, রূপালি, সোনালি, বাদামি, চকলেট, বেগুনি ও গাঢ় লাল। প্রায় সবই একবর্ণিল মৃৎপাত্র, তবে দ্বিবর্ণিলও পরিলক্ষিত হয়। দুটি রঙের সমাহার ছাড়া দ্বিবর্ণিল মৃৎপাত্রগুলোর সঙ্গে একবর্ণিল মৃৎপাত্রের কোনো পার্থক্য নেই; যেমন: গাঢ় নীল ও গাঢ় লাল, ধূসর ও হালকা লাল, কালো ও গাঢ় বাদামি, কালো ও বাদামি কালো, ফ্যাকাশে লাল এবং কালো ধূসর। মৃৎপাত্রগুলো সাধারণত নকশাহীন, তবে কখনও কখনও রঙিন নকশা পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রে রঙের নকশা ছাড়া খোদাই করা নকশা ও গ্রাফিটি দাগও দেখা যায়। (রহমান ও পাঠান ২০১২)।[১৩]

উয়ারী বাটশ্বর উৎখননে টেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র শ্রেণীতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্র যেমন- বাটি, ছোট আকৃতির পাত্র/হাড়ি, গামলা, থালা, হাড়ি, নলযুক্ত পাত্র,সুরাপাত্র (থামের উপর থালা ও থামের উপর বাটি) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ভারী ও বড় বড় পাত্র, যেমন সঞ্চয়-আধার প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পরিবারে অনুপস্থিত।

---

[১১] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশ, ২০১২)।

[১২] Ashok Datta, *Black-&-Red Ware Culture in West Bengal.*

[১৩] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*।

আলোকচিত্র ২

উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের নমুনা

ছোটো পাত্র

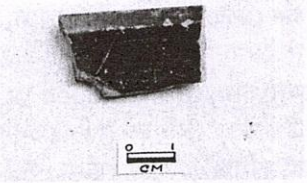

বাটি

থামের উপর থালা

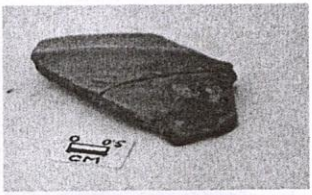

ছোটো পাত্র

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রগুলো সম্ভবত অভিজাতশ্রেণীর জন্য তৈরি, খুবই মূল্যবান ও অত্যুৎকৃষ্ট। তাই এই মৃৎপাত্রকে অনেক সময় বলা হয় 'এলিট ওয়্যার'। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের মানদণ্ডে বিচার করলে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের স্থান শুধু প্রাচীন ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ায় নয় বরং প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্রের মধ্যেও প্রতিনিধিত্বশীল। দ্রুতগতি-সম্পন্ন চাকায় ঘুরিয়ে বিশেষ ধরনের চুল্লিতে (Sagger-Kiln) অতি উচ্চ তামমাত্রা প্রয়োগ করে এবং আস্তে আস্তে ঠান্ডা করে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো বলে পণ্ডিতদের অভিমত।[১৪]

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের আয়ুষ্কালকে দুই ভাগে ভাগ করলে প্রাথমিক পর্যায়কে আনুমানিক ৭০০-৬০০ থেকে ৪০০-৩০০ এবং দ্বিতীয় পর্যায়কে আনুমানিক ৪০০-৩০০ থেকে ১০০ খ্রিস্টপূর্ব, এমনকি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ধরা হয়।[১৫] বাংলায় বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের কাল-পরিধি খুবই কম; তবে এ অঞ্চলে এই পর্যায়কে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক ধরা হয়।[১৬]

প্রাচীন বাংলায় এই মৃৎপাত্র প্রাপ্তির কেন্দ্রেগুলোর মধ্যে উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়াও মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়ও বানগড় উল্লেখযোগ্য। বিশাল এলাকাজুড়ে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের বিস্তৃতিকে পণ্ডিতেরা মৌর্য সাম্রাজ্যবাদ, বৌদ্ধধর্মের বিকাশ এবং বাণিজ্যিক পথের

---

[১৪] B. P. Sinha, "Ancinet Magadha: The Cradle of the Northern Black Polished Ware," in P. C. Pant and Vidula Jayaswal (eds), *Ancient Ceramics* (Delhi, 1997).

[১৫] T. N. Roy, *The Ganges Civlization (*New Delhi, 1983).

[১৬] S. S. M Rahman, "Recent Discovery of Northern Black Polished Ware in the Mahasthan Region of Bangladesh: An Archaeological Perspective." *Journal of Bengal Art,* 1998.

আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে নগর সংস্কৃতির সম্পর্কের কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার প্রত্নস্থানগুলোতে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে দ্বিতীয় নগরায়ণের শাসক ও বণিকশ্রেণীর ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরি হতো।[১৭]

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Black Slipped Ware)

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে টেঞ্চ৲তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকেবেশ কিছু নমুনাকে কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ৮.৭৪ শতাংশ (সারণি ১০)।

আলোকচিত্র ৩
উৎখননে প্রাপ্ত কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের

ধারকযুক্ত বাটি

বাটির ভাঙা অংশ

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে চকচকে বৈশিষ্ট্য ছাড়া। কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রে একটি পলেপ সমভাবে দেওয়া হতো। এতে কিছুটা চকচকে ভাব তৈরি হলেও উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের আলোকোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সর্বভারতীয় কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র, কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র এবং উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের স্তরে। উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়াও প্রাচীন বাংলার মহাস্থানগড়, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড়, মহিষদল ও অন্যান্য প্রত্নস্থানে প্রচুর কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। এ রকম কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র অবশ্যই উন্নত মানসম্পন্ন, কিন্তু অনেক সময় কাঁকরময় মাটি বা সঠিকভাবে পোড়ানো নয় এবং ধীরগতি-সম্পন্ন চাকায় তৈরি মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। সাধারণত কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র সুক্ষ্ম থকে মাঝারি মানের হয়ে থাকে, যা দ্রুতগতি-সম্পন্ন চাকায় তৈরি। এই মৃৎপাত্রের মজ্জার রং ধূসর। এ-জাতীয় মৃৎপাত্রের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বার্নিশ করা নমুনাও পাওয়া যায়।

উয়ারী বাটশ্বর উৎখননে টেঞ্চ৲তে আবিষ্কৃত কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্র যেমন – বাটি, ছোট আকৃতির পাত্র/হাড়ি, গামলা, থালা, হাড়ি, নলযুক্ত পাত্র, সুরাপাত্র (থামের উপর থালা ও থামের উপর বাটি) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাওয়া যায়।উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র

[১৭] V. N. Mishra, “Pottery,” in B. V. Subbarayappa (Ed.), *Project of History of Indian Science, Phylosophy and Culture* : *Chemical Knowldege and Practices* (New Delhi, 1998).

এবং কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের মধ্যে প্রচুর নলযুক্ত প্রাত্রের খণ্ডাংশ পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে তখন হয়তো তরল খাদ্য পরিবেশনে এ ধরনের নলযুক্ত পাত্র বেশি ব্যবহৃত হতো।[১৮]

রোলেটেড মৃৎপাত্র

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের আদি-ঐতিহাসিক যুগের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্পর্কিত তথ্যের জন্য রোলেটেড মৃৎপাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রোলেটেড মৃৎপাত্র ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহুসংখ্যক প্রত্নস্থানে পাওয়া আদি-ঐতিহাসিক যুগের আরেকটি ধ্রুপদি মৃৎপাত্র। রোলেটেড মৃৎপাত্রের আবিষ্কার উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থান, তমলুক ও চন্দ্রকেতুগড়কে এককভাবে এবং বিশেষভাবে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে আদি-ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রমবিকাশমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত প্রদান করে। রোলেটেড মৃৎপাত্র একটি থালা, যার কান্দা ভারী ও বাঁকা, তলায় কোনো পা নেই, নিম্নাংশ ও কান্দা সংযুক্ত, মধ্যে কোনো জোড়া নেই। রোলেটেড মৃৎপাত্রের তলদেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল। এটি একাধিক রঙের হয়। অভ্যন্তর ভাগের তলদেশে সমকেন্দ্রে বৃত্তাকার নকশায় খাঁজকাটা থাকে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হলো, এক থেকে একাধিক সমকেন্দ্রিক বৃত্ত, যেখানে প্রতিটি বলয়ে ৩ থেকে ১০ সারি খাঁজকাটা নকশা থাকে। এগুলো বিন্দু, আঁচল, কীলক, ত্রিভুজ প্রভৃতি আকৃতির হয়। রোলেটেড মৃৎপাত্রগুলো সাধারণত উন্নত মানের,তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের রোলেটেড মৃৎপাত্র দেখা যায়। মৃৎপাত্রের সম-আকৃতি প্রমাণ করে যে, এগুলো চাকায় তৈরি। রোলেটেড নামটি এসেছে তার বিশেষ ধরনের নকশার কারণে। চাকার মধ্যে যখন মৃৎপাত্রটি থাকে, তখন রোলেটের সাহায্যে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ খাঁজ কেটে নকশা করা হয়।[১৯]

আলোকচিত্র ৪

উৎখননে প্রাপ্ত রোলেটেড মৃৎপাত্রের নমুনা

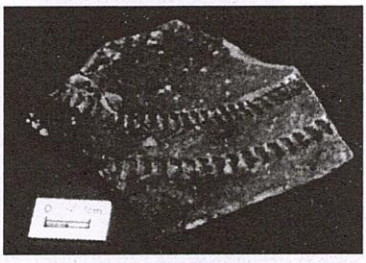

ধ্রুপদি রোমান শৈলীগত মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আরিকামেদু রোলেটেড মৃৎপাত্র খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে দ্বিতীয় শতকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত। অপেক্ষাকৃত ভালোগুলো অবশ্যই উপরিউক্ত অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত, তবে নিম্নমানেরগুলো স্থানীয়ভাবে অনুক্রিয়াজাত।[২০] কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে আমিকামেদু রোলেটেড মৃৎপাত্রগুলো সম্ভবত স্থানীয়ভাবে তৈরি, তবে 'রুলেটিং' প্রযুক্তিটি ভূমধ্যসাগরীয়

---

[১৮] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এবং মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে।

[১৯] তদেব।

[২০] R. E. M. Wheeler, *My Archaeological Mission to India and Pakistan* (London, 1976).

অঞ্চল থেকে এসে থাকবে। করণ, সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে এই প্রযুক্তি প্রচলিত ছিল না।[২১] পরবর্তীকালের গবেষণা থেকে জানা যায় যে আরিকামেদু রোলেটেড মৃৎপাত্র খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ভারতের আরিকামেদু ও কোরাইকেদু, শ্রীলঙ্কায় অনুরাধাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ায় সেমবিরান থেকে পাওয়া রোলেটেড মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত মাটির উপাদান পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সমস্ত রোলেটেড মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত মাটি একই ধরনের এবং তা অভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত।[২২]

নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্র

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের একমাত্র উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়াগেছে। নব্‌যুক্ত (Knobbed) মৃৎপাত্র বাংলাদেশ, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি-ঐতিহাসিক সময়ের প্রত্নস্থানে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রাপ্ত নব্‌যুক্ত পাত্রসমূহের নির্মাণ উপাদান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্মাণ উপাদান হিসেবে ব্রোঞ্জ, হাই-টিন ব্রোঞ্জ, তাম্র, রৌপ্য, প্রস্তর এবং মাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোকচিত্র ৫

ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্রের নমুনা

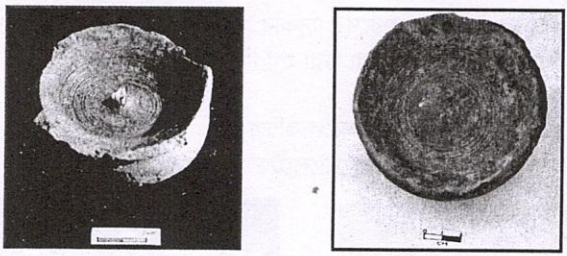

মাটির পাত্রের মধ্যে ধূসর, কৃষ্ণ-রক্তিম, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রে নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্র লক্ষ করা যায়। তবে এদের মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের নব্ বেশি দেখা যায়।[২৩] এ ধরনের পাত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যবর্তী একটি নবের চারদিকে বৃত্তাকারে সাধারণত ৭-১০ খাঁজকাটা দাগ

---

[21] V. Begley, "Arikamedu Reconsidered," *American Journal of Archaeology,* 1983; Idem., "Rouletted Ware at Arikamedu: A New Approach," *American Journal of Archaeology,* 1988.

[22] I. W Adrika, *et al.,* "A single Source for South Asian Export Quality Rouletted Ware?" *Man and Environment* XVIII (1) (1993), Pune.

[23] I. C. Glover, "Recent Archaeological Evidence for Early Maritime Contacts between India and South-east Asia," in Himanshu *et al.* (Ed.), *Tradition and Archaeology-Early Maritime Contacts in the Indian Ocean,* 1996.; Idem., "The Southern Silk Road: Arhcaeological Evidence for Early Trade between India and South-east Asia," in Amara Srisuchat (Ed.), *Ancient Trade and Cultural Contacts in Southeast Asia* (Bangkok, 1996); S. S. M. Rahman, "Recent Discovery of Northern Black Polished Ware in the Mahasthan Region of Bangladesh: An Archaeological Perspective," *Journal of Bengal Art,* 1998.

থাকে। এই নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্রের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার কী ছিল, তা জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় যে দৈনন্দিন রান্না, খাবার সরবারহ বা শোপিস হিসেবে নব্‌যুক্ত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয়নি। নব্‌যুক্ত পাত্র কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। অধ্যাপক আয়ান গেস্লাভার নব্‌যুক্ত পাত্রকে 'মণ্ডল' হিসেবে মনে করেন, যেমন: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশের কাল্পনিক প্রতীক নব্ মেরু পাহাড় এবং চারদিকের বৃত্তকার দাগগুলো সমুদ্র। নব্‌যুক্ত পাত্র বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।[২৪]

লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকেবেশ কিছু নমুনাকে লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।এই লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ১৭.৮৯ শতাংশ (সারণি ১০)। এ শ্রেণীর পাত্রে উজ্জ্বল লাল প্রলেপ দেওয়া হতো এবং মসৃণ উজ্জ্বল পৃষ্ঠ প্রদর্শনের জন্য Burnish করা হতো। এ শ্রেণীর পাত্রগুলো হস্তনির্মিত অথবা চাকায় তৈরি। এ ধরনের পাত্রের পৃষ্ঠদেশে সাধারণ লাল, লালচে হলুদ, হালকা লাল বা হালকা বাদামি রঙের প্রলেপ দেওয়া হতো।

আলোকচিত্র ৬

ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের নমুনা

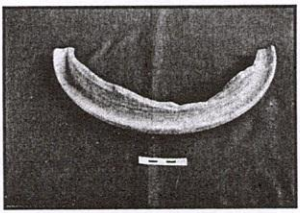

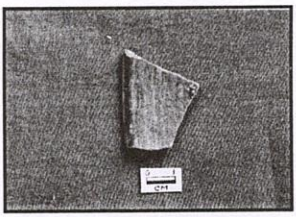

উয়ারী বাটশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্র, যেমন – বাটি, গামলা, থালা, বয়েম/ দীর্ঘ গলাযুক্ত পাত্র, হাড়ি, কলস, ধারকযুক্ত পাত্র উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাওয়া যায়। লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের নকশার ক্ষেত্রে উল্লম্ব, অনুভূমিক, বর্গ, বৃত্ত, উপবৃত্ত এবং পাত্রের বৃত্তাকার প্রান্তে খোদাই করা হতো। এ শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ আকৃতির পাত্রগুলোর মধ্যে সমতল অথবা উত্তল পাত্রসহ কিঞ্চিত অন্তর্মুখী বৃত্তাকার প্রান্তসহ বাটি, পুরু বহির্মুখী বৃত্তাকার প্রান্তসহ গামলা, বৃত্তাকার প্রান্তসহ ছোট বা মাঝারি আকৃতির বয়েম এবং বহির্মুখী বৃত্তাকার প্রান্ত, স্ফীত দেহের বৃত্তাকার বাটি অন্তর্ভুক্ত।

ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকে বেশ কিছু নমুনাকে ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । এই ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ৩৮.৬৩ শতাংশ (সারণি ১০) এবং উৎখননে প্রাপ্ত সমগ্র নমুনার মধ্যে এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের সংখ্যাই বেশি। উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র শ্রেণীতে

[২৪] তদেব।

বিভিন্ন আকৃতির পাত্র যেমন – বাটি, গামলা, থালা, হাড়ি, পুষ্পাধার, কলস, বয়েম উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাওয়া যায়। সাধারণত ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে হাড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আলোকচিত্র ৭

ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত ফ্যাকাসে লাল মৃৎপাত্রের নমুনা

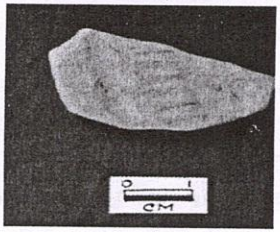

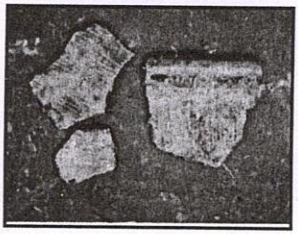

ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্রকে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন: ১. অমসৃণ ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র, ২. অনুজ্জ্বল ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র, এবং ৩. মোটা অমসৃণ ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র। প্রথম দুই শ্রেণীর পাত্রের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর পাত্রটির অনুজ্জ্বলতা। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের দেহ অমার্জিত এবং মৃৎপাত্রের মজ্জা দৃশ্যত অমসৃণ। এসব মৃৎপাত্রের বুনন হলো মোটা থেকে মাঝারি মানের। কোনো কোনো মৃৎপাত্র চাকার সাহায্যে তৈরি হলেও হাতে তৈরি মৃৎপাত্রের সংখ্যা বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃৎপাত্র তৈরির মাটি খুব ভালভাবে মথিত করা হতো না। কাদার সাথে খাঁদ হিসেবে বালি ও ধানের তুষ মিশ্রিত করা হতো। অধিকাংশ পাত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় হস্তনির্মিত দেহের সাথে ঘূর্ণায়মান চক্রে নির্মিত দৃঢ় বৃত্তাকার প্রান্ত সংযুক্ত। এ শ্রেণীর পাত্রগুলোর দেহ পুরু ও অমসৃণ এবং সাধারণত দেহের উপরের অংশে অতি পাতলা প্রলেপযুক্ত। পাত্রদেহ প্রায়শই অমসৃণ হওয়ায় তা অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে।

ধূসর মৃৎপাত্র

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে টেঞ্চ২তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নমুনাগুলোর মধ্য থেকেবেশ কিছু নমুনাকে ধূসর মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । এই ধূসর মৃৎপাত্র সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ১৯.০০ শতাংশ (সারণি ১০) । উয়ারী উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সমূহের মধ্যে ধূসর মৃৎপাত্র পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের মৃৎপাত্র।

আলোকচিত্র ৮

ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত ধুসর রঙের মৃৎপাত্রের নমুনা

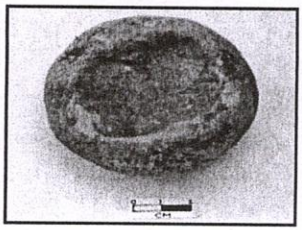

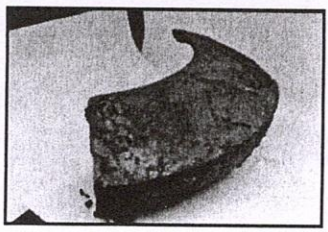

এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের বর্ণ ধূসর রঙের। পাত্রগুলোর ধূসর পৃষ্ঠদেশ দগ্ধকরণ অথবা কাদায় Carleonaceous বস্তুর উপস্থিতির কারণে হতে পারে। তবে এ পাত্রগুলো খুবই দুর্বল প্রকৃতির যার বুনন মোটা থেকে মাঝারি মানের। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র হস্তে নির্মিত বা ঘূর্ণায়মান চাকায় নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। তথাপি এগুলো এভাবে নির্মিত হতো কিনা বা আকস্মিক কম তাপে দগ্ধকরণের ফলে উদ্ভূত কিনা তা স্পষ্ট নয়।

এই শ্রেণীর মৃৎপাত্রের সাধারণ আকার হচ্ছে হাড়ি, বাটি ও থালা; যদিও গামলা ও বয়েম আকৃতির মৃৎপাত্র পাওয়া যায়।

আকৃতি অনুযায়ী মৃৎপাত্রের বিভাজন

গবেষণা নিবন্ধে গবেষণাগার পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্য প্রদানকারী মৃৎপাত্র অংশসমূহ হচ্ছে বৃত্তাকার অংশ/কান্দা, গলা, দেহ এবং ভিত্তি তলদেশ। এক্ষেত্রে বৃত্তকার প্রান্তের নমুনা বেশি পরীক্ষিত হয়। কেননা পাত্রের আকৃতি নির্ণয়ে এ অংশ থেকেই সর্বাধিক তথ্য পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র নমুনার বিশ্লেষণে প্রাপ্ত আকৃতিসমূহের মধ্যে বেশি পাওয়া গিয়েছে হাড়ি, বাটি, গামলা, থালা, বয়েম/গোলাকার দীর্ঘ পাত্রবিশেষ, পুষ্পাধার, কলস/ তরল পদার্থের পাত্র, ধারকযুক্ত পাত্র; যথা, থামের-উপর-থালা ও থামের-উপর-বাটি পাওয়া গিয়েছে। এ গবেষাণায় প্রাপ্ত পাত্রসমূহকে ছোট, মাঝারি এবং বৃহদাকৃতি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

হাড়ি

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে হাড়ি আকৃতির পাত্রের খণ্ডাংশই সর্বাধিক এবং উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আকৃতির হাড়িকে ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকৃতি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ছোট ও মাঝারি আকৃতির পাত্রগুলোর সাধারণত বহির্মুখী প্রসারণ বৃত্তাকার প্রাপ্ত, সংকীর্ণ গলা, স্ফীত দেহ এবং বৃত্তাকার তলদেশ থাকে। অপরদিকে বৃহদাকৃতি পাত্রগুলোর বৃত্তাকার প্রান্ত পুরু কোনোটির বহির্মুখী প্রসারণ আর কোনোটির অন্তর্মুখী সংকোচন, ছোট গলা এবং স্ফীত দেহ থাকে।

সারণি ১

হাড়ি আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবি পিড ব্লিউ	বিএ সড ব্লিউ	আরএ সড ব্লিউ	জিডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআ রড ব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
হাড়ি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৬৭	৩৬	১৮৭	১২০	৩৫০	১	৮	৭৬৯
শতকরা (%)	৮.৭১	৪.৬৮	২৪.৩২	১৫.৬০	৪৫.৫১	০.১৩	১.০৪	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware) BSW (Black Slipped Ware)RSW (Red Slipped Ware) GW (Gray Ware) DRW (Dull Red Ware) CRW (Coarse Red Ware)B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত বৃহদাকৃতি হাড়ির বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১৮ সে.মি. থেকে ২৬. সে.মি. এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ২২ সে.মি.। মাঝারি আকৃতির হাড়ির বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১৩ সে.মি. থেকে ১৭ সে.মি. এবং গড় বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১৫ সে.মি.। ছোটো আকৃতির হাড়ির বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ৬ সে.মি. থেকে ১২ সে.মি. এবং গড় বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ৯ সে.মি. (সারণি ১.১)।

সারণি ১.১
বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্রের ব্যাস

মৃৎপাত্রের ধরন	সংখ্যা	মৃৎপাত্রের ব্যাস (সে.মি)			
		সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	গড়	প্রচুরক
বাটি	৩০৮	২৬	১০	১৮.১৭	১৫-১৮
গামলা	৫৩	৩৬	১২	২২.২৮	১৯-২২
থালা	৬০	৩২	১২	২১.২৭	১৮-২১
বয়েম	৪৮	৩২	১০	১৯.৪২	১৬-১৯
পাত্র	৭৬৯	২৬	০৬	১৭.৬৯	১৬-১৮
পুষ্পাধার	০৩	২০	১৪	১৬.৬৭	১৪-১৭
কলস	০৫	২৪	১২	১৬.৮০	১৪-১৭
ডিস-অন-স্ট্যান্ড	০৬	০৮	০৪	০৭	৬-৮
বোল-অন-স্ট্যান্ড	০৫	০৬	০৫	৫.৬	০৬

সূত্রঃ উয়ারী-বটেশ্বর উৎখনন (Trench 2) থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

সারণি ১ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ আকৃতির পাত্রের মধ্যে সর্বাধিক হচ্ছে ফ্যাকাশে লাল রঙের মৃৎপাত্র, যা সংখ্যায় পরিমাণ হচ্ছে সমগ্র মৃৎপাত্রের সন্নিবেশের ৪৫.৫১%, দ্বিতীয় সর্বাধিক হচ্ছে লাল মসৃণ মৃৎপাত্র যা সংখ্যায় হচ্ছে ২৪.৩২% এবং তৃতীয় হচ্ছে ধূসর রঙের মৃৎপাত্র যা সংখ্যায় ১৫.৬%। অপরাপরগুলো সংখ্যায় অতি অল্প।

আলোকচিত্র ৯
ট্রেঞ্চ২ তে প্রাপ্ত ধুসর রঙের মৃৎপাত্রের নমুনা

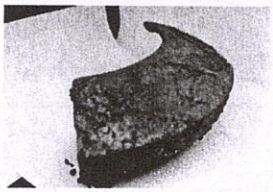

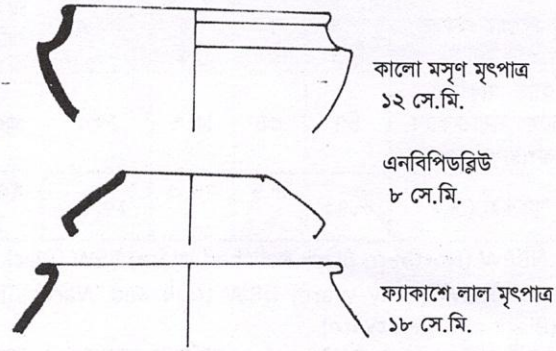

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ$_২$ তে আবিষ্কৃত হাড়িকে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা: গলাসরু হাড়ি (Globular Pot), কাঁধপ্রশস্ত হাড়ি (Pear-Shaped Pot), ও রান্নার হাড়ি (Carinated Pot)।

গলাসরু হাড়ি

এ ধরনের হাড়ির ক্ষেত্রে মুখ দেহের তুলনায় কিছুটা সরু থাকে। এ শ্রেণীর নিম্নলিখিত ৪টি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হাড়ি পাওয়া যায় –

- গলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত মুখযুক্ত হাড়ি। মুখের ব্যাস সাধারণত ২৫-১৮ সে.মি. হয়।
- প্রথমটির তুলনায় মুখ কম প্রশস্ত হয় এবং বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১০-১৯ সে.মি. হয়।
- লম্বা ও সমান্তরাল গলাযুক্ত হাড়ি যার মুখের ব্যাস ৭-১৭ সে.মি. হয়।
- গলাবিহীন হাড়ি যার মুখের ব্যাস (Rim) এর চেয়ে কম হয় এবং মুখের ব্যাস ১৫-১৮ সে.মি. হয়।

কাঁধপ্রশস্ত হাড়ি

এ শ্রেণীর পাত্রের দেহ প্রায় গোলাকৃতির এবং কাঁধ প্রশস্ত থাকে। Globular Pot-এর ন্যায় এই হাড়ির ভিত্তি তলদেশ থাকে না অর্থাৎ তলদেশ প্রায় গোলাকৃতির হয়।

রান্নার হাড়ি

এ শ্রেণীর পাত্রে সাধারণত গলার নিচে এবং দেহের উপরাংশে অবতল ঢাল থাকে এবং ঢালের নিচে সুস্পষ্ট কোণ থাকে। এ শ্রেণীর হাড়ির মুখ ভিতরের দিকে এবং বৃত্তাকার প্রান্তের বাহিরের দিকে বাঁকানো থাকে। মাঝারি আকৃতির হাড়িগুলো রান্নার হাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ধরনের হাড়িকে আবার দুটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

- বাহিরের দিকে বাঁকানো কোণ বিশিষ্ট বৃত্তাকার প্রান্ত থাকে। গলা এবং কাঁধের উচ্চতা খুবই কম, ভিত্তি তলদেশ থাকে।
- ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দেহের প্রায় সমান পুরুত্ব বিশিষ্ট বৃত্তাকার প্রান্ত থাকে। এতে আলাদাভাবে বৃত্তাকার প্রান্ত থাকে না।

বাটি

তুলনামূলক প্রাচুর্যের বিচারে উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সমূহের মধ্যে বাটি আকৃতির পাত্রের নমুনার অবস্থান দ্বিতীয়। অধিকাংশ বাটিই উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র শ্রেণীর, যা সংখ্যায় ৩১.১৭% এবং ধূসর মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা সংখ্যায় ২৯.২২%। বাটি আকৃতির পাত্রের আরেকটি শ্রেণী হলো কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, যা সংখ্যায় হচ্ছে ১৯.১৬%। অপরাপর পাত্রগুলো সংখ্যায় অতি অল্প।

বেশির ভাগ বাটি V আকৃতি হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির, খাড়া ও উত্তল ঢাল বিশিষ্ট বাটিগুলোকে কাপের (Cup) শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সকল মৃৎপাত্র শ্রেণীতে বাটির আকৃতি দেখা যায় কিন্তু তাদের বৃত্তাকার প্রান্তের (Rim) পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বাধিক প্রাপ্ত আকৃতি হচ্ছে সরল অথবা সামান্য অর্ন্তমূখী বৃত্তাকার প্রান্ত এবং উত্তল দেহ। এ ধরনের সকল পাত্রই উন্মুক্ত বা খোলা কারণ বৃত্তাকার প্রান্ত-এর ব্যাস সাধারণত দেহের সর্বোচ্চ ব্যাসের সমান অথবা বেশি হওয়ায় পাত্রের অভ্যন্তরভাগ প্রায় সম্পূর্ণই উন্মুক্ত থাকে। অর্ন্তমূখীবৃত্তাকার প্রান্তযুক্ত বাটিই হচ্ছে সর্বাধিক এবং সাধারণ বৃত্তাকার বাটি হচ্ছে এর পরবর্তী স্থানে। সাধারণত বাটির বৃত্তাকার ব্যাস ১০ সে.মি. থেকে ২৬ সে.মি.

এবং গড় বৃত্তাকার ব্যাস ১৮.১৭ সে.মি. (সারণি ১.১)। কতিপয় বৃহদাকার বাটির বৃত্তাকার প্রান্তের প্রকৃতি গামলার অনুরূপ এবং তাদের বিভক্ত করা কষ্টসাধ্য। সন্নিবেশে গভীর ও অগভীর দু'প্রকার বাটিই পাওয়া যায়।

সারণি ২

বাটি আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবি পি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএ স ডব্লিউ	জি ডব্লিউ	ডিআ র ডব্লিউ	সি আর ডব্লি উ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মো ট
বাটি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৯৬	৫৯	১১	৯০	৪৯	১	২	৩০ ৮
শতকরা (%)	৩১.১৭	১৯.১ ৬	৩.৫৭	২৯.২ ২	১৫.৯ ১	০.৩ ২	০.৬৫	১০ ০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware) DRW (Dull Red Ware)CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)
সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ

আলোকচিত্র ১০

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ হতে আবিষ্কৃত কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র ও বিভিন্ন ধরনের বাটি

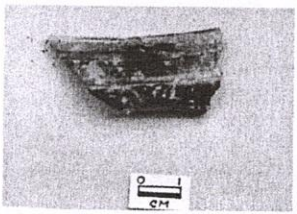

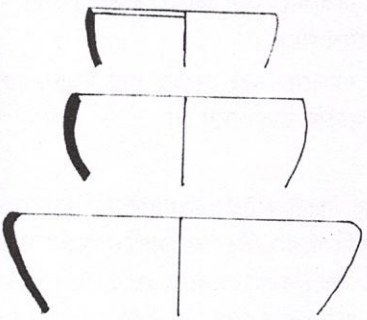

ধূসর মৃৎপাত্র
২০ সে.মি.

এনবিপিডব্লিউ
১০ সে.মি.

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র
১৪ সে.মি.

থালা

উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে থালা আকৃতির পাত্রের অবস্থান তৃতীয়। অধিকাংশ থালা ধূসর মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্গত, যা সংখ্যায় হচ্ছে ২৮.৩৩%। থালা আকৃতির পাত্রের আরেকটি শ্রেণী হলো উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র শ্রেণীর, যা সংখ্যায় হচ্ছে ২০%। লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর থালা আকৃতির পাত্রের পরিমাণ হচ্ছে ১১.৬৭%। মোটা অমসৃণ লাল এবং কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র শ্রেণীতে কোনো থালা আকৃতির মৃৎপাত্র পাওয়া যায়নি।

সারণি ৩

থালা আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএস ডব্লিউ	জি ডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআরডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
থালা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	১২	১০	৭	১৭	১৪	০	০	৬০
শতকরা (%)	২০.০০	১৬.৬৭	১১.৬৭	২৮.৩৩	২৩.৩৩	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware)CRW (Coarse Red Ware) B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

স্কেচ ৪

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের থালা

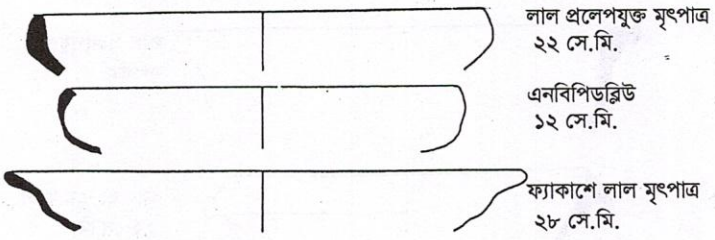

উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে আবিষ্কৃত থালা আকৃতির সকল পাত্রই উন্মুক্ত বা খোলা এবং কিছুটা সমতল কারণ বৃত্তাকার প্রান্ত বেশি হওয়ায় পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ প্রায় সম্পূর্ণই খোলা থাকে। বাটি ও থালা উভয় পাত্রই গভীর এবং অগভীর খোলা পাত্রের অন্তর্গত। এদের মধ্যে পার্থক্য সূচক নির্ণয় করা সমস্যাজনক। সাধারণত থালার বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১২ সে.মি. থেকে ৩২ সে.মি. এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ২১.২৭ সে.মি. (সারণি ১.১)।

গামলা

তুলনামূলক প্রাচুর্য বিচারে উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রসমূহের মধ্যে গামলার অবস্থান চতুর্থ। অধিকাংশ গামলা সাধারণ লাল মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা সংখ্যায় ৬৪.১৫% এবং লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ১৬.৯৮%। গামলা আকৃতির পাত্রের আরেকটি শ্রেণী হলো ধূসর মৃৎপাত্র, যা সংখ্যায় হচ্ছে ১৩.২১% এবং উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গামলার পরিমাণ হচ্ছে ৫.৬৬%। সকল মৃৎপাত্র শ্রেণীতে গামলা আকৃতির মৃৎপাত্র দেখা যায় না।

সারণি ৪

গামলা আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএসডি ব্লউ	জিডব্লি উ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
গামলা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৩	০	৯	৭	৩৪	০	০	৫৩
শতকরা (%)	৫.৬৬	০.০০	১৬.৯৮	১৩.২১	৬৪.১৫	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware) , BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware)CRW (Coarse Red Ware) , B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র : উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

স্কেচ ৫

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের গামলা

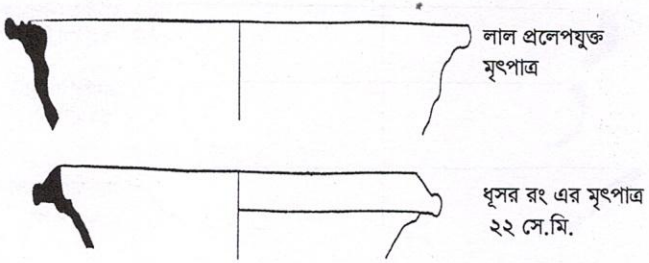

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত গামলার ক্ষেত্রে সাধারণত বৃত্তাকার প্রান্তের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃত্তাকার প্রান্ত ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহিরের দিকে বাঁকানো থাকে। আবার দেহের প্রান্তভাগ সমান্তরালভাবে মোটা হয়ে বৃত্তাকার প্রান্তের আকৃতি ধারণ করে। মূলদেহ পুরোটাই গোলাকৃতি থাকে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে Carination দেখা যায়। সাধারণত গামলার বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১২ সে.মি. থেকে ৩৬ সে.মি. পর্যন্ত এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ২২.২৮ সে.মি. (সারণি ১.১)।

বয়েম

তুলনামূলক প্রাচুর্যের বিচারে উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রসমূহের মধ্যে বয়েম আকৃতির খণ্ডাংশের অবস্থান পঞ্চম। অধিকাংশ বয়েম ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা সংখ্যায় ৭৫% এবং লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ১৮.৭৫%। বয়েম আকৃতির পাত্রের

আরেকটি শ্রেণী হলো ধূসর মৃৎপাত্র, যা সংখ্যায় হচ্ছে ৪.১৬% এবং কালো মসৃণ মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বয়েমের পরিমাণ হচ্ছে ২.০৮%। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র,মোটা অমসৃণ লাল মৃৎপাত্র এবং কালো-এবং-লাল মৃৎপাত্র শ্রেণীতে বয়েম আকৃতির মৃৎপাত্র পাওয়া যায়নি।

সারণি ৫

বয়েম আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি-ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএসডব্লিউ	জিডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর-ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
বয়েম আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	১	৯	২	৩৬	০	০	৪৮
শতকরা (%)	০.০০	২.০৮	১৮.৭৫	৪.১৭	৭৫.০০	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware)CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

স্কেচ ৬

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরণের বয়েম

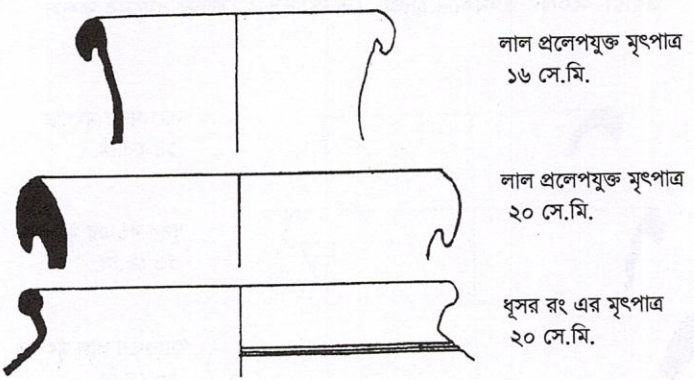

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত বয়েম আকৃতির অধিকাংশ পাত্রের বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস দেহের সর্বোচ্চ ব্যাসের সমান অথবা বেশি হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়েমের বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১০ সে.মি. থেকে ৩২ সে.মি. এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ১৯.৪২ সে.মি. (সারণি ১.১)।

কলস

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে কলস আকৃতির পাত্রের খণ্ডাংশ এর সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ কলস আকৃতির পাত্রের খণ্ডাংশ লাল মসৃণ মৃৎপাত্র এবং ফ্যাকাশে লাল রঙের মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যার উভয়েই সমপরিমাণে অর্থাৎ ৪০% হারে পাওয়া যায়। কলস আকৃতির পাত্রের খণ্ডাংশের আরেকটি শ্রেণী হলো ধূসর মৃৎপাত্র ২০%। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত অপরাপর উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, মোটা অমসৃণ লাল মৃৎপাত্র ও কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র শ্রেণীতে কলস আকৃতির মৃৎপাত্রের নমুনা পাওয়া যায়নি।

সারণি ৬

কলস আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি-ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএস ডব্লিউ	জি-ডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
কলস আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	০	২	১	২	০	০	৫
শতকরা (%)	০.০০	০.০০	৪০.০০	২০.০০	৪০.০০	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware)RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware), CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware).

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

স্কেচ ৭

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের কলস

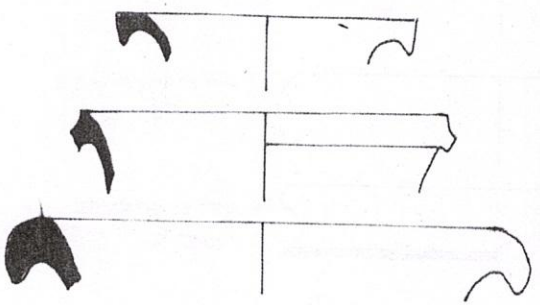

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত কলস আকৃতির পাত্র সাধারণত দীর্ঘ ও সংকোচিত গলা ও প্রসারমাণ বৃত্তাকার প্রান্তবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কলসের বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১২ সে.মি. থেকে ২৪ সে.মি. পর্যন্ত হয় এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ১৬.৮০ সে.মি.(সারণি ১.১)।

পুষ্পাধার

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের নমুনার সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের খণ্ডাংশ ধূসর রঙের মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা সংখ্যায় ৬৬.৬৭%। অপরাপর ফ্যাকাশে লাল রঙের মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের পরিমাণ ৩৩.৩৩%। সারণি ১৩ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, মোটা অমসৃণ লাল মৃৎপাত্র, কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র শ্রেণীতে পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের নমুনা পাওয়া যায়নি।

সারণি ৭

পুষ্পাধার আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি-ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএস-ডব্লিউ	জি-ডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর-ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	০	০	২	১	০	০	৩
শতকরা (%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware), CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

স্কেচ ৮

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের পুষ্পাধার

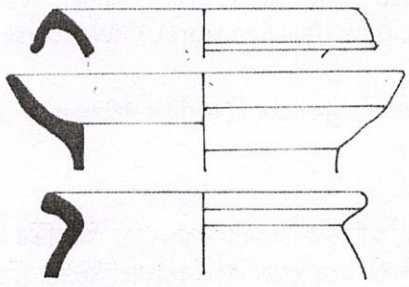

ধূসর মৃৎপাত্র
১৪ সে.মি.

ধূসর মৃৎপাত্র
১৬ সে.মি.

ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র
১৪ সে.মি.

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত পুষ্পাধার আকৃতির পাত্র সাধারণত লম্বা, পাতলা পাত্র থেকে শুরু করে গোলাকার অথবা সমতল আকৃতির সংকীর্ণ অথবা সম্পূর্ণই খোলা মুখের পাত্র পাওয়া যায়। উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের বৃত্তাকার প্রান্তের ব্যাস ১৪ সে.মি. থেকে ২০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং বৃত্তাকার প্রান্তের গড় ব্যাস ১৬.৬৭ সে.মি. (সারণি ১.১)।

থামের-উপর-থালা

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ-২'তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে থামের উপর থালা আকৃতির পাত্রের নমুনা অতি দুর্লভ। সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে থামের-উপর-থালা আকৃতির পাত্র সংখ্যায় ০.৫৬%। থামের-উপর-থালা আকৃতির মৃৎপাত্র শুধুমাত্র উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র ও কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা উভয়ই যথাক্রমে ৮৫.৭১% ও ১৪.২৯% হারে পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র এবং কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত কিছু সংখ্যক খণ্ডাংশ পাওয়া যায় যা থামের উপর থালার ভিত্তি অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। ভিত্তি অংশের বৃত্তাকার অংশ সাধারণত গোলাকার ও বহির্মূখী প্রসারিত। থামের-উপর-থালা গভীর ও অগভীর উভয়ই হয়ে থাকে। থালাটির দীর্ঘ অর্ন্তমূখী বৃত্তাকার প্রান্ত, প্রসারমান গাত্র রয়েছে।

সারণি ৮

থামের-উপর-থালা আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএস-ডব্লিউ	জি-ডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর-ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
থামের-উপর-থালা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৬	১	০	০	০	০	০	৭
শতকরা (%)	৮৫.৭১	১৪.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware), CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত থামের-উপর-থালা আকৃতির পাত্রের বৃত্তাকার অংশের ব্যাস ৬ সে.মি. থেকে ৮ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং বৃত্তাকার অংশের গড় ব্যাস ৭ সে.মি. (সারণি ১.১)।

আলোকচিত্র ১১
ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত ডিস-অন-স্ট্যান্ড

স্কেচ ৯
ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত ডিস-অন-স্ট্যান্ড

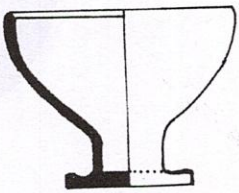

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র
৮ সে.মি.

থামের-উপর-বাটি

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে থামের উপর বাটি আকৃতির পাত্রের নমুনাও অতি দুর্লভ। সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে থামের-উপর-বাটি আকৃতির পাত্র সংখ্যায় ০.৪০%। থামের-উপর-থালা আকৃতির মৃৎপাত্র শুধুমাত্র উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র ও কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যা উভয়ই যথাক্রমে ৪০% ও ৬০% হারে পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র এবং কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত কিছু সংখ্যক খণ্ডাংশ পাওয়া যায় যা থামের-উপর-বাটির ভিত্তি অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। ভিত্তি অংশের বৃত্তাকার অংশ সাধারণত গোলাকার ও অন্তর্মুখী।

সারণি ৯
থামের-উপর-বাটি আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবিপি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আরএস ডব্লিউ	জিডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট
থামের-উপর-বাটি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	২	৩	০	০	০	০	০	৫
শতকরা (%)	৪০.০০	৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware), CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

আলোকচিত্র ১২
উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত বোল-অন-স্ট্যান্ড

স্কেচ ১০
উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত বোল-অন-স্ট্যান্ড

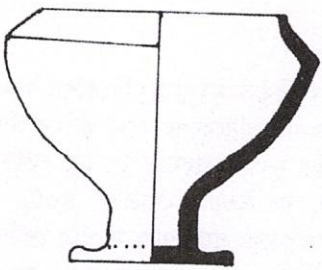

এনবিপিডব্লিউ
১০ সে.মি.

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ২ তে আবিষ্কৃত থামের-উপর-বাটি আকৃতির পাত্রের বৃত্তাকার অংশের ব্যাস ৮ সে.মি. থেকে ১০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং বৃত্তাকার অংশের গড় ব্যাস ৯ সে.মি. (সারণি ১.১)।

সার্বিক পর্যালোচনা

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশে সর্বাধিক প্রাপ্ত নমুনা হলো ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র যা সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ৩৮.৬৩ শতাংশ। তুলনামূলক প্রাচুর্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে ধূসর মৃৎপাত্র যা সংখ্যায় সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ১৯.০০ শতাংশ এবং এর পরই রয়েছে লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র যা সংখ্যায় ১৭.৮৯ শতাংশ। তুলনামূলক প্রাচুর্যের দিক থেকে চতুর্থ অবস্থানে আছে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, যা সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের ১৪.৭৯ শতাংশ। অপর দুটি ধারা কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র এবং মোটা অমসৃণ লাল মৃৎপাত্র অতি অল্প উপস্থিতির জন্যে দৃষ্টি আকর্ষক। এগুলো সমগ্র সন্নিবেশের যথাক্রমে ০.৭৯ শতাংশ এবং ০.১৬ শতাংশ।

উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে ট্রেঞ্চ২-তে আবিষ্কৃত বেশিরভাগ পাত্রের বৃত্তাকার প্রাপ্ত চাকা দ্বারা নির্মিত। সাধারণ আকৃতির বৃত্তাকার প্রান্তই বেশি পাওয়া যায়। পাত্র আকৃতির বৃত্তাকার প্রান্তের আকৃতি প্রায় উল্লম্ব, প্রসারণশীল অথবা অধোমুখী।

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে ট্রেঞ্চ$_২$-তে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের একটি বিরাট অংশে প্রলেপ বা স্তরায়িত প্রলেপ অথবা খুব পাতলা প্রলেপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক অমসৃণ পাত্রে প্রলেপ ব্যবহার করা হয়নি এবং এগুলো ভেজা থাকা অবস্থায় হাতে মসৃণ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাত্রগুলোতে উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। উয়ার-বটেশ্বরের মৃৎপাত্র ধারায় পাত্রসমূহে হালকা লাল থেকে হালকা বাদামি, লালচে হলুদ, লাল এবং কালো বর্ণের প্রলেপ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার অনেক পাত্রে সাদা অথবা ধূসর বর্ণের প্রলেপ লক্ষ করা যায়।

নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে উয়ারী-বটেশ্বরে উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রসমূহকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,

১. চাকায় তৈরি;
২. হাতে তৈরি; এবং
৩. আংশিক চাকায় ও আংশিক হাতে তৈরি।

উয়ারীর অধিকাংশ মৃৎপাত্র ১ম ও ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। কিছু পাত্র যেমন – বাটি, গামলা এবং খেলনা জাতীয় পাত্র যা কিনা সম্পূর্ণ হাতে তৈরি (লাল রঙের মৃৎপাত্র)। মৃৎপাত্রের নমুনা হাতে বা চাকা দ্বারা তৈরি কিনা তা পাত্রের অভ্যন্তরে ছোট, অনিয়মিত ও আঁকাবাঁকা রেখা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। হাড়ি এবং বয়েমের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার প্রান্ত সাধারণত ঘূর্ণায়মান চাকা দ্বারা নির্মিত হতো এবং কলসের ক্ষেত্রে তা পরবর্তীকালে গলার উপর যুক্ত করা হতো।

সার্বিকভাবে সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশকে অঙ্গসংস্থানিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে সাধারণত শ্রেণীকরণ করা হয়। যেমন বয়েম, হাড়ি, গামলা ইত্যাদি। এই শিরোনামগুলো সমগ্র বিশ্বেই মৃৎপাত্রের শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আকৃতিগতভাবে মৃৎপাত্রকে সাধারণত ৪টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এগুলো হলো হাড়ি, বয়েম, বাটি ও থালা। এগুলোকে আবার অন্যান্য উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সন্নিবেশ হতে সর্বাধিক প্রাপ্ত নমুনা হলো হাঁড়ি যা সমগ্র সন্নিবেশের ৬১.১৩%। তুলনামূলক প্রাচুর্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে বাটি যা সংখ্যায় ২৪.৪৮% এবং এরপরই রয়েছে থালা আকৃতির পাত্র যা সংখ্যায় ৪.৭৭%। তুলনামূলক প্রাচুর্যের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে গামলা আকৃতির পাত্র, যা সংখ্যায় ৪.২১%।

অন্যান্য আকৃতির পাত্রের মধ্যে পুষ্পাধার ০.২৪%, কলস ০.৪০%, ধারকযুক্ত পাত্র; যথা, থামের-উপর-থালা ও থামের-উপর-বাটি আকৃতির পাত্রের সংখ্যা খুবই কম যা সমগ্র মৃৎপাত্র সন্নিবেশের মধ্যে ০.৫৬% এবং ০.৪০%।

সারণি ১০

বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্রের বর্ণভিত্তিক পরিমাণ

মৃৎপাত্রের প্রকরণ	এনবি পি ডব্লিউ	বিএস ডব্লিউ	আর এস ডব্লিউ	জি ডব্লিউ	ডিআর ডব্লিউ	সিআর ডব্লিউ	বি-এন্ড-আর ডব্লিউ	মোট	শতকরা (%)
হাড়ি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৬৭	৩৬	১৮৭	১২০	৩৫০	১	৮	৭৬৯	৬১.১৩
বাটি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৯৬	৫৯	১১	৯০	৪৯	১	২	৩০৮	২৪.৪৮
থালা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	১২	১০	৭	১৭	১৪	০	০	৬০	৪.৭৭
গামলা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৩	০	৯	৭	৩৪	০	০	৫৩	৪.২১
বয়েম আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	১	৯	২	৩৬	০	০	৪৮	৩.৮২
কলস আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	০	২	১	২	০	০	৫	০.৪০
পুষ্পাধার আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	০	০	০	২	১	০	০	৩	০.২৪
থামের-উপর-থালা আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	৬	১	০	০	০	০	০	৭	০.৫৬
থামের-উপর-বাটি আকৃতির পাত্রের শনাক্তকরণ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ	২	৩	০	০	০	০	০	৫	০.৪০
মোট	১৮৬	১১০	২২৫	২৩৯	৪৮৬	২	১০	১২৫৮	১০০
শতকরা (%)	১৪.৭৯	৮.৭৪	১৭.৮৯	১৯.০০	৩৮.৬৩	০.১৬	০.৭৯	১০০	

টীকা: NBPW (Northern Black Polished Ware), BSW (Black Slipped Ware), RSW (Red Slipped Ware), GW (Gray Ware), DRW (Dull Red Ware), CRW (Coarse Red Ware), B-&-R W (Black-and-Red Ware)

সূত্র: উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে (Trench 2) আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ।

প্রত্ননগর মাহীসন্তোষ : উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি

মোঃ রেজাউল করিম*

Abstract: Mahisantosh was a strategically important place in ancient and medieval Bengal. To ensure the security of the state a fort was built there during the Hindu-Buddhist era. Consequently it emerged as a fort town. Considering its strategic importance the Muslim rulers made it as one of their power centres. They also established a mint and a number of mosques and madrashas. Subsequently, the *alims* and the *sufis* converged there to serve the cause of Islam. Despite its strategic importance and all-round development, the Muslim rulers of Bengal did not make it (Mahisantosh) their capital city.

১. ভূমিকা

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। বাংলার শাসক লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ারের অগ্রগতি প্রতিরোধ না করে পূর্ব বাংলায় চলে যান। নদীয়া জয়ের পর বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে দেওকোটে রাজধানী স্থানান্তর করেন।[১] রাজধানী হবার কারণে এ দুটি শহর মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজধানী না হওয়া সত্ত্বেও এ সময়ে মাহীসন্তোষ একইভাবে বিকশিত হয়। মুসলমান শাসকগণ এখানে প্রশাসনিক ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করেন। তারা এমনকি এখানে টাঁকশাল পর্যন্ত বসান। অবশ্য প্রশাসনিক দপ্তর বা টাঁকশাল নগরী হিসেবে মাহীসন্তোষ যতোটা প্রসিদ্ধ তার চেয়ে অধিকতর পরিচিত একটি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে। রাজধানী না হওয়া সত্ত্বেও মাহীসন্তোষ কিভাবে একটি মুসলিম সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছিল, এ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায় থেকে মুসলমান শাসকগণ কেনই বা এই শহরটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, তারও একটি সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হবে। তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে মাহীসন্তোষের অবস্থান এবং এর নামকরণসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

২. অবস্থান

মাহীসন্তোষ রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলাধীন ধামইরহাট উপজেলার অন্তর্গত চৌঘাট (উত্তর) মৌজায় অবস্থিত। ইউনিয়নের নাম আলমপুর। আত্রাই নদীর পূর্ব তীরের এই স্থানটি (মাহীসন্তোষ) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের খুবই নিকটবর্তী। এর অনতিদূরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর

---

* ড. মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

[১] স্থানটির বর্তমান নাম বাণগড়। এটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত। গুপ্ত যুগে এটি কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রধান শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। সাম্প্রতিক কালে এখানে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বস্তাবর সীমান্ত ফাঁড়ি। সীমান্তের ওপারে দক্ষিণ দিনাজপুর (ভারত) জেলার বালুরঘাট থানা। মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে (দক্ষিণ-পূর্বে) অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও বালুরঘাট শহর থেকে মাহীসন্তোষে (নিকটতম) হিলি স্থল বন্দর ঘুরে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে বালুরঘাট শহর থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ কিলোমিটার। পক্ষান্তরে মাহীসন্তোষ বাংলাদেশের রাজশাহী শহর (রামপুর-বোয়ালিয়া) থেকে উত্তর দিকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে। নওগাঁ শহর থেকে এর দূরত্ব ৫৯ কিলোমিটার।[২] অন্যদিকে বগুড়া ও জয়পুরহাট শহর থেকে এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ কিলোমিটার এবং ২৭ কিলোমিটার (পশ্চিমে)। উপরের যে কোনো শহর থেকে পাকা রাস্তাযোগে সহজেই মাহীসন্তোষে আসা যায়।

৩. নামকরণ

স্থানটি পাল রাজা মহীপালের (৯৫০-১০৪৩) নামানুসারে মাহীগঞ্জ বা মাহীনগর নামে সমধিক পরিচিত।[৩] মাহীসন্তোষের ঢিবি, সমরসজ্জিতকরণ ও শহর পরিকল্পনা স্থানটির চার মাইল উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন হিন্দুবৌদ্ধ যুগের শহর কোটিবর্ষের (বানগড়) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সে কারণে মনে করা যেতে পারে যে, কোটিবর্ষের মতো এটিও একটি প্রাচীন শহর। এর নামটিও সম্ভবত প্রাচীন। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিতম্' গ্রন্থে রবেন্দ্রভূমিকে পাল রাজাদের 'জনকভূঃ' বা পিতৃভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] পাল যুগের অনেক লিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মাহীসন্তোষের আনুমানিক ৮ কিলোমিটার দূরে রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহার, ২৫ কিলোমিটার দূরে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহার, ১২ কিলোমিটার দূরে পাল যুগের মন্ত্রীদের আবাসস্থল মঙ্গলবাড়ি,[৫] এবং ২৫ কিলোমিটার দূরে কৈবর্ত বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। সে কারণে মনে করা যায় যে, পালদের আবাসভূমির সন্নিকটবর্তী এই শহরটির পত্তন ঘটে সম্ভবত তাদের হাতেই। এখানে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় (দীঘি ও পুকুর) আছে। পণ্ডিতগণের মতে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এসব জলাশয় হিন্দুবৌদ্ধ

---

[২] পূর্বেকার রাজশাহী জেলার মহকুমা এবং বর্তমানে জেলা শহর।

[৩] *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIV, p. 190; A.K.M. Yaqub Ali, "Mahisontosh: An Early Muslim Settlement", S.A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1983), p. 66; রমেশচন্দ্র মজুমদার মাহীসন্তোষ আজও মহীপালের স্মৃতি বহন করছে বলে মন্তব্য করেন। দ্রষ্টব্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: জেনারেল, ১৯৯৮), পৃ. ৭৩।

[৪] "His (Rāmpāla's) beautiful father-land (Varendrī), decorated with houses as well as lines of furrows, was occupied by his enemy named Divya (Divokka), an (officer) sharing royal fortune, who rose to a high position, (but) who took to fraudulant practice as a vow." Dr. R.C. Majumdar *et al* (tr. & ed.), *The Rāmacharitam of Sandhyākaranandi*, (Rajshahi: The Varendra Research Mmuseum, 1939), v. 38 B, p. 30.

[৫] এখানে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভ রয়েছে। এর পাশেই হরগৌরী মন্দির বিদ্যমান। প্রাচীন মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপরে একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই পরিবারের সদস্যরা বংশানুক্রমিকভাবে পাল রাজাদের মন্ত্রী ছিল। পরিবারটি গরুড় স্তম্ভ ও হরগৌরী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী মঙ্গলবাড়িতে বসবাস করতো বলে মনে করা হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বাদাল কুঠির অধ্যক্ষ স্যার চার্লস উইলকিন্স ২৮ পঙ্‌ক্তির (লাইনের) দীর্ঘ লিপি বিশিষ্ট এই স্তম্ভটি আবিষ্কার করেন। এজন্য ইতিহাসে এটি বাদাল স্তম্ভ নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১১ [প্র সং ১৯৮৪]), পৃ. ২৪৭-৫২।

যুগের।[৬] এখানকার মহীপালের দীঘি (মিঠাপুকুর) এখনো মহীপালের স্মৃতি বহন করছে। এসব কারণে মাহীসন্তোষের নামকরণ মহীপালের নামানুসারে হয় বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন।[৭]

কিন্তু, এমত গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুসলমান অধিগ্রহণের পূর্বে স্থানটির নাম মাহীসন্তোষ ছিল না। তেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১২৬০) রচিত মিনহাজ-ই-সিরাজের *তবাকাত-ই-নাসিরি* নামক গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে 'মেসিদা-সন্তোষ' নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] এছাড়া *তবাকাত-ই-আকবরি*তেও সন্তোষ-এর উল্লেখ আছে।[৯] পণ্ডিতগণ উল্লিখিত সন্তোষকে মাহীসন্তোষের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। সেন যুগেও স্থানটি সন্তোষ নামে পরিচিত ছিল।[১০] এর আগে অর্থাৎ পাল যুগে এর নাম যে মাহীসন্তোষ ছিল এমন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সুতরাং, স্থানটির নাম সন্তোষ থেকে মাহীসন্তোষ হয় পরবর্তী কোনো সময়ে, মুসলমান অধিগ্রহণের পরে।

মনে রাখা দরকার, সন্তোষ একটি প্রাচীন শহর এবং দুর্গ।[১১] এর নাম কিভাবে মাহীসন্তোষ হয়, তা বলা দুষ্কর। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে একজন সুফি সাধক মাছের পিঠে চড়ে সন্তোষে আসেন।[১২] মাছের ফারসি প্রতিশব্দ মাহী। সন্তোষের সাথে মাহী যুক্ত হয়ে স্থানটির নাম হয় মাহীসন্তোষ।[১৩] অবশ্য অনেক পণ্ডিত এমতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে, সন্তোষ একটি সংস্কৃত শব্দ। স্থানটির নামকরণের ক্ষেত্রে একজন সুফি এ শব্দটি গ্রহণ করবেন, এমন মনে করা যৌক্তিক হবে না।[১৪] কিন্তু ইতিহাসে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুদের রাখা অনেক স্থানের নাম গ্রহণ করার নজির আছে। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরটির নামকরণ করা হয় হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে। পরবর্তী কালে বখতিয়ার খলজি শহরটি অধিকার করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য, তিনি এর নাম পরিবর্তন করেননি। পরবর্তী সময়ে উচ্চারণের সুবিধার্থে ক্রমান্বয়ে শহরটির

---

[৬] তদেব, পৃ. ২৯৩।

[৭] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লিপি এবং মুদ্রা গবেষক শামসুদ্দিন আহমদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "It is interesting to note that Mahi santosh has anything to do with the muslim occupants of the tomb. Santosh is the name of the Pargana and Mahi is clearly connected with Mahigunj. 'The Mart of Mahi' may consistantly be connected with the buddhist king of 9th or 10th century 'Mahi Pal'." Shamsud-Din Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), p. 74; আরো দ্রষ্টব্য, রমাপ্রসাদ চন্দ *গৌড়রাজমালা* (রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯), পৃ. ৪২; রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

[৮] মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবাকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ৪৮।

[৯] খাজা নিযামুদ্দীন আহমদ, *তবাকাত-ই-আকবরী*, আহমদ ফজলুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ৬৫।

[১০] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

[১১] A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 66.

[১২] Montgomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, Vol. II, (Delhi: Cosmo Publications, 1976), reprint, p. 667; Mir Jahan, "Mint Towns of Medieval Bengal," *Journal of the Pakistan Historical Society*, Vol. I, Part I, p. 409; উদ্ধৃত, A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 66.

[১৩] Ibid.

[১৪] Ibid.

নাম হয় লখ্‌নৌতি।[১৫] এদিক থেকে বিবেচনা করলে মুসলমানদের সংস্কৃত সন্তোষ নাম গ্রহণ না করার পক্ষে তেমন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া, মুসলমান অধিগ্রহণের কয়েক'শ বছর পরও মাহীসন্তোষের (সরকার বরবকাবাদের) একটি পরগণার (মহালের) নাম ছিল সন্তোষ। সংস্কৃত শব্দ বলে প্রত্যাখ্যান করা হলে সন্তোষ নামে এর পরগণার নামকরণ হবে কেন?

জে. পি. স্লেইড প্রমুখ পণ্ডিতগণ অবশ্য স্থানটির (মাহীসন্তোষের) নামকরণের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা মনে করেন, জনৈক মহিলা পীরের কারণে স্থানটির নামকরণ মায়িসন্তোষ বা মাইসন্তোষ হয়।[১৬] স্থানীয় জনশ্রুতি মোতাবেক মাহীসন্তোষে মহীপাল দিঘির (মিঠাপুকুর) পশ্চিমে একটি অনুচ্চ মাঠে অবস্থিত দু'টি মাজারকে জনৈক মহিলা পীর (মা) এবং তাঁর মেয়ের মাজার মনে করা হয়। উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মতে, সন্তোষের সঙ্গে মা শব্দের অপভ্রংশ মায়ি বা মাই যুক্ত হয়ে স্থানটির নাম মায়িসন্তোষ বা মাইসন্তোষ হয়।[১৭] মনে রাখা দরকার, জনশ্রুতি ছাড়া এ মতের সপক্ষে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। এছাড়া মাজার দু'টি যে কার তাও অদ্যাবধি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।[১৮]

যাহোক, হিন্দুবৌদ্ধ যুগের সন্তোষ নামটি মুসলিম যুগ পর্যন্ত চলে আসে। মুসলমানরা প্রথমে স্থানটির নামকরণ করে মাহিসুন। পরে সুলতান রুকন উদ্দিন বরবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৬) নামানুসারে এর নাম হয় বরবকাবাদ। মোগল যুগ পর্যন্ত এর বরবকাবাদ নামটি টিকে ছিল। অবশ্য সন্তোষ নামটিও তখন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়নি। বরবকাবাদের একটি পরগণার নাম দেওয়া হয় সন্তোষ।[১৯] তখন সন্তোষ বলতে আত্রাই নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত মাহীগঞ্জকে (বরবকাবাদ শহর) বুঝাতো। সন্তোষের সন্নিকটবর্তী (একই সরকারের অন্তর্গত) মেসিদা নামক আর একটি বৃহৎ পরগণা ছিল। এটি মাহীগঞ্জের দক্ষিণে জঙ্গীপুর পর্যন্ত আত্রাই নদীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল।[২০] মেসিদা এবং সন্তোষ উভয় পরগণার মধ্যে সংযোগ কেন্দ্র হিসেবে আত্রাই নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত শহরটি যৌক্তিক কারণেই মেসিদা-সন্তোষ বা মাহীসন্তোষ বলে অভিহিত হয়।[২১]

---

[১৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মোঃ আসিফ জামাল লস্কর, *সুলতানি যুগে বাংলার নগরায়ণ* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ. ৬৭।

[১৬] স্লেইড লিখেছেন, "... the city among the remains of which the tomb is situated, is known as 'Santosh' and that the two tombs are said to be those of a lady named 'Mahi Santosh' and daughter. ... the saint 'Santosh' has communicated his name to the Pargana 'Santosh' and that the most remarkable thing is that his name is said to be Sanskrit." উদ্ধৃত, Shamsud-Din Ahmed, op.cit, pp. 73-74.

[১৭] আশীয়ারা খাতুন, "মাহীসন্তোষের ইতিবৃত্ত", মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৩৮৬।

[১৮] সম্প্রতি মাজারটিতে ত্বাকি উদ্দিন আল আরাবির নাম লিখা হয়েছে। যদিও এর সপক্ষে তেমন কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে মাজারের একটি কবর ত্বাকি উদ্দিনের হলে অপরটি কার? ত্বাকি উদ্দিনের কবরের পাশেই বা তাকে কবর দেওয়া হলো কেন?

[১৯] A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 66.

[২০] H. Blochmann, "Contributions to the geography and history of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIV, 1875, p. 284; Jadunath Sarkar (ed.), *The History of Bengal*, Vol. II (Dacca: University of Dacca, 1976), 3rd Impression, 1st Pub. 1948, p. 37.

[২১] A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 66.

৪. নগরায়ণের সূচনা ও বিকাশ

মাহীসন্তোষে কখন থেকে শহরীকরণ শুরু হয় তা সঠিক করে বলা দুষ্কর। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, কম্বোজ রাজ গৌড়পতির কবল হতে বরেন্দ্র উদ্ধার করে মহীপাল মাহীসন্তোষে একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] অবশ্য অদ্যাবধি আবিস্কৃত পাল লিপিসমূহে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নামকরণের সঙ্গে পাল রাজা প্রথম মহীপালের যোগসূত্রের কথা বিবেচনায় নিলে একথা বলা যায় যে, মহীপালের রাজত্বের পূর্বে নগরটির পত্তন ঘটেনি। সম্ভবত এর পত্তন ঘটে মহীপালের রাজত্ব কালে, কিংবা তাঁর পরবর্তী কোনো শাসকের সময়ে।

সাম্প্রতিক সময়ে মাহীসন্তোষ থেকে অনতিদূরে অবস্থিত আমাইড়কে পালদের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।[২৩] অনেক গবেষক একে রামপালের রাজধানী রামাবতী বলে মনে করেন। আবার অনেকের মতে, স্থানটি পাল রাজাদের বাসস্থান বা জয়স্কন্ধবার।[২৪] আমরা জানি রামপাল কৈবর্ত রাজ ভীমের নিকট থেকে হৃত পিতৃভূমি (বরেন্দ্রভূমি) পুনরুদ্ধার করার পর রামাবতীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি রাজধানীর অনতিদূরে জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সম্প্রতি জগদ্দল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এটি আমাইড় থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার উত্তরে।[২৫] সোমপুর বিহারও এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এছাড়া এর সন্নিকটবর্তী মঙ্গলবাড়িকে পাল-মন্ত্রীদের আবাসস্থল মনে করা হয়।[২৬] তাই স্থানটি (আমাইড়) পালদের রাজধানী রামাবতী হওয়া অসম্ভব নয়। কৌশলগত কারণে পাল রাজারা রাজধানীর সন্নিকটবর্তী আত্রাই তীরের মাহীসন্তোষে দুর্গ বা দুর্গ নগরী গড়ে তুলবেন, এটিই স্বাভাবিক। মাহীনগর বা মাহীসন্তোষ সম্ভবত পাল যুগে গড়ে ওঠা

---

[২২] আশীয়ারা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪।

[২৩] আমাইড় নওগাঁ জেলার নজিপুর (পত্নীতলা) উপজেলাধীন একটি গ্রাম। মাহীসন্তোষ থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এর দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার।

[২৪] সম্প্রতি একজন গবেষক লিখেছেন, "আমাইরকে কেউ কেউ প্রাচীন রামাবতী নগর বলে মনে করেন। উত্তর বঙ্গে 'র' অক্ষর অনেক স্থানে 'অ' রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমাইরকে (আমাইর<আমাইর<রা্মইর<রামাবতী) রামাবতী বলার পিছনে কিছু কষ্টকল্পিত ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যায়। তবে এখানে রামাবতীকে টেনে আনার পিছনে বিশেষ কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। খুব নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও খুব সম্ভব পাল যুগের প্রথম দিকেই আমাইরে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় পাল নৃপতি মহারাজ ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত পাহাড়পুর বিহার এস্থান থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। গরুড় স্তম্ভ লিপি থেকে অনুমিত হয় যে, সে সময়ে মঙ্গলবাড়িতে ছিল ব্রাহ্মণ কেদার মিশ্র-গুড়ব মিশ্র প্রমুখ মন্ত্রীদের নিবাস। সে ক্ষেত্রে নৃপতির নিবাস যে সে স্থান থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না তা সহজেই ধারণা করা যায়। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে মনে হয় যে, আমাইরেই ছিল নারায়ণপাল বা তার পূর্বসূরিদের বাসস্থান বা জয়স্কন্ধবার।" আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রত্নকীর্তি," মুহঃ মমতাজুর রহমান ও অন্যান্য সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬। অবশ্য জনাব যাকারিয়া তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তিনি স্থানটিকে পাল রাজাদের আবাসভূমি, জয়স্কন্ধবার অথবা তাদের রাজধানী রামাবতী বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬।

[২৫] সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এখানকার ঢিবি উৎখনন করে বিভিন্ন প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে। স্থানটি ধামইরহাট উপজেলার জগদ্দল নামক গ্রামে অবস্থিত। ধামইরহাট উপজেলা সদর থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত এই গ্রামটির দূরত্ব তিন থেকে চার কিলোমিটার।

[২৬] লিপি খোদিত গরুড় স্তম্ভ (বাদাল স্তম্ভ লিপি) থাকায় স্থানটিকে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুড়ব মিশ্র এবং তাঁর পরিবারের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ পরিবারটি বংশানুক্রমিকভাবে পালদের মন্ত্রী ছিল।

এমন একটি দুর্গ বা দুর্গ নগরী। এ যুগে এর বিকাশ সম্পর্কে জানবার কোনো উৎস আমাদের নিকট নেই। একইভাবে সেন যুগেও এর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেন যুগ পর্যন্ত নগরটি টিকে ছিল। তা না হলে বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা এখানে বসতি স্থাপন করতো না।

মুসলমানরা মাহীসন্তোষে কখন থেকে বসতি স্থাপন শুরু করে? ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন। এরপর তিনি বিজিত রাজ্যকে বিভিন্ন ইক্তায় ভাগ করে খলজি মালিকদের উপর এসব ইক্তার শাসনভার অর্পণ করেন। ইক্তার শাসনকর্তাকে মুক্তা বলা হতো। মিনহাজ-ই-সিরাজের *তবাকাত-ই-নাসিরি* গ্রন্থে নারকৌটি, গঙ্গতরী, দেওকোট প্রভৃতি ইক্তার উল্লেখ আছে। বখতিয়ারের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং পরবর্তীকালে সুলতান (বাংলার শাসক) আলী মর্দান খলজি এবং ইওয়াজ খলজি যথাক্রমে নারকৌটি ও গঙ্গতরীর মুক্তা ছিলেন। গ্রন্থটিতে এ সময়ের অপর ঐতিহাসিক চরিত্র মোহাম্মদ শিরান খলজিকে সন্তোষের শাসনকর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতগণ সন্তোষকে মাহীসন্তোষের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। বখতিয়ার খলজি মাহীসন্তোষকে ইক্তার মর্যাদা দিয়ে শিরান খলজিকে এর মুক্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন কি-না, সমসাময়িক উৎসে এর কোনো উল্লেখ নেই। তবে, অনেকে সন্তোষকে বখতিয়ারের রাজ্যের অন্যতম ইক্তা মনে করেন। প্রফেসর ইয়াকুব আলী লিখেছেন, "But the circumstantial evidence ascribes to it (Santosh) the status of an *iqta* and its *muqta* is presume to have been 'Izz al-Din Muhammad Shiran Khalji. His martial exlpoits and military skill in the conquest of Nadiya and his unquestioned loyalty possibly induced Muhammad Bakhtiyar Khalji to have him posted in the strategic place of Masidah-Santush."[২৭] কিন্তু শিরান খলজির রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় নিলে এমত গ্রহণ করা যায় না। বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পরে শিরান দেওকোটের সিংহসনে বসেন। তাঁর পূর্ব শাসিত অঞ্চল সন্তোষ ইক্তা হলে মিনহাজ অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। বিশেষ করে শিরানের পূর্ব পরিচয় মুক্তা হলে তা উল্লেখ না করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তবে সন্তোষ বখতিয়ারের রাজ্যে ইক্তার মর্যাদা না পেলেও এর বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। সম্ভবত সে কারণেই বখতিয়ার শিরানের মতো একজন বিশ্বস্ত ও সামর্থ্যবান সহচরকে এর দায়িত্ব দেন। স্থানটি ক্রমান্বয়ে শিরান ও তাঁর সমর্থকদের শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমরা জানি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে শিরান দেওকোটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমাজ রুমির হাতে পরাজিত হয়ে তিনি মাহীসন্তোষে আশ্রয় নেন। এখানে সপক্ষের বিদ্রোহীদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁকে মাহীসন্তোষেই সমাহিত করা হয়।[২৮]

---

[২৭] A.K.M. Yaqub Ali, opcit. p. 65.

[২৮] ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি স্বীয় সহচর আলী মর্দানের হাতে নিহত হন। আলী মর্দানকে শাস্তি দানের জন্য শিরান নারকৌটি অভিযান করেন। সফল এই অভিযানে তিনি আলী মর্দানকে আটক করেন এবং ফৌজদার বাবা সাফাহানের নিকট বন্দি রাখেন। এরপর খলজি মালিকরা তাঁর উপর লখ্নৌতির শাসনভার অর্পণ করে। ইতোমধ্যে আলী মর্দান বাবা সাফাহানের বন্দিশালা থেকে কৌশলে মুক্ত হয়ে দিল্লিতে কুতুবুদ্দিন আইবকের শরণাপন্ন হন। দিল্লির সুলতান লখ্নৌতির রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পান। তিনি অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমিকে লখ্নৌতি রাজ্যে খলজি মালিকদের অবস্থান নির্ধারণ করে দেবার আদেশ দেন। রুমি স্বসৈন্যে লখ্নৌতিতে পৌঁছান এবং দেওকোটের শাসনভার শিরানের পরিবর্তে ইওয়াজ খলজির হাতে অর্পণ করে স্বদেশের পথে রওনা হন। অধিকাংশ খলজি মালিক এ বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা শিরানের নেতৃত্বে দেওকোট আক্রমণের জন্য একত্র হন। এ সংবাদ রুমির নিকট পৌঁছালে তিনি আবার ফিরে আসেন এবং যুদ্ধে

তেরো শতকের প্রারম্ভেই (কায়েমাজ রুমির অভিযান কালে) মেসিদা-সন্তোষ (মাহীসন্তোষ) একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বাংলার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী খলজি মালিকগণের আশ্রয় লাভের মতো উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চয়ই এখানে ছিল। এছাড়া তারা এখানে আশ্রয় নিবে কেন? বস্তুত, এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা লগ্নে খলজি মালিকরা লখ্‌নৌতি ও দেওকোটের মতো মাহীসন্তোষেও বসতি স্থাপন করে এবং শহরটিকে তাদের অন্যতম শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে।

অবশ্য বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের আগেই মাহিসুনে (মাহীসন্তোষে) মুসলিম বসতি আরম্ভ হয় বলে অনেকে মনে করেন।[২৯] এঁদের মতে, এখানে সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার[৩০] অনেক সুফি সমাহিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১] হলায়ুধ মিশ্রের নামাঙ্কিত 'শেক শুভোদয়া' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রধান গুরু শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজি ১১২৪ শকাব্দে লখনৌতিতে

শিরান ও তাঁর সহযোগীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। শিরান মেসিদা-সন্তোষে আশ্রয় নেন। এখানে স্বপক্ষের খলজি মালিকরা শিরানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং তাকে হত্যা করে। উল্লিখিত মেসিদা সন্তোষকে মাহীসন্তোষের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। মীনহাজ-ই-সিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫, ৪৮।

[২৯] বিশিষ্ট গবেষক এনামুল হক মনে করেন, এগারো শতকে উত্তর ভারতে সুফিদের আগমনের ধারাবাহিকতায় বাংলায়ও সুফিদের আগমন ঘটে। তিনি লিখেছেন, "... that Sufiism in Bengal was the continuation of Sufiism in Northern India, and that the eleventh century A.D. was the probable time when Sufiism was first introduced into India." তিনি এগারো শতকের মধ্যভাগে বাংলায় আগত দু'জন সুফির কথা উল্লেখ করেন। এরা হলেন শাহ্ সুলতান রুমি এবং বাবা আদম। তাঁর মতে, শাহ্ সুলতান রুমি ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহে আসেন এবং বাবা আদম ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন। এদের পরে জালাল উদ্দিন তাব্রিজির পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কোন সুফি আসেননি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, "We have not yet found any reliable proof of the advent of other Sufis anterior to or immediately following these two solitary figures."[২৯] বস্তুত, জালাল উদ্দিন তাব্রিজির পূর্বে বাংলায় সুফিদের আগমনের কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না, একথা জনাব হক সমর্থন করেন। যাহোক, প্রফেসর আব্দুল করিমসহ আধুনিক গবেষকগণ জনাব হকের মতের উপরে আস্থাশীল নন। প্রফেসর করিম জোরালো যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, উল্লিখিত দুজন সুফিও বাংলায় আসেন এদেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হবার পর। দ্রষ্টব্য, Muhammad Enamul Haque, *A History of Sufi-ism in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1975), pp. 5, 6, 144, 145; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল* (২য় সং; ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭ [প্র সং ১৯৭৭]), পৃ. ৪১-৪৩।

[৩০] শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম লিখেছেন, "... সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সিলসিলাও এদেশে (ভারতে) চিশতিয়া তরিকার ন্যায় একটি প্রাচীন তরীকা। এমনকি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তো চিশতিয়া তরীকার চাইতে এ তরীকার অবদানই বেশি মনে হয়।" দ্রষ্টব্য, প্রফেসর ড. শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম, *উপমহাদেশে* ইসলামি *শিক্ষা (আবে কাউসার)*, (মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতী অনূদিত), (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ২০২।

[৩১] প্রখ্যাত পীর মির সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি এ তথ্য প্রদান করেন। দ্রষ্টব্য, Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)*, (Chittagong: Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985), 2nd revised ed., p. 96; S.H. Askari, "New Light on Raja Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jawnpur from Contemporary Correspondence of Muslim Saints," *Bengal Past and Present*, 1948, No. 130, p. 35; A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 63.

আসেন।[৩২] খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি মোতাবেক সময়টি ১২০২ সাল। সে মোতাবেক বাংলায় সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিদের আগমন ঘটে মুসলমান শাসনারম্ভের (১২০৪) আগেই। কিন্তু এমত গ্রহণ করা দুষ্কর। মুসলমানদের নদীয়া জয়ের পূর্বে বাংলায় সুফিদের বসবাস এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল না। এছাড়া *শেক শুভোদয়াকে* একটি জাল গ্রন্থ মনে করা হয়।[৩৩] তাই সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে আরো বেশি নির্ভরযোগ্য সূত্রের সন্ধান করা জরুরি। সমসাময়িক সুফি খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকির *ফাওয়াইদ আল সালেকিন*,[৩৪] গোলাম সারওয়ারের *খাজিনাত আল-আসফিয়া* এবং আব্দুল হক মুহাদ্দিসের *আখবার আল-আখিয়ার* এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে। এসব উৎসের সাক্ষ্য মতে, শেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের (১২১০-'৩৬) সময়ে দিল্লিতে আসেন।[৩৫] দিল্লিতে পৌঁছানোর আগেই তাব্রিজি লখ্‌নৌতিতে এসেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। ইলতুৎমিশ ১২১০ থেকে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতান ছিলেন। তাই একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, ১২১০ খ্রিস্টাব্দের পরে এবং ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোনো এক সময়ে তাব্রিজি দিল্লিতে আসেন। দিল্লির শায়খ-উল-ইসলাম মাওলানা নাজমুদ্দিন সুগরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হলে তিনি দিল্লি ত্যাগ করে বাংলায় আসেন। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার সন্নিকটবর্তী দেওতলায় তিনি আস্তানা গাড়েন। এ সময়ে তাব্রিজি ছাড়া শেখ আখি সিরাজ উদ্দিন উসমান, আব্দুল হক, নূর কুতুব উল আজম জাহিদ প্রমুখ সুফিও দেওতলায় আসেন এবং তাঁরা সমগ্র উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েন। এদের অনেকে মাহিসুনে আসেন এবং এখানে অবস্থান করে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন।[৩৬] সমসাময়িক উৎস থেকে জানা যায় যে, মাহিসুনে সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার অনেক সুফি সমাহিত আছে। এতদঞ্চলে এদের আগমন ঘটে সম্ভবত ১২১০ খ্রিস্টাব্দের পর।

অনেক পণ্ডিত অন্যভাবে বখতিয়ার-পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের আগমনের কথা চিন্তা করেন।

---

[৩২] জালাল উদ্দিন তাব্রিজি মুসলিম শাসনামলে বাংলায় আগত একজন খুবই বিখ্যাত সুফি। তাঁর জন্মস্থান ইরানের তাব্রিজে। বাংলায় সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিবাদ জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাব্রিজি বিশেষ অবদান রাখেন। পরবর্তী কালে তাঁর নামানুসারে সুফিবাদে জালালিয়া তরিকার উদ্ভব হয়। তাব্রিজির অনেক শিষ্য দেওতলায় শায়িত আছেন এবং তাঁর নামে স্থানটির নামকরণ হয় জালালাবাদ। দ্রষ্টব্য, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস, ১২০৪-১৫৭৬* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০০), ১১৫; A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 64.

[৩৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

[৩৪] অনেক গ্রন্থে তাব্রিজির জীবনী বিধৃত হয়েছে। এসবের মধ্যে তার সমসাময়িক খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকি রচিত *ফাওয়াইদ আল সালেকিন*-কে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ১১৫।

[৩৫] বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, তাব্রিজি দুজন গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শেষে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১০-৩৬)-এর সময়ে দিল্লি আসেন। এরপর তিনি বাংলায় আসেন। দ্রষ্টব্য, A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 64; সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ১১৫।

[৩৬] গোলাম রসুল লিখেছেন, "These celebrated personages (sufis of Deotola) shed lustre on the social, cultural and religious life of North Bengal. Gaur, Pandua in Malda district and Bagha and Mahisun (Mahisantosh) in Rajshahi district and Sonargon in Dacca district held the torch of learning Khanas of the Sufi saints, maintained out of public charity, offerred in veneration of the saints, ministered to the needs of the poor and the distressed, the mendicants and the travellers by proving them food and asylams." দ্রষ্টব্য, M.G. Rasul, "Sufis and Saints in Rajshahi", S.A. Akanda (ed.), op.cit, p. 85.

বিখ্যাত বৌদ্ধ পুরাকীর্তি পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলিফার একটি মুদ্রা এবং রাজা গণেশের সময়ে প্রখ্যাত সুফি নূর কুতুব আলম কর্তৃক জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শর্কিকে লেখা একটি পত্র থেকে এমন ধারণা করা হয়।[৩৭] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির তারিখ ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। বলা বাহুল্য এটি বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় চার শত বছর পূর্বের। আর নূর কুতুব আলমের পত্রে বাংলাকে তিনশত বছরের পুরাতন 'ঐস্লামিক ভূমি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা গণেশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে উক্ত সুফি লিখেন, "প্রায় তিনশত বছর বাদে ঐস্লামিক ভূমি বাংলায় বিশ্বাস (ধর্ম) ধ্বংসকারী কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।"[৩৮] বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া বিজিত হয় ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে। পত্র লিখার সময় থেকে যা ছিল ২১০-১১ বছর পূর্বে। সুফির দাবি, এরও শতবর্ষ আগে মুসলমানরা এদেশে বসবাস করতো। কিন্তু অন্য কোনো উৎসে এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না গেলে এমনতর দাবি প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। প্রথমত, বাংলায় মুসলমানদের বসতি স্থাপন ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণেও পাহাড়পুরে আব্বাসীয় মুদ্রার আগমন ঘটতে পারে। প্রাচীন যুগে বাংলার সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে মুদ্রাটির এই বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারে চলে আসা অসম্ভব নয়। বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষ করে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। এখান থেকেও কোনো ভাবে এই মুদ্রা পাহাড়পুর পর্যন্ত চলে আসতে পারে। অনেক মানুষকে এখনো প্রাচীন মুদ্রা কবচ হিসেবে সংরক্ষণ করতে দেখা যায়। এমন হতে পারে বাংলা জয়ের পরে কোনো মুসলমান আগন্তুক কবচ হিসেবে বা অন্য কোনো কারণে সংরক্ষণ করা পুরাতন মুদ্রাটি পাহাড়পুরে নিয়ে এসেছে। পাহাড়পুরে উৎখনন কালে মাটির অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে মুদ্রাটি পাওয়া গিয়েছিল। সেকারণে প্রাক-মুসলিম আমলেই যে মুদ্রাটি এখানে এসেছিল সেকথা জোর দিয়ে বলা যায় না।[৩৯] তাই শুধুমাত্র এই মুদ্রাটির উপর নির্ভর করে বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের অনেক আগেই (একশো বছর আগে) মুসলমানরা এদেশে এসে বসবাস শুরু করে, এমন দাবি করা সমীচীন হবে না।

দ্বিতীয়ত, নূর কুতুব আলম বাংলার অতীত রাজনৈতিক ঘটনাবলি, বিশেষ করে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের সন-তারিখ সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল ও সজাগ ছিলেন, তা বলা মুশকিল। হয়তো তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করে 'ঐস্লামিক' বাংলাকে তিনশত বছরের পুরনো বলে দাবি করেছেন, বাস্তবে যা ছিল দুই শতাব্দী কালের কিছু বেশি সময়ের।[৪০] সুতরাং নদীয়া জয়ের আগেই মুসলমানরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে মাহিসুনে বসতি স্থাপন করে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে ১২১০ খ্রিস্টাব্দের পর সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিদের মাধ্যমে মাহিসুনে মুসলমানদের আগমন ঘটে, এমন মনে করাই যৌক্তিক হবে।

১২১০ খ্রিস্টাব্দের কত পরে সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিরা মাহিসুনে আসে, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১২০৮ থেকে ১২১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লখ্নৌতি রাজ্যের শাসক ছিলেন আলী মর্দান খলজি। তিনি দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবকের সমর্থনপুষ্ট ও খিলাতপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন। মিনহাজের বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দিল্লির সুলতানের (কুতুব উদ্দিন আইবকের) সঙ্গে আলী মর্দানের

---

[৩৭] ইনি হযরত পাণ্ডুয়ায় বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন।

[৩৮] উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩।

[৩৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

[৪০] সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।[৪১] এছাড়া আলী মর্দান সকল অনুগ্রহ প্রার্থীকে অকৃপণভাবে সাহায্য করতেন বলেও মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। ইসলাম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ সুফিদের (তাব্রিজি ও তাঁর অনুসারীদের) তাঁর আমলেই দিল্লি থেকে বাংলায় আসবার কথা। কিন্তু তাব্রিজি তাৎক্ষণিকভাবে দিল্লি ত্যাগ না করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন বলে প্রমাণ রয়েছে। *তবাকাত-ই-নাসিরি*তে আলী মর্দান খলজিকে একজন ঔদ্ধত, কপট, অহংকারী, নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে।[৪২] তাঁর সময়ে বাংলায় সুফিদের আগমন ঘটলে এবং তারা ধর্ম প্রচারে সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রখ্যাত আলেম মিনহাজ এমন মন্তব্য করতেন না। এসব দিক বিবেচনা করে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, আলী মর্দানের সময় পর্যন্ত সুফিরা বাংলায় তথা মাহিসুনে আসেনি। তারা এদেশে আসে পরবর্তী শাসক গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খলজির (১২১২-১২২৭) আমলে।[৪৩] ইওয়াজ খলজি উলেমা, মাশায়েখ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা দেন এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে এবাদতখানা ও মসজিদ স্থাপন করেন বলে *তবাকাত*-এ উল্লেখ আছে।[৪৪] সম্ভবত তাঁর শাসনামলে সুফিরা এদেশে আসে এবং মাহিসুনসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এতদঞ্চলে সুফিদের প্রভাব বেড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও খানকাহ স্থাপিত হয়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পুরাতন 'দরগা' ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এসব 'দরগা' ও মসজিদের সঙ্গে মাহীসন্তোষের যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তবে, নিবিড় গবেষণা ব্যতীত এক্ষেত্রে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হবে না। যাহোক, গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ খলজির আমলে মাহিসুনে প্রশাসক খলজি মালিকদের পাশাপাশি ধর্মপ্রচারক সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিদের আগমন ঘটে। এরা বসতি গেড়ে ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করলে শহরটি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে।

মাহীসন্তোষের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানও এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ থেকেই এটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সম্ভবত সে কারণেই এখানে দুর্গ স্থাপিত হয় ও শহরের পত্তন ঘটে। সম্প্রতি মাহীসন্তোষে একটি প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। মিঠাপুকুরের উত্তরে অবস্থিত আয়তাকার এই দুর্গ উত্তর-দক্ষিণে ২৫৫ মিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৭৫ মিটার প্রশস্ত। দুর্গটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য আত্রাই নদীকে এর উত্তর এবং পশ্চিম দিকের পরিখা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে পরিখা খনন করা হয়। পরিখার ভেতরের দিকে রয়েছে পাহাড়ের মতো উঁচু মাটির গড়। দুর্গটি কখন নির্মিত হয় তা বলা দুষ্কর। তবে, পণ্ডিতগণ একে হিন্দুবৌদ্ধ যুগের বলে মনে করেন। সম্ভবত, হিন্দুবৌদ্ধ যুগে এটি নির্মিত হয় এবং মুসলমানরা সংস্কার সাধন পূর্বক একে আরো বেশি সুরক্ষিত করে গড়ে তোলে। রাজ্যের উত্তর সীমান্তে কামরূপের হুমকি মোকাবেলা করা এর উদ্দেশ্য। বরবক শাহের সেনাপতি ও প্রখ্যাত পীর শাহ ইসমাইল গাজি মাহিসুনে কামতা-কামরূপের বাহিনীর নিকট পরাজিত হন।[৪৫] সম্ভবত, শাহ ইসমাইল পিছু হটে মাহিসুন দুর্গে

---

[৪১] মীনহাজ-ই-সিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

[৪২] তদেব, পৃ. ৫২-৫৩।

[৪৩] একজন গবেষক লিখেছেন, "The advent of Shaykh Jalal al-Din Tabrizi in this land might have sinchronized with the reign of Sultan Ghiyath al-Din 'Iwad Khalji. With him the *suhrawardia* order of *sufism* possibly started in this land and several disciples of this order made their habitation at Mahishun." A.K.M. Yaqub Ali, op.cit, p. 64.

[৪৪] মীনহাজ-ই-সিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

[৪৫] *রিসালাত-ই-শুহাদা* থেকে সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত। সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩।

অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া কামতা-কামরূপ বাহিনীর মুসলিম রাজ্যের এতো ভেতরে আসার প্রয়োজন হতো না। যাহোক, এ যুদ্ধে অনেক মুসলমান সৈন্য নিহত হয়। এদের মাহিসুনেই দাফন করা হয়। মাহীসন্তোষে মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উত্তর পাশে একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের এখানে কবর দেওয়া হয় বলে অনেকে মনে করেন। যদিও, অদ্যাবধি এদের কবর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাহীসন্তোষে টাঁকশাল বসে। এ সময়ে শহরটির নতুন নামকরণ হয় বরবকাবাদ। এ টাঁকশাল থেকে উৎকীর্ণ সাতটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর ছয়টি রৌপ্য এবং একটি তাম্র মুদ্রা। এগুলোর মধ্যে চারটি রৌপ্য মুদ্রা রুকন উদ্দিন বরবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) আমলে জারিকৃত।[৪৬] এ চারটি মুদ্রার মধ্যে তিনটি রৌপ্য মুদ্রা ৮৬৪ হিজরিতে (১৪৫৯) এবং একটি রৌপ্য মুদ্রা ৮৭৩ হিজরিতে (১৪৬৮) জারি করা হয়। বাকি তিনটি মুদ্রার একটি রৌপ্য মুদ্রা সুলতান শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহের (১৪৯০-১৪৯৩) আমলে ৮৯৬ হিজরিতে (১৪৯০) এবং একটি রৌপ্য মুদ্রা ও একটি তাম্র মুদ্রা সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩২) ৯২৮ হিজরিতে (১৫২২) জারিকৃত।[৪৭]

মাহীসন্তোষ একটি সুরক্ষিত ও বিকশিত শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই। এছাড়া এখানে টাঁকশাল স্থাপিত হতো না। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বরবকাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা জারি অব্যাহত থাকায় একথা সহজেই বোঝা যায় যে, অন্তত ষোলো শতকের বিশের দশক পর্যন্ত শহরটির অবস্থা ও গুরুত্বের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। পরবর্তী কালে সম্ভবত এর গুরুত্ব কিছুটা কমে যায়। ফলে টাঁকশালটি আর চালু থাকেনি। অবশ্য, এরপরও উল্লেখযোগ্য শহর হিসেবে বরবকাবাদ টিঁকে ছিল। মোগল যুগের দলিলপত্রে বরবকাবাদ শহরের উল্লেখ আছে। মনে রাখা দরকার, মুসলিম যুগে সামরিক প্রয়োজনে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা, সুরক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত নগরকে যথাক্রমে খিত্তা ও কসবা বলে অভিহিত করা হতো। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক সুবিধা সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ নগরকে বলা হতো শহর।[৪৮] বলাবাহুল্য, আকবরের সময় পর্যন্ত সমৃদ্ধ বড় নগর হিসেবে টিকে না থাকলে

---

[৪৬] বরবক শাহ বাংলার সুলতান হবার আগেই তাঁর নামে বরবকাবাদ টাঁকশাল থেকে এই মুদ্রা জারি হয়। সম্ভবত, তাঁর পিতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় থেকে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য আগে থেকে সুলতান তাঁর উত্তরাধিকারীকে কিছু কিছু ক্ষমতা ও তদারকের দায়িত্ব দিতেন। সে কারণেই সিংহাসনারোহণের পূর্বেই বরবকের নামে মুদ্রা জারি সম্ভব হয়। এছাড়া মাহীসন্তোষের নামও পরিবর্তন করে বরবকাবাদ রাখা হয় সম্ভবত বরবকের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই। এছাড়া এখানে প্রতিষ্ঠিত টাঁকশাল বরবকাবাদ টাঁকশাল হিসেবে আখ্যায়িত হবার কথা নয়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১-৫২; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫।

[৪৭] মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মোঃ মনিরুল হক, "মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুসলিম পুরাকীর্তি: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা", *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, ১০ম সংখ্যা, জুলাই, ২০১৩, পৃ. ৮-১০।

[৪৮] মুসলিম যুগে বাংলাকে বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকায় বিভিক্ত করা হয়। এগুলোর মধ্যে ইলকিম, আরসা, শহর, কসবা এবং খিত্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইলকিম বলতে বড়ো এলাকা এবং আরসা বলতে ছোট এলাকাকে বুঝাতো। বস্তুত, আরসা ছিলো ইলকিমের অংশবিশেষ। ইলকিমকে বর্তমান যুগের বিভাগ এবং আরসাকে জেলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অন্যদিকে, শহর বলতে বুঝাতো নগরকে। সুদৃঢ় সুরক্ষা ব্যবস্থা বিশিষ্ট নগরকে খিত্তা এবং কম সুরক্ষিত নগরকে কসবা বলা হতো। খিত্তা ও কসবাকে সামরিক ছাউনির সঙ্গে তুলনা করা চলে। স্থায়ী সামরিক ছাউনিকে খিত্তা এবং অস্থায়ী সামরিক ছাউনিকে কসবা বলা হতো। সামরিক প্রয়োজনে

বরবকাবাদকে শহর বলে অভিহিত করা হতো না।

সম্রাট আকবর বরবকাবাদকে বাংলা সুবার অন্যতম সরকারের মর্যাদা দেন।[৪৯] মাহীসন্তোষ কেন্দ্রিক এই সরকার দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া এবং রাজশাহী ও পাবনা জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল। ৩৮টি মহালকে (পরগণা) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টোডরমলের রাজস্ব তালিকা (rent roll) মোতবেক বরবকাবাদ সরকারের রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১৭,৪৫১,৫৩২ দাম বা ৪৩৬,২৮৮ রুপি। নিচের সারণিতে সরকারটির মহাল ওয়ারী রাজস্বের পরিমাণদেওয়া হলো:

সরকার বরবকাবাদের বিভিন্ন মহালের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব

মহালের নাম		নির্ধারিত রাজস্ব (দাম)	মহালের নাম		নির্ধারিত রাজস্ব (দাম)
আমরুল	:	৫৬০,৩৮২	শেরপুর ও বহামপুর (২ মহাল)	:	৩৯১,৬২৫
বরবকাবাদ শহর	:	৩১৫,৩৪০	তাহিরপুর	:	৫০৫,৮২৫
বাসুউল (বাশদল)	:	১৯০,৮৮৫	কাজিহাটি	:	৬২০,৪৭৭
পোলারহাট	:	১৩৬,৭১২	করদহ	:	১,৩৯০,৫৭২
পুসতু (বাসটোল)	:	৬৫২,৩৬৭	গুজরহাট	:	১,২৯৬,২৪০
বারবাড়িয়া	:	৬৪,৩৩৫	খাস	:	৮৮১,০৮০
বনগাঁও	:	৩১৯,০০০	জগদল হিসেবে পরিচিত গঞ্জ	:	৬৯৪,৬৫৫
পালতাপুর	:	১৭৯,৮৪০	গোবিন্দপুর	:	৪১০,৫৩৫
ছান্দিয়া বাজু	:	৭৫৫,৫২২	কালিগাই কোঠা	:	৩৪১,০৫৭
চাউরা	:	১৫৯,৮৩২	খুরাইল (খারাল)	:	২১০,১৩২
জিয়াসিন্ধ (জাহাসন্ধ) ও চাউগাঁও (২ মহাল)	:	৪০৭,০০৭	কোদানগর	:	১২৯,৫৫০
চাঁদলাই (জাঁদলাই)	:	২৮৯,৩৪০	কালিগাঁও (কালিগাই)	:	১৯৬,৯৩২
জানাসু (ঝাঁকুড়)	:	৮৫,৭৮৭	লস্করপুর	:	২৫৫,০৯০

গড়ে ওঠা এ দুই ধরনের নগরের সাথে শহরের বিশেষ পার্থক্য ছিল। শহর ছিলো গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী নগর, বিশেষত ব্যবসা কেন্দ্র। দ্রষ্টব্য, মোঃ আসিফ জামাল লস্কর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

[৪৯] আকবরের সময়ে বাংলা সুবার এই ২৪টি সরকার আবার ৭৮৭টি মহালে বিভক্ত ছিল। এ সুবার মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি, ৮৪ লক্ষ, ৫৯ হাজার, ৩শত ১৯ দাম বা ১৪,৯৬১,৪৮২-১৫-৭ রুপি। বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারে ২৩,৩৩০ গোলন্দাজ, ৮০১,১৫০ পদাতিক, ১,১৭০ হস্তী, ৪,২৬০ বন্দুক এবং ৪,৪০০ নৌকা সরবরাহ করতে হতো। মনে রাখা দরকার, এসময়ে মূল ভূখণ্ড ১৯টি সরকারের পাশাপাশি উড়িষ্যার ৫টি সরকারও বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যার ৫টি সরকার ৯৯টি মহালে বিভক্ত ছিল। আকবরের সময়ে এদের রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল ১,২৫,৭৩২,৬৩৮ দাম। যাহোক, বরবকাবাদ ছিল বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকার। এ সরকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, এখানে গঙ্গাজল (গঙ্গার পানি) নামে সুন্দর কাপড় উৎপন্ন হতো। এছাড়া এখানে প্রচুর কমলালেবুও জন্মাতো। Abū'l-Fazl Allāmī, tr. Colonel H.S. Jarrett, *Aīn-i Akbarī*, Vol. II (reprint; New Delhi: Atlantic Publishers & Distributers, 1989), p. 141, 150.

মহালের নাম		নির্ধারিত রাজস্ব (দাম)	মহালের নাম		নির্ধারিত রাজস্ব (দাম)
উপশহর, সুখ শহর জেলা	:	১,৬২৯,১৭৫	মাজিলপুর (মালজিপুর)	:	৯২৫,৬৮০
ধামীন (ধারমান)	:	৩৫০,৮৯৫	মসিদা (মাসধা)	:	৬৮৯,৭১২
দাউদপুর	:	৮,৯০২	মান সামালি	:	৫৯৪,৭৯২
শঙ্করদল, সাধারণত নিজামপুর	:	৩৮৯,৯৭৫	মাহমুদপুর	:	১২৪,৫৩২
শিকারপুর	:	৩২৭,৩৪২	ওয়াজিরপুর	:	১৬৯,১৯০

উৎস : Abū'l-Fazl Allāmī, tr. Colonel H.S. Jarrett, *Aīn-i Akbarī*, Vol. II (reprint; New Delhi: Atlantic Publishers & Distributes, 1989), p. 150.

এছাড়া বরবকাবাদ দিল্লিকে ৫০ অশ্ব এবং ৭,০০০ পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করতো।[৫০]

মাহীসন্তোষ (বরবকাবাদ) মুসলিম বাংলার অন্যতম প্রধান শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। মুসলমান শাসকরা রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খান্‌কা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫১] ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁরা এমন উদ্যোগ নেন। নামাজ আদায়ের পাশাপাশি মসজিদসমূহে মক্তব স্থাপন করে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাদ্রাসা।[৫২] এর পশাপাশি খানকার মাধ্যমে সুফিরা ধর্ম প্রচার আরম্ভ করে। মুসলিম যুগে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা) গড়ে তোলা হয়। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে মাহীসন্তোষেও এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভি. ওয়েস্টম্যাকট মাহীসন্তোষ থেকে দুটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। শিলালিপি দুটির একটি বড় এবং অপরটি আকারে ছোট। বড়ো শিলালিপিটি 'মাহী' বা 'মায়িসন্তোষ' নামক জনৈক মহিলা পীরের মাজারের ভেতরে দরজার উপরে দেয়ালে লাগানো ছিল। এর পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, রুকন উদ্দিন বরবক শাহের শাসনামলে খান-উল-মুয়াজ্জেম উলুগ ইকরার খান ৮৩৫ হিজরি সনে (১৪৬০-'৬১) খান-ই-মুয়াজ্জম আশরাফ খানের মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫৩] বলা বাহুল্য পিলিটি মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক এবং মাজারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক

---

[৫০] আইন-ই-আকবরিতে বরবকাবাদকে ৭,০০০ পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করতে হতো বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে রচিত শামসুদ্দিন আহমদের গ্রন্থে এ সংখ্যা ৭০০ দেখানো হয়েছে। সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদের কারণে এমন ঘটেছে। দ্রষ্টব্য, Abū'l-Fazl Allāmī, op.cit, Vol. II, p. 150.; Shamsud-Din Ahmed, op.cit, p. 90.

[৫১] A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi: M. Sajjadur Rahim, 1998), 238.

[৫২] Ibid.

[৫৩] লিপিটিতে লিখিত হয়েছে,

"قال النبى طلى الله عايه و سلم من بنى المسجه فى الدنيا بنا الله سبعين قصرا فى لجنة - بنى المسجد فى زمن الملك العادل السلطان ابن السلطان ركن الدنيا و االدين ابو المخاهد باربكشاه السلطان ابن محمود شاه السلطان - البانى خان المعظم الغ اقرار خان بواسطى (؟) خان معظم اشرفخان - خمس ستين و ثمانماية"

নেই। পিলিতে উল্লিখিত মসজিদের কোনো হদিস অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। মাহীসন্তোষে ঢিবি আকারে অসংখ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। উল্লিখিত মসজিদটি এর কোনো একটি হয়ে থাকবে।[৫৪]

দ্বিতীয় শিলালিপিটিও মাজারের ভেতরের দেয়ালে প্রথম শিলালিপিটির পাশে ছিল। এর আংশিক পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সুলতান রুকন উদ্দিন বরবক শাহের শাসনামলে খান-উল-আজম ওয়াল মুয়াজ্জম উলুগ [খান].... বিখ্যাত বরবকাবাদ শহরের উজির ৮৭৬ হিজরি সনে (১৪৭১-৭২) এ মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫৫] এই লিপিতে দ্বিতীয় যে মসজিদটির কথা বলা হয়েছে তারও কোনো সন্ধান মেলেনি।

প্রথমোক্ত লিপির উল্লিখিত খান-ই-মুয়াজ্জম আশরাফ খান সম্ভবত মাহীসন্তোষ শহরের প্রশাসক ছিলেন। তাঁর পদবি সম্পর্কে লিপিতে কোনো উল্লেখ নেই। তবে, তিনি খুব সম্ভব খান-ই-মুয়াজ্জম উলুগ ইকরার খানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। অপর একটি লিপিতে 'জুর' ও 'বারুর'-এর শিকদার খাকান-ই-মুয়াজ্জম উলুগ নুসরত খান ইকরার খানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন বলে উল্লিখিত আছে।[৫৬] শিকদার হলো একটি প্রশাসনিক পদের নাম যা আধুনিক যুগের মহকুমা (বর্তমান সময়ের জেলা) প্রশাসকের সঙ্গে তুলনীয়।[৫৭] ধারণা করা যেতে পারে যে, খান-ই-মুয়াজ্জম আশরাফ খান নুসরত খানের মতো শিকদার বা এর সমপর্যায়ের কোনো প্রশাসক ছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে বরবকাবাদকে একটি বিখ্যাত শহর এবং প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে খান-ই-মুয়াজ্জম উলুগ (সম্ভবত ইকরার খান) কে শহরটির উজির বলা হয়েছে।[৫৮] উজির অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের রাজকর্মচারী। এমন একজন কর্মকর্তার অস্তিত্ব থেকে শহর হিসেবে বরবকাবাদের অবস্থান এবং গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

মাহীসন্তোষে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উৎখনন কালে বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎ কুমার রায় তৃতীয় শিলালিপিটি উদ্ধার করেন।[৫৯] এসময়ে বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি সহযোগে নির্মিত একটি মিহরাবও আবিষ্কৃত হয়। লিপিটির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, সুলতান হুসেন শাহের আমলে

Translation: "The prophet, upon whom be blessings, has said, 'He who builds a mosque in the world, will have seventy castles built by Allah in paradise'. This mosque was built at the time of the just prince, the Sultan son of sultan, Ruknud-Dunya wad-Din, Abul Mujahid Barbak Shah, the Sultan son of Mahmud Shah, the Sultan. The builder is the great Khan Ulugh Iqrar Khan, through (the agency of) the great Khan Ashraf Khan; (in the year) eight hundred and sixty five; 865 A.H. (1460-61 A.C.)." Shamsud-din Ahmed, op.cit, p. 74.

[৫৪] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।

[৫৫] আয়তনে ছোট এই লিপিটিতে বলা হয়েছে, "This mosque was built by the great and ... Khan Ulugh ... vizir of the town known as Barbakabad Makan, 876 (1471-72 A.C.)". Shamsud-din Ahmed, op.cit, p. 90; এ কে এম যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রত্নকীর্তি," মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, ১৯৯৮), পৃ. ২৯৮।

[৫৬] দিনাজপুর লিপিতে এ তথ্য সন্নিবেশিত আছে। চেহেল গাজির মাজারের সন্নিকটবর্তী ইট দিয়ে নির্মিত একটি ক্ষুদ্রায়তনের প্রাচীন মসজিদের পূর্ব দেয়ালে লিপিটি ছিল। দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভি. ওয়েস্টম্যাকট লিপিটি উদ্ধার করেন। Shamsud-din Ahmed, op.cit, pp. 71, 73.

[৫৭] Ibid, p. 73.

[৫৮] Ibid, p. 90.

[৫৯] বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে পরিচালনায় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এই উৎখনন করা হয়।

৯১২ হিজরি সনে (১৫০৭) ... বিন সুহাঈল কর্তৃক রমজান মাসে মসজিদটি নির্মিত হয়।[৬০] ত্রুটিপূর্ণ লেখনী ও শব্দবিন্যাসের কারণে এবং শিলাটির একাংশ ভেঙে যাওয়ায় বিন সুহাঈলের পূর্ণ নাম এবং পদবি জানা সম্ভব হয়নি।[৬১] মনে করা যেতে পারে যে, তিনি মাহীসন্তোষে নিয়োজিত আলাউদ্দিন হুসেন শাহের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

উৎখননে একটি বড় ধরনের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন এ মসজিদটির পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চিম দেয়াল মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচু অস্তিত্ব নিয়ে অনেকাংশে টিকে আছে।[৬২] প্রাথমিক পর্যায়ে বহু দরজা বিশিষ্ট মসজিদটির প্রকৃত আয়তন ও আকৃতি জানা না থাকায় একে বারদুয়ারি মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। সম্প্রতি এর আকার, আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ৬৬′ ফুট এবং ৩৯′ ফুট। সাত ফুট প্রশস্ত দেয়ালকে এর সঙ্গে যুক্ত করলে মসজিদটির বহিস্থ মাপ দাঁড়ায় ৮০′x ৫৪′ ফুট। এর পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে দরজা ছিল। মসজিদটির পশ্চিম দেয়ালে সমান দূরত্বে পাথর দিয়ে নির্মিত পাঁচটি মিহরাব ছিল। চারটি মিহরাব সমান হলেও মাঝেরটি আকারে বড়।[৬৩] একটি মিহরাব বরেন্দ্র জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপূর্ব শিল্প শৈলীর নিদর্শন এই মিহরাবটি নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন পাথরের মূর্তির (সূর্য ও বিষ্ণু মূর্তি)পেছনের দিক ব্যবহার করে। মূর্তিগুলোর সন্মুখভাগ প্রশস্ত দেয়ালের ভেতরের দিকে থাকায় মসজিদের ভেতর বা বাইরে থেকে এদের দেখা যেত না। মসজিদের মিহরাবে মূর্তিযুক্ত পাথর ব্যবহারের কারণ সহজবোধ্য। এ অঞ্চলে পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় সম্ভবত কোনো প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে এটি নির্মাণ করা হয়। এছাড়া মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিটিও বিষ্ণু মূর্তির পেছনের দিকে উৎকীর্ণ। এ কারণে মনে করা হয় যে, প্রাক্-মুসলিম যুগে

---

[৬০] কালো পাথরে উৎকীর্ণ দুই লাইনের শিলালিপিটিতে লিখিত আছে,

"قال النبى طلى الله عليه و سلم من بنى المسجد بنى الله تعالىا له سبعين قصراً فى لجنة..... السلطان السلطين علاؤ الدنيا و الدين ابى المظفرحسين شاه سلطان خلد الله ملكه وسلطانه بنى هذا المسجد.....بن سهيل - مورخاً فى التاسع من شهر مبارك رمظن سنة اثنى عشر و تسعماية النبى...."

Translation: "The Prophet, may the blessing and peace of Allah be upon him, has said, 'Whoever builds a mosque, Allah the most High buids seventy castles for him in Paradise.' (Built) in the reign of the sultan of sultans, 'Alaud-Dunya wad-Din Abul Muzaffar Husain Shah, sultan, may Allah perpetuate his kingdom and authority. This mosque was built by ... son of Suhail, dated in the 9th day of the blessed month of Ramadan, in the year nine hundred and twelve, 912 A.H. (corresponding to 26th February, 1507 A.C.)"; Shamsud-din Ahmed, op.cit, p. 179.

[৬১] A.K.M Yaqub Ali, Mahisantosh, op.cit, p. 70.

[৬২] উৎখনন কালে অনেক ইট ও পাথর পাওয়া গেছে। পরবর্তী কালে স্থানীয় জনগণ ইটগুলো নিয়ে গেছে। তবে এখনো (আগস্ট, ২০১৪) কালো পাথরগুলো যত্রতত্র পড়ে আছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি টিনসেড-চৌ-চালা ঘর তৈরি করে নামাজ পড়া হচ্ছে।

[৬৩] এবিএম হোসেনও মসজিদটির আয়তন (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ) বিষয়ে ইয়াকুব আলীর সঙ্গে একমত। অবশ্য তিনি মসজিদটির দরজা ও মিহরাবের সংখ্যা, দেয়ালের পুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। দ্রষ্টব্য, A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of society,* op. cit, appendix C, p. 388; এবিএম হোসেন, "বরেন্দ্র অঞ্চলের মসজিদ স্থাপত্য," মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০।

মাহীসন্তোষে বা এর আশেপাশে কোথাও মন্দির ছিল।

সম্প্রতি বরবক শাহের আমলে মসজিদ নির্মাণের তথ্য সংবলিত আরো একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। মসজিদের প্রত্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া এই লিপিতে জনৈক উলুগ হাবাস খান কর্তৃক ৮৬৭ হিজরি সনে (১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে) একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে।[৬৪]

মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত লিপি প্রমাণে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলমান শাসকগণ এখানে একাধিক মসজিদ নির্মাণ করেন। বিশিষ্ট প্রত্নগবেষক এ কে এম যাকারিয়ার মতে, "... কমপক্ষে তিনটি মসজিদ যে এখানে (মাহীসন্তোষে) ছিল তার লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। লিপি প্রমাণে দেখা যায় যে, দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সুলতান বরবক শাহর (১৪৫৭-৭৬ খ্রীঃ) আমলে। ... তৃতীয় মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল সুলতান হুসেন শাহর আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)।"[৬৫] পাহাড়পুর জাদুঘরে রক্ষিত শিলালিপিটিকে আমলে নিয়ে বলা যায় যে, মাহীসন্তোষে অন্তত চারটি মসজিদ থাকার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ থেকে বরবকাবাদ শহরের আয়তন এবং এর জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একথা বলবার অবকাশ রাখে না যে, মুসলিম যুগের শুরুতেই মাহীসন্তোষ একটি বৃহদাকার ও জনবহুল শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত সে কারণেই এখানে এতগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে।

মুসলিম যুগে মসজিদ ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মসজিদে মক্তব স্থাপন করে মুসলমান শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৬] কোরআন ও হাদিসের প্রাথমিক পাঠ এবং আরবি ও ফারসি ভাষার হাতে খড়ি হতো মক্তবেই।[৬৭] বলা বাহুল্য, মাহীসন্তোষের মসজিদগুলোও শিক্ষা বিস্তারে একই ধরনের ভূমিকা রাখে।

অবশ্য এ যুগে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র ছিল মাদ্রাসা। বাংলায় ক্ষমতা বিস্তারের অব্যবহিত পরেই মুসলমানরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করে। বখতিয়ার খলজি এবং অন্যান্য খলজি মালিকরা লখনৌতি রাজ্যের তিনটি প্রসিদ্ধ স্থান দেওকোট, নারকৌটি এবং মেসিদা-সন্তোষে (মাহীসন্তোষ) মাদ্রাসা স্থাপন করেছিল।[৬৮] কিন্তু তাদের মাদ্রাসা নির্মাণের কোনো লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। মাদ্রাসা নির্মাণের সবচেয়ে পুরাতন লিপিটি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলের, ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের।[৬৯] তবে, ৮৫৮ হিজরি সনে (১৪৫৪) উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের নবগ্রাম লিপি খিত্তা

---

[৬৪] দুই সারি লেখনী বিশিষ্ট শিলালিপিটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এতে বলা হয়েছে, "There is no divinity, but Allah, Muhammad (pbuh) is the apostle of Allah. The prophet said, he who builds mosque in this world Allah builds seventy castles in the paradise. Built the mosque the just monarch Sultan son of sultan Rukn al-Dunya wa al-Dunya Abul Muzaffar Barbak Shah, the sultan son of Mahmud Shah, the sultan. The builder Khan al-Azam, Khaqan al-Muazzam Ulugh Habas Khan (completed it) in the year 867 A.H/1462 A.D."

[৬৫] মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবাকাত-ই-নাসিরী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮, পাদটীকা।

[৬৬] সাত বছর বয়স থেকে একজন মুসলমান শিশুর উপরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, বিশেষ করে নামাজ পড়া এবং রোজা রাখা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তাদেরকে এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হতো এ বয়সের আগেই। এদিক থেকে বিবেচনা করে পাঁচ বছর বয়সেই তাদের মক্তবে প্রেরণ করা হতো বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

[৬৭] A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society, op. cit*, pp. 242-243.

[৬৮] Ibid, p. 238.

[৬৯] লিপিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার জন্য দ্রষ্টব্য, Shamsuddin Ahmed, op.cit, pp. 158-159.

শিমলাবাদ[৭০]-এ একটি শিক্ষা একাডেমির অস্তিত্ব নির্দেশ করে।[৭১] এই প্রতিষ্ঠানটির কোনো অস্তিত্ব অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে হুসেন শাহের লিপির মাদ্রাসাটি গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[৭২]

হুসেন শাহের আগে বাংলায় মাদ্রাসা ছিল না, এমন নয়। এর অনেক আগেই প্রখ্যাত আলেম ত্বাকি উদ্দিন আরাবি মাহিসুনে (মাহীসন্তোষে) একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৭৩] প্রসিদ্ধ সুফি ও প্রখ্যাত আলেম মখ্দুম শেখ শরফ আল দিন এহিয়া মনেরির পিতা এহিয়া মনেরি মাহিসুনে মাওলানা ত্বাকি উদ্দিন আরাবির নিকট শিক্ষা লাভ করেন।[৭৪] এহিয়া মনেরি ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সম্ভবত তেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মনেরি ত্বাকি উদ্দিন আরাবির মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিলেন। অতএব তেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বা তারও কিছু আগে মাহিসুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দেশ-বিদেশে পরিচিতি পায়। বিহারের মনেরের অধিবাসী এহিয়া এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছিলেন। মুসলিম যুগে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন মাদ্রাসাগুলো হলো মাহিসুন, দরাসবাড়ি ও বাঘা। এদের মধ্যে মাহিসুন মাদ্রাসা সর্বপ্রাচীন।[৭৫]

মাহিসুন মাদ্রাসায় কত ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল? এদের কতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে পাঠদান করা হতো, কিংবা কি কি বিষয় এর পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল – সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোনো উৎস নেই। মাহীসন্তোষে বিস্তীর্ণ এলাকায় থাকা ঢিবিসমূহের কোনো একটি হয়তো এই মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ হয়ে থাকবে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হবার পূর্বে মাদ্রাসাটির আয়তন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা কঠিন। কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রগত জ্ঞান;[৭৬] আরবি, ফারসি, বাংলা প্রভৃতি ভাষা;[৭৭]

---

[৭০] বর্তমান পাবনা জেলার উত্তরাংশ, বগুড়ার দক্ষিণাংশ এবং রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এর অন্তর্গত ছিল।

[৭১] সিরাজগঞ্জ জেলাধীন তারাশ উপজেলার নবগ্রামে প্রাপ্ত এই লিপিটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। জাদুঘরে এর সংযোজন নং ৩১৭১। এটি এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন লিপি যাতে ছাত্র-শিক্ষকের উল্লেখ আছে। তাই এই লিপিটি একটি শিক্ষা একাডেমির অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society, opcit*, p. 238.

[৭২] Ibid, p. 239.

[৭৩] Ibid, p. 241.

[৭৪] শেখ শরফ আল দিন এহিয়া মনেরির জ্ঞাতি ভাই (cousin) শাহ শোয়াইব এই তথ্য প্রদান করেন। দ্রষ্টব্য, "Manaqib-ul-Asfiya of Shah Shuaib", *Maktubat-i-Sadi*-এর শেষে উদ্ধৃতাংশ (extract) হিসেবে মুদ্রিত; *Maktubat-i-Sadi of Shaikh Sharf-ud-din Yahya Maneri*, (বিহার শরিফ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উর্দু অনুবাদ), p. 339; Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal, Vol. I (1201-1576 A.D)*, (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), pp. 180-181; Abdul Karim, *op.cit.*, p. 96; A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society, opcit*, p. 241.

[৭৫] দরাসবাড়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে। বাঘা মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতান নসরৎ শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩১)। পক্ষান্তরে মাহিসুনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এর অনেক আগেই। অন্তত পক্ষে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

[৭৬] *নাম-ই-হক* নামক ফারসি ভাষায় রচিত একটি ফিকাহ্ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে করা হয় যে, মাদ্রাসায় ছাত্রদের এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হতো।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যসূচিতে কোরআন এবং হাদিস রাখা বাঞ্ছনীয় ছিল। এছাড়া সৈয়দ, কাজি এবং মুসলমান সমাজের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন ধরনের মামলার নিষ্পত্তি করতে হতো কোরআন এবং হাদিসের আলোকে। তাই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে বিষয় দু'টি

ধনুর্বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান;[৭৮] এবং হস্তলিখন শিল্পের মতো চারুকলার বিষয় মুসলিম আমলের মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[৭৯] অবশ্য মাদ্রাসায় এর বাইরেও অনেক বিষয় পড়ানো হতো। মোগল ঐতিহাসকি আবুল ফজল লিখেছেন, "Every boy ought to read books on morals, arithmatic, agriculture, mensuration, geometry, astronomy, physionomy, household matters, rules of government, medicine, logic, higher mathematics, science and history, all of which may be gradually acquired."[৮০] বলা বাহুল্য, মুসলিম যুগে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে, শিক্ষার্থীদের জন্য এতোগুলো বিষয় আবশ্যিক ছিল না। আধুনিক যুগের মতো শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে পাঠদানের ব্যবস্থা এ সময়ে ছিল। আবার মাদ্রাসাগুলোতে সকল বিষয় এক সঙ্গে চালুও হয়নি। অগ্রগতির ধারায় ক্রমান্বয়ে একের পর এক বিষয় চালু হয়। মনে রাখা দরকার, সব বিষয় পড়বার সুযোগ কেবল মাত্র গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসাগুলোতে ছিল। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসায় এ সুযোগ ছিল না। মাহিসুনের মতো প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় সবগুলো বিষয় পড়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যায়, মাহিসুন মাদ্রাসা ছিল একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মাহিসুনের মতো একটি বড় মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হতো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এমন প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে,

---

অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া মুহাম্মদ বিন ইয়াজদান বক্শ নামক একডালার জনৈক মুহাদ্দিস বুখারি শরিফের তিনটি খণ্ড অনুবাদ করেন। মাদ্রাসাসমূহে হাদিস গ্রন্থের চাহিদা না থাকলে তিনি একাজে নিয়োজিত হবেন কেন? Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal, 1201-1576,* Vol. I (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), p. 169.

[৭৭] কোরআন শিক্ষার অবলম্বন হবার কারণে আরবি ভাষা শেখা ছিল অপরিহার্য। সরকারি ভাষা হওয়ায় চাকরি পেতে ফারসি জানতে হতো। সম্ভবত, শিক্ষার মাধ্যমও ছিল ফারসি। প্রাপ্ত মুসলিম আমলের সরকারি পত্রালাপ ও শিলালিপি সমূহের প্রায় সবগুলোই ফারসি এবং আরবি ভাষায় রচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চর্চা না হলে সরকারি দলিলে ভাষা দু'টি এভাবে ব্যবহৃত হবার কথা নয়।

পনেরো ও ষোলো শতকে ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে এদেশের অভিজাত এবং সভাসদগণের ফারসি এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই ভাষা দুটি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়।

[৭৮] গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্ একজন ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় ধনুর্বিদ্যাকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে সৈয়দ মির আলাভি (মুহাম্মদ বুদাই) *হিদাইয়াত-ই-রামি* শীর্ষক একটি ধনুর্বিদ্যার গ্রন্থ সংকলন করেন। সামরিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ধনুর্বিদ্যাও সম্ভবত মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল।

গৌড়ের গুণমন্ত মসজিদের লিপিতে জালাল উদ্দিন ফতে শাহ্কে কোরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়াদির ব্যাখ্যাকারী এবং ধর্মীয় ও শারীর বৃত্তীয় সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বিষয় দু'টি মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি ভুক্ত করেন বলে মনে করা হয়। দ্রষ্টব্য, Diya al-Din Barani, *Tarikh –i-Firuz Shahi* (tr. Syyid Ahmad Khan) (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1892), p. 110; A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society,* op.cit, p. 246; Shamsud-din Ahmed, op.cit, pp. 123-124.

[৭৯] মুসলমান আমলের লিপিসমূহের অনন্য সুন্দর রচনা শৈলী অবলোকন করে অনেক পণ্ডিত এযুগে মাদ্রাসা সমূহে ক্যালিওগ্রাফি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল বলে মনে করেন।

[৮০] Abū'l-Fazl Allāmī, op.cit, vol. I, p. 279.

বাংলার সুলতানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতেন।[৮১] এছাড়া তাঁরা মাদ্রাসাকে লাখেরাজ ভূমি দিতেন। মাহিসুন মাদ্রাসা সম্ভবত এমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। স্থানীয় জনশ্রুতি মোতাবেক উনিশ শতকেও মাহীসন্তোষের মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ২,৭৫০ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল।[৮২] বলা বাহুল্য, মুসলিম যুগে এমন অনুদানের পরিমাণ ছিল আরো বেশি।

৫. মাহীসন্তোষের মুসলমান জনগোষ্ঠী

কোন কোন জাতি সমন্বয়ে মাহিসুনে (মাহীসন্তোষে) মুসলমান জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমরা দেখেছি, বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মাহীসন্তোষ একটি বিকশিত শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে দুর্গ নির্মাণ (অন্তত পক্ষে সংস্কার), প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন এবং টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রাথমিক পর্যায়েই এই শহরে শাসক তুর্কি-আফগান মুসলমানদের আগমন ঘটে। এরা এখানে মুসলিম বসতি গড়ে তোলে। এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে পারসিক ও আরব শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রচারকরা। এ প্রসঙ্গে জালাল উদ্দিন তাব্রিজির অনুসারী সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সুফিদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা ছিলেন পারস্যের মানুষ।[৮৩] এছাড়া এখানে আগমন ঘটে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের। ত্বাকি উদ্দিন আরাবি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নামের পেছনে 'আরাবি' থাকবার কারণে একে আরব অঞ্চলের মানুষ মনে করা হয়। মাহীসন্তোষ দুর্গে মুসলমান সৈন্যরা অবস্থান করতো। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন জাতির মানুষ এতে ছিল। পারসিক ও আরবীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়ে এরা মাহিসুনের বিদেশী মুসমান জনগোষ্ঠীর পত্তন ঘটায়। সেই সঙ্গে এদের সাথে যুক্ত হয় স্থানীয় ধর্মান্তরিতরা (নও মুসলিমরা)। মাহিসুনের মুসলমান জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে মূলত এতদসকল শ্রেণির মানুষের সমন্বয়ে।

৬. অবনতি ও ধ্বংস

শহর হিসেবে মাহীসন্তোষের অবনমন কখন এবং কিভাবে শুরু হয়, তা বলা মুশকিল। বাংলায় মুসলমান রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাহীসন্তোষ দুর্গের গুরুত্ব হ্রাস পায়। নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের পরে আর কোনো সুলতান বরবকাবাদ (মাহীসন্তোষ) টাঁকশাল থেকে মুদ্রা জারি করেননি। এ থেকে শহরটির গুরুত্ব কমে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ষোলো শতকের শেষের দিকে শহরটি অনেকাংশে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।[৮৪] বাংলার রাজধানী স্থানান্তর সম্ভবত এর জন্য দায়ী। আমরা জানি ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ফলে সুবাদার মুনীম খান গৌড় থেকে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।[৮৫] পরবর্তী সময়ে এখান থেকে রাজমহলে এবং আরো পরে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।[৮৬] রাজধানীর সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে

---

[৮১] A.K.M. Yaqub Ali, *Aspects of Society, opcit*, p. 247.

[৮২] Ibid, p. 247.

[৮৩] জালাল উদ্দিন তাব্রিজি পারস্যের তাব্রিজ প্রদেশের মানুষ। সম্ভবত, তাঁর সঙ্গে আগত সুফিরাও ছিলেন পারস্যের।

[৮৪] *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৬৩।

[৮৫] *আকবরনামা*, ৩য় খণ্ড, (ইং অনু.) পৃ. ২৯৩; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

[৮৬] আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

সঙ্গে বরবকাবাদ (মাহীসন্তোষ) শহরের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। অবশ্য এ সময়ে শহরটি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এটি মোটামুটিভাবে মোগল যুগ পর্যন্ত টিকে ছিল। মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বর্ণনায় বরবকাবাদ শহরের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী কালে মহামারি বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শহরটি পরিত্যক্ত হয়। সম্ভবত, ইংরেজ শাসনারম্ভের খানিকটা পূর্বে, মোগল যুগের শেষের দিকে এমনটি ঘটে থাকবে। নবাব মুর্শিদ কুলি খান রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনয়নের জন্য ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সুবাকে ১৩টি চাকলায় এবং ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করেন। মুর্শিদ কুলি খান বরবকাবাদের নামে কোনো চাকলার নামকরণ করেননি।[৮৭] তখনো গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে টিকে থাকলে ঘোড়াঘাট বা রাজমহলের মতো বরবকাবাদও চাকলার প্রশাসনিক দপ্তরের মর্যাদা পেতো। এছাড়া পরবর্তী কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণেও বরবকাবাদ শহরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৭. উপসংহার

হিন্দুবৌদ্ধ যুগে প্রতিষ্ঠিত দুর্গ নগরী মাহীসন্তোষ মুসলমান শাসনের সূচনালগ্ন থেকে বিকশিত হতে থাকে। সুলতানি যুগের মধ্যেই এটি একটি সমৃদ্ধ শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানদের হাতে এর বিকাশ ছিল বহুমাত্রিক। একদিকে, শহরটিতে প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপিত হয় এবং মুদ্রা তৈরির টাঁকশাল বসে। অন্যদিকে, এখানে মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপিত হয়। ফলে এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি শহরটি একটি ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান শহরটির এমনতর বিকাশের পেছনে অনেকাংশে দায়ী ছিল। রাজধানী লখনৌতি ও ঘোড়াঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় শহরটিকে অবজ্ঞা করা সুলতানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার এর অবনমনও শুরু হয় একই কারণে। এ অঞ্চল থেকে রাজধানী স্থানান্তর করা হলে শহরটি পূর্বেকার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হারিয়ে ফেলে এবং সম্ভবত প্রকৃতিক দুর্যোগে নিপতিত হয়ে এটি পরিত্যক্ত হয়।

---

[৮৭] তেরটি চাকলা হলো – (১) বন্দর বালেশ্বর, (২) হিজলী, (৩) মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী বা সাতগাঁও, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল), (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) কুরিবারি, (১১) জাহাঙ্গীরনগর, (১২) সিলেট এবং (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। আব্দুল করিম, "মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৪।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব

সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী*

Abstract: The West-Pakistani military rulers decided to wipe the Bengalis out from the soil of Bangladesh. Hence, they imposed genocide over the Bengalis. The Bengali leaders declared independence, formed exile government and urged the world for recognition and assistance. But due to the cold war politics, the US and her allies failed to stop the brutality of the Pakistani oppressors. Rather, they called the event as internal affairs of Pakistan. On the other hand, USSR and India took steps for the assistance of 'Bangladesh Revolution'. After nine-month war, standing before a defeat, on 3rd December 1971 Pakistan attacked India to turn Bangladesh-Pakistan war into India-Pakistan war so that they might find an escape route of defeat through the UNO initiatives. But all the US-China initiatives remained in vain due to Soviet 'Veto.' Bangladesh emerged as a sovereign independent country on 16 December 1971. After that, the both super powers again gave less attention to the South Asian affairs for some time.

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্বঘটনাসমূহের মধ্যে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা,[১] যা মানবজাতিকে একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলো স্পষ্টত দুটো পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে,[২] এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে উত্থিত পরাশক্তিদ্বয় স্নায়ুযুদ্ধের খোলস ছেড়ে সত্যিকার যুদ্ধের দোড়গোড়ায় পৌঁছে যায়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে 'স্নায়ুযুদ্ধ' ছিল (cold war) একটি বহুল উচ্চারিত ও আলোচিত বিষয়। এ যুদ্ধে একপক্ষে ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরপক্ষে ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বে থাকা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন – কোন পরাশক্তিরই সরাসরি কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না, কেননা এসময়ে ভূ-রাজনীতির মূল কেন্দ্র (heartland) ছিল পূর্ব-ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এমন এক ধরনের বিপ্লব যা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে 'জাতিগত বিদ্বেষ ও নিরন্তর শোষণের বিরুদ্ধে অব্যাহত

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] স্নায়ুযুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল ধরা হয় ১৯৪৬-১৯৯০ সময়কালকে। এ সময়কালে বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বার্লিন সঙ্কট (১৯৪৮), চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯৪৯), কোরিয়ান যুদ্ধ (১৯৫০), সুয়েজ খাল সঙ্কট (১৯৫৬), কিউবার মিসাইল সঙ্কট (১৯৬২), চীন-ভারত যুদ্ধ (১৯৬২), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) প্রভৃতি।

[২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যেসব দেশের সরকার পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল সেসব দেশের, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমত কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতার পক্ষে ছিল। এর প্রমাণ, সেসব দেশের জনগণ বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে কিংবা জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলিতে প্রেরণ করেছিল।

প্রতিবাদের' মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ বিপ্লবের ঢেউ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর পেরিয়ে সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরে আছড়ে পড়ার কথা নয়। কিন্তু পড়েছে। এর কারণ জন্মের অব্যবহিত পড়েই পাকিস্তান মার্কিন সামরিক বলয়ে যোগ দেয় (১৯৫৪) এবং প্রতিবেশী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণের অস্তিত্বের সংগ্রামে সহানুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়। ভারতীয় দৌত্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিলে মার্কিন সরকার নির্দ্বিধায় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। স্নায়ুযুদ্ধজনিত বিশ্বরাজনীতিই পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর গণহত্যা পরিচালনার সাহস জুগিয়েছিল এবং এটি ছিল হিটলারের পর পৃথিবীতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় গণহত্যা। আবার এ স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে যুদ্ধরত বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী পাকি-মার্কিন প্রস্তাব তিন তিনবার 'ভেটো' প্রদানের মাধ্যমে অকার্যকর করে দেয়; মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে প্রতিরোধের জন্য বঙ্গোপসাগরে সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বরাজনীতির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়; স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে।

ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে এর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে, তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন জোটের বিরোধিতার কারণ হলো প্রথমত, ভারতকে আরেকটি সমাজতান্ত্রিক চীনে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য পাকিস্তান-ভারত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানকে চীনের বলয় থেকে বের করে মার্কিন বলয়ে ধরে রাখা, যেন দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণ রোধ করা যায়।

স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা ও উৎপত্তির প্রেক্ষাপট

ইংরেজি cold war-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ঠাণ্ডা লড়াই'। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ cold War-এর প্রকৃত অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না। এজন্য এর অনুবাদ 'স্নায়ুযুদ্ধ' যুক্তিযুক্ত। স্নায়ুযুদ্ধ বললে বোঝায় বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে; টানটান স্নায়ুবিক উত্তেজনা বিরাজ করছে; কোনো পক্ষই যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করছে না কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে – এরূপ আশঙ্কা থেকে উভয় পক্ষই সমর-প্রস্তুতি বৃদ্ধি করে চলেছে। স্নায়ুযুদ্ধ এমন এক প্রকার যুদ্ধাবস্থাকে নির্দেশ করে যা যুদ্ধও নয় আবার যুদ্ধের অনুপস্থিতি বা শান্তিও নয়। স্নায়ুযুদ্ধকে কেউ কেউ অস্বস্তিকর শান্তি (uneasy Peace) বলে অভিহিত করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়কে সশস্ত্র শান্তির যুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দুইটি পরাশক্তির উত্থান ঘটে। পূর্বেকার পরাশক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাদের বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে বিশ্বকে পূর্বের মতো নেতৃত্ব দেয়ার অবস্থায় ছিল না। যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে তার ক্ষমতা খর্ব করে ফেলা হয়। জাপান, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনের উত্থান ঘটে,[৩] তবে তখন পর্যন্ত চীন পরাশক্তি হয়ে ওঠার মতো অর্থনৈতিক

---

[৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চিয়াং কাই শেক সরকার ও মাও সে তুং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি পরস্পর গৃহযুদ্ধেও লিপ্ত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সময়ে পূর্ব ইউরোপ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় চীনের দিকে নজর দিতে পারেনি। ফলে ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে চিয়াং কাই শেক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে এবং ঘোষণা করেন যে তিনি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকেই সমর্থন করবেন।

ও সামরিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ফলে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় কিন্তু আদর্শগতভাবে এ দুটি রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করার মতো শক্তি অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রাষ্ট্র দুটি মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করলেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এ দুটি দেশের আদর্শিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও বিভক্ত হয়ে দুই শিবিরে যোগ দেয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে এ দুই পরাশক্তি বিরোধিতা অব্যাহত রাখলে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়ায়। কিন্তু উভয় দেশই সযত্নে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এরূপ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাকেই স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ভবানী সেনগুপ্ত এবং অমিত গুপ্তের মতে, 'The emergence of US and the Soviet Union as super powers, after the second world war, and their quest to check each other's expansion of power and influence led to the birth of cold war.'[৪]

স্নায়ুযুদ্ধ কথাটির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে।[৫] এ বছরের একেবারে শুরুর দিকে জনৈক মার্কিন সাংবাদিক রুশ মার্কিন সম্পর্কের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন,'We are in the midst of a cold war.' এর অল্পকাল পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিসৌরির ফুলটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'বাল্টিকের স্টেটিন থেকে আড্রিয়াটিকের ট্রিয়াস্ট পর্যন্ত এই মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি লৌহ যবনিকা নেমে এসেছে।'[৬] তিনি ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত প্রয়াসে এর মোকাবিলার আহ্বান জানান।

তাঁর এ বক্তব্যের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী বার্নাড বারুচ, যিনি পরবর্তীতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, মন্তব্য করেন 'Let us not be deceived, today we are in the midst of the cold war.' চার্চিল যে স্নায়ুযুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বারুচ সে যুদ্ধকে সরাসরি কোল্ড ওয়ার বলে উত্থাপন করেন। এরপর ওয়াল্টার লিপম্যান রুশ-মার্কিন সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোল্ড ওয়ার কথাটি ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরপর বহু সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, তাদের লেখনীকে বক্তৃতায় শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করেন।

আসলে ইয়াল্টা সম্মেলনের (১৯৪৫) পর থেকেই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত তৎপরতাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের তিক্ততা তীব্র আকার ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল এসব দেশে অধিক গণতান্ত্রিক ও মুক্ত পরিবেশ যাতে করে সে তার উদ্বৃত্ত পণ্য এসব অঞ্চলে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ১৯৪৬ সালে স্ট্যালিন বলেছিলেন,"বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিকাশের অধীনে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।"[৭] ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট হওয়ার

---

[৪] Bhabani Sen Gupta & Amit Sen Gupta, "Changing Patterns of Regional Conflicts in South Asia," *Regional Cooperation and Development in South Asia,* Vol. 1, (ed) (New Delhi : South Asian Publishers,1986), p. 253.

[৫] *মার্কিন ইতিহাসের রূপরেখা* (আর্ন্তজাতিক তথ্য কর্মসূচি ব্যুরো, মার্কিন বিদেশ দপ্তরঃ ২০০৫), পৃ. ২৬০।

[৬] তদেব।

[৭] তদেব।

দু'সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি. মলোটভ তার সাথে দেখা করতে যান। এ সময় ট্রুম্যান পোল্যান্ডে ইয়াল্টা চুক্তি মোতাবেক নির্বাচন না হওয়ায় কড়া ভাষায় তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিষয়টিকে মলোটভ উল্লেখ করেছিলেন এভাবে, 'ট্রুম্যান মিজুরি প্রদেশের খচ্চরতাড়কদের ভাষায় আমার সাথে কথা বলেন।' যাহোক, মলোটভ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,'জীবনে আমার সাথে কেউ এভাবে কথা বলেনি।' প্রত্যুত্তরে ট্রুম্যান বলেছিলেন, 'চুক্তি মেনে নিন, তাহলেই আর এ ধরনের কথা কেউ বলবে না।'[৮] ট্রুম্যানের এরূপ অশিষ্টাচার ব্যবহারের পর থেকে রুশ মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে উভয় পক্ষের শক্তির ভারসাম্য আসে এবং বিশ্ব রাজনীতি দ্বি-মেরুতে বিভক্ত হয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে যায়।

পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও ১৫টি রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলো দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইয়াল্টা সম্মেলনে (১৯৪৫) সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্তব্য ২০ মিলিয়ন ডলার এর অর্ধেক দেওয়ার ব্যাপারে মিত্রপক্ষের সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল যদিও বিষয়টি ভবিষ্যতে মীমাংসার কথা ছিল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিন জোট তা নাকচ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, রুশ দাবি মোতাবেক পরাজিত জার্মানিতে সোভিয়েত ধাঁচের সরকার গঠনেও তারা রাজি হয়নি। তৃতীয়ত, জার্মান-পোল সীমান্ত রাশিয়ার দাবি মোতাবেক ওডার-নাইসি রেখায় মেনে নিতেও পশ্চিমা শক্তিগুলো রাজি হয়নি। চতুর্থত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়াল্টা চুক্তি মোতাবেক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে আমেরিকা আণবিক বোমা ফেলে জাপান দখল করলে রাশিয়া এতে প্রতিবাদ জানায়। এসব কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার চরম মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা মার্কিন শাসক মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। চার্চিল বলেছিলেন, 'একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পক্ষীর মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রাস করতে উদ্যত। গণতান্ত্রিক জগৎ বা Free world-কে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।'[৯] চার্চিলের বক্তৃতার পর মার্কিন শাসকশ্রেণির একটি বড় অংশ সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট NATO গঠন করে এবং অন্যান্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে নিজের দিকে টানে। এর জবাবে মস্কোও পাল্টা সামরিক জোট 'ওয়ারশ' গঠন করে পুঁজিবাদ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। উভয়পক্ষের সাজ সাজ রব বিশ্বকে প্রতিমুহূর্তেই আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কার মধ্যে ফেলে দেয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে দীর্ঘ এক ইতিহাস রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরাসরি অর্জন করতে পারতো তা প্রথমত ব্রিটিশের এবং পরবর্তীতে মার্কিন ষড়যন্ত্রের কারণে তাকে অগণিত মানুষের রক্তদান ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে ভারতীয় জনগণ ক্রমেই অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫) মাধ্যমে ভারতীয়গণ

---

[৮] তদেব।

[৯] প্রভাতাংশু মাইতি, *ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা ১৭৮৯-১৯৫০* (কলকাতা: শ্রীধর প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ২৯২।

ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে এ জাগরণ বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি ঐক্যবদ্ধ বাঙালির এ শক্তিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে একে বিভক্ত করে শাসন করার কূটকৌশল অবলম্বন করে। এজন্য তারা বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) ঘোষণা করে।[১০] প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই প্রথম 'বঙ্গভঙ্গবিরোধী' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবহমান বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে চিড় ধরে। ব্রিটিশের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে ঘটনা পরম্পরায় ভারতীয় মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে। প্রতিষ্ঠা হয় মুসলিম লীগ (১৯০৬)। অতঃপর প্রধানত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন এবং গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশের ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এ সময়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 'যুদ্ধ শেষে ভারতীয়দের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে' – এই শর্তে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।[১১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করলে ব্রিটেন ভারতীয়দের স্বাধীনতা দানে নীতিগতভাবে সম্মত হয়, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্য থেকে ৩ ধরনের প্রস্তাব উঠে আসে: ক) ঐক্যবদ্ধ ভারতকে একক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে হবে; খ) দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে ভারতকে বিভক্ত করে আলাদা দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে হবে; এবং গ) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ এবং বাংলাভাষাভাষি অঞ্চলসমূহ নিয়ে যথাক্রমে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলা নামে ৩টি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে হবে।[১২]

প্রথম দাবিটি ছিল সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। দ্বিতীয় দাবিটির অন্তর্ভুক্ত 'পাকিস্তান'[১৩] দাবিটি

---

[১০] বাংলা বিভাগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০৫ সালের ২১ জুলাই *The Statesman* যে অভিমত ব্যক্ত করেছিল তা ছিল এরূপ: "... First to destroy the collective power of Bengali people; secondly to overthrough the political ascendency of Calcutta and thirdly, to foster in East Bengal the growth of Mohammedan Power which it is hoped will have the rapidly growing strength of the educated Hindu community." দেখুন: মো. মোসলেম উদ্দীন সিকদার, "সাম্প্রদায়িক রাজনীতি: প্রেক্ষিত বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯৪৭)," *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০৮), পৃ. ৪৭।

[১১] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূ. (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ৪০।

[১২] ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে 'অখণ্ড বাংলার' বিষয়ে আলোচনা করেন। এ আলোচনার পরপরই তিনি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তার 'স্বাধীন বাংলার' পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। দেখুন: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২২-২৪।

[১৩] ১৯৩০ সালে যখন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতে হিন্দ-মুসলিম সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস

ছিল মুসলিম লীগের, মূলত: পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের। পরবর্তীতে পূর্ববাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ দাবির সাথে একাত্ম হয় এবং মূলত বাংলার মুসলমানদের তীব্র আন্দোলনের ফলেই এ দাবিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দাবিটি ছিল বাংলার মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মহাত্মা গান্ধীর অনীহার কারণে শেষ পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক নেতৃবৃন্দের রাজনীতির কাছে এবং বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের রাজনীতির কাছে মাথা নত করে।[১৪] এর ফলে বাংলাকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা – এ দু'ভাগে বিভক্ত করে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ ভারতে পূর্ববাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জমিদারদের দ্বারা নিদারুণভাবে যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছিল। বাংলার সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল যুগ যুগ ধরে। কিন্তু পূর্ববাংলার বেশিরভাগ জমিদারির মালিকানা হিন্দুদের হওয়ায় এবং এরা এদের নায়েব-গোমস্তাদের হাতে জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় বিলাসী জীবন-যাপন করার ফলে মুসলিম দরিদ্র রায়তগণ নায়েব-গোমস্তাদের দ্বারা চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের একথা বোঝাতে সক্ষম হন যে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা শোষণ-অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের 'পাকিস্তান' আন্দোলনে যোগ দেয়ার এটা ছিল মূল কারণ। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের সাথে একমাত্র ধর্ম ব্যতীত নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যিক-ভাষা প্রভৃতি কোনো দিক দিয়েই মিল ছিল না। উভয় অংশের মাঝে দূরত্বও ছিল প্রায় ১২০০ মাইল। এরূপ পরিস্থিতিতে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকবর্গের উচিত ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তা না করে শুরু থেকেই তারা পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। পাকিস্তানের রাজধানী, সচিবালয়, সামরিক বাহিনীসমূহের সদরদপ্তরসমূহ, সকল ব্যাংক-বীমা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।[১৫] শুধু তাই নয়, তারা পূর্ববাংলার জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার নীল-নকশার অংশ হিসেবে ভাষার উপর আঘাত হানে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে সদম্ভে ঘোষণা দেন, "Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan." জিন্নাহর এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালিদের দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি তার সত্যিকার আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। শোষণের মাত্রা যত বাড়তে থাকে বাঙালির প্রতিবাদী সত্তা তত বিকশিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,'ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চৌধুরী রহমত আলী উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাবের P, কাশ্মীরের K, সিন্ধুর S এবং বেলুচিস্তানের Tan নিয়ে Pakistan নামে এক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। লক্ষণীয়, 'পাকিস্তান' নামকরণের ক্ষেত্রেও 'পূর্ববাংলাকে' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

[১৪] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ১৫-১৬, ২০।

[১৫] Khalid Bin Syeed, *The Political System of Pakistan* (Dacca: Oxford University Press, 1967), p. 62.

ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে।'[১৬]

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচিত করলেও কৌশলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পরবর্তী ১০ বছর বাঙালিদের অধিকারশূন্য করে রাখে। চরম জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করেন। আইয়ুব খান অস্ত্রের মাধ্যমে এ আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে। শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। ততদিনে শেখ মুজিবের ৬-দফাকে বাঙালিরা তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুজিব হয়ে ওঠেন অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর মুক্তির দাবিতে ১৯৬৯ সালে ঘটে গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন ঘটে। পরবর্তী শাসক ইয়াহিয়া খান জনমতের চাপে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে শেখ মুজিব ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের ঘোষণা দেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকবর্গ বাঙালিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করলে শেখ মুজিব ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলে। কিন্তু ২৬ মার্চ মধ্যরাত্রে বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দিয়ে পাকিস্তানি সামরিকজান্তা নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর ঘৃণ্য গণহত্যা চাপিয়ে দেয়, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের অব্যবহিতপূর্বে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৭] শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একটি স্বাধীনতার লড়াই আসন্ন এবং এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এর পরদিন হতেই সারা দেশে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে বর্তমানে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৪টি পর্যায় অতিক্রম করে বিজয় অর্জন করে।[১৮]

প্রথম পর্যায় (২৬ মার্চ - ১৭ এপ্রিল)

এসময় দেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আক্রমণের কৌশল হিসেবে প্রথাগত ও গেরিলা যুদ্ধকে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানের পেশাদার সৈন্যের আধুনিক মারণাস্ত্রের সাঁড়াশি আক্রমণে প্রতিরোধকারীগণ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে গণ্য করে। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কড়া ভাষায় গণহত্যার নিন্দা জানায় এবং রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেয়। এ সময়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (১মে-জুন)

মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হলে কিছুটা পরিকল্পিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আন্তজার্তিক মিডিয়া বাংলাদেশে পাকিস্তানি

---

[১৬] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা: তত্ত্ব ও পদ্ধতি* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৪।

[১৭] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা: হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় (সম্পাদিত)* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১০), পৃ. ২৪৪।

[১৮] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা : তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, পৃ. ১২-১৩।

বাহিনীর নৃশংসতার খবর ফলাও করে প্রচার করে; বিশ্ববিবেক স্তম্ভিত হতে থাকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে এ বর্বরতা বন্ধ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করে।

তৃতীয় পর্যায় (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু করে। বিশ্বমিডিয়া পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হয়। মুজিবনগর সরকারের তৎপরতায় দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠনের জন্য কতিপয় দেশ সফর করেন। তার মস্কো সফরের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানে যা ঘটছে তা শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উপেক্ষা করা যায় না।

চতুর্থ পর্যায় (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে। কিন্ত আসন্ন বিজয়ের সম্ভাবনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকি-মার্কিন প্রস্তাবে 'ভেটো' প্রদান করে। পরাজয় এড়ানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে মার্কিন পরামর্শে পাকিস্তান ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে রূপান্তরের চেষ্টা করে। কিন্তু ভারত দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য এসে পৌঁছার পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল খুবই নেতিবাচক। স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবই এর একমাত্র কারণ। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য। এসময় দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আমেরিকার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ব্রিটিশ চিন্তার প্রতিফলন। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উপরই নির্ভর করতো।[১৯] ১৯৪৯ সালের পর দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়। এসময় তার উদ্বেগ ছিল ভারতকে নিয়ে। তার আশঙ্কা ছিল সোভিয়েত প্রভাবে ভারতে চীনের মত সমাজতন্ত্র সম্প্রসারিত হতে পারে। এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (১৯৪৫-৫৩) এবং আইজেনহাওয়ার (১৯৫৩-৬১) মার্শাল পরিকল্পনার আলোকে ভারতে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২টি C-130 হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট প্লেন ইন্ডিয়াকে ক্রুসহ প্রেরণ করে যাতে করে পার্বত্যাঞ্চলের জনগণকে ভারত সাহায্য করতে পারে। এতে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে তার নিরাপত্তার অন্বেষণে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খান চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। চীনের সাথে পাকিস্তানের

---

[১৯] Howard B. Schaffer, "US interests in South Asia," *Prospects for Peace in South Asia* edited by Rafiq Dossani & Henry S. Rowen (Delhi: Orient Longman India, 2006), p. 326.

সখ্যের কারণে শঙ্কিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এবং ভারত-পাকিস্তান উভয়ের কাছে Non-lethal weapon বিক্রয় করতে সম্মত হয়।

এদিকে চীন সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও সোভিয়েত কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আবার, চীন ও পাকিস্তান উভয়েই ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় আইয়ুব খানের প্রচেষ্টায় পাকি-মার্কিন-চীন সম্পর্ক দৃঢ় হয়।[২০] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। ফলে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা সত্ত্বেও চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ২৬-তম সাধারণ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুধুই পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে।[২১] ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ (যিনি পরবর্তীতে ৪১-তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ২৬-তম (বিশেষ) অধিবেশনে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আলোচনায় অংশ নিয়ে সমস্যার জন্য ভারতকে এককভাবে দায়ী করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন সময় ভারত কর্তৃক জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রস্তাব প্রত্যাখানের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।[২২] অপরদিকে চীনা প্রতিনিধি ভারতকে 'নগ্ন আগ্রাসী' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকেও 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করে ভারতের মদদদাতা হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৩] অথচ এই চীন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭১ সালের আগস্টে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে চীন মার্কিন বলয়ে যোগদান করে।

১৯৭১ সালের মধ্যভাগে চীন পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০০ টি লরিভর্তি সমর উপকরণ পাঠাতো। এছাড়া গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অক্টোবর মাসে চীন ঢাকায় ২০০ চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিলো।[২৪]

১৯৭১ সালের আগস্টে 'ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি'কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মনে করে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতার জন্য এটি একটি ব্লাঙ্ক চেক (Blank Cheque)। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করে, অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলাতে চাপ প্রদান না করলে দাঁতাত (detenete) আলোচনা ভেঙে যেতে পারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিক্সন। তার সময় দক্ষিণ এশিয়ায়

---

[২০] সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, "ড. জোহা হত্যাকাণ্ড ও ষাট দশকের রাজনীতি: একটি বিশ্লেষণ," *শামসুজ্জোহা স্মারকগ্রন্থ ২০১১* (রাজশাহী: শামসুজ্জোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ১৭৮।

[২১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৮৬৯।

[২২] এ কে এম জসীম উদ্দিন, "জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: একটি পর্যালোচনা," *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২৯-৩০ সংখ্যা, মার্চ ২০০৮), পৃ. ২০৮।

[২৩] তদেব, পৃ. ২০৯।

[২৪] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরাশক্তির ভূমিকা," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন, ১৯৮২, পৃ. ২৩৬।

এতদিনকার মার্কিন নীতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এর কারণ হিসেবে দুইটি বিষয়কে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত নিক্সনের উপর তার নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী ড. হেনরি কিসিঞ্জারের প্রবল প্রভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় রাজনীতির তিক্ততা। হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন প্রবল ভারতবিরোধী। ষাটের দশকে তিনি যখন দক্ষিণ এশিয়া সফর করেন, তখন ভারত তাকে যে আতিথেয়তা প্রদান করে, তা তার নিকট যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। অপরদিকে তিনি যখন পাকিস্তান সফর করেন তখন পাকিস্তানি জেনারেলগণ তাকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদান করে, যা তাকে মুগ্ধ করেছিল। এজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান ও চীনকে বেছে নিতে প্রভাবিত করেন। দ্বিতীয়ত প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডেমোক্রেট দলীয় প্রার্থী কেনেডিকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ধারণা করা হয় মার্কিন নির্বাচনের সময়ে ভারতের প্ররোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় ভোটারগণ কেনেডিকে সমর্থন করেছিলেন। এজন্য নিক্সন ভারতের উপর রুষ্ট ছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তি জোটের দ্বন্দ্ব শুধু জাতিসংঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি বাস্তবেও ছড়িয়ে পড়ে।

২৯শে নভেম্বর ২০১২ তারিখে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দলিলে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী ড. হেনরি কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন, জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়াকে তিনি যেন এইমর্মে সম্মত করান, যাতে তিনি চীন-মার্কিন মিলিত সহায়তা পাকিস্তানে প্রদান করতে সম্মত হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত দলিল অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে।[২৫] এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান ও ইরান হয়ে পাকিস্তানে সামরিক সরবরাহ প্রেরণ করে এবং ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রেরণ করে। ৯ই ডিসেম্বর রওয়ানা হয়ে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ১১ই ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়। অপরদিকে, ৬ই ডিসেম্বর সোভিয়েত নেভিও ভারত মহাসাগরে একদল যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলো 'ভ্লাডিভোস্টক' থেকে পারমাণবিক মিসাইল সজ্জিত হয়ে রওয়ানা দিয়েছিল। এ যুদ্ধজাহাজগুলো ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৭ই জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে 'ইউএস টাস্ক ফোর্স-৭৪' কে অনুসরণ করে। এর ফলে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক হুমকি মোকাবেলা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পারমাণবিক সাবমেরিনও ভারত মহাসাগরে প্রেরণ করেছিল। এ সংক্রান্ত সিআইএ'র রিপোর্ট ছিল যে, চীন উত্তরদিক থেকে ভারত আক্রমণ করবে না। যদি চীন উত্তর দিক থেকে ভারত আক্রমণ করতো তাহলে ভারত উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম – এই তিন দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে যেতো। তাই ভারতকে পাকিস্তান আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ দিক থেকে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে প্রেরণ করে যাতে ভারতকে চাপে রাখা যায়।

ব্রিটেনের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার 'ঈগল' ১০ই ডিসেম্বর '৭১ ভারত মহাসাগর উপকূলে প্রবেশ করলে রাশিয়ান সমরনায়ক ভ্লাদিমির ক্রুগলিয়াকভ এর নেতৃত্বে একদল সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নেয়। তারা ব্রিটিশ রণতরী 'ঈগল'-কে খুঁজতে থাকে, যদিও সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলি 'ঈগল'-কে মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। এজন্য ভ্লাদিভোস্টক থেকে দ্রুত ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও পারমাণবিক সাবমেরিন প্রেরণ করা হয়। এর ফলে ব্রিটিশ রণতরী বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রবেশ না করে দক্ষিণে মাদাগাস্কারের দিকে চলে যায়। এরপর ইউএসএস

---

[২৫] মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৭১।

এন্টারপ্রাইজ ও ইউএসএস ট্রিপোলিসের ভারত মহাসাগর অভিমুখে রওয়ানা হবার কথা জানা যায়। ভ্লাদিমির ক্রুগলিয়াকভ এ ব্যাপারে বলেন, "আদিষ্ট হয়ে আমরা ইউএস রণতরীগুলিকে ভারত মহাসাগরে এমনভাবে ঘিরে ধরি, যেন তারা ঢাকা, করাচি কিংবা চট্টগ্রাম পৌঁছাতে না পারে। এ সময়ে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলি ৩০০ কিলোমিটার রেঞ্জের মিসাইল সজ্জিত থাকায় আমরা ঝুঁকি নিয়ে যতটা সম্ভব ইউএস রণতরীগুলির নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করি।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ এশিয়া নীতি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে। এর প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি, ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এতে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। অবশ্য একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চীনের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতার ভূমিকা পালন করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে উভয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের উপর জোর দেয়। সোভিয়েত মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের ৩ জানুয়ারি তাসখন্দে ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে মিলিত হয়ে জাতিসংঘের আইন মোতাবেক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সম্মত হয় এবং উক্ত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারির পূর্বেই উভয় রাষ্ট্র তাদের সৈন্যদের যুদ্ধপূর্ব অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইউরোপ।

১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্র লেখেন। এ চিঠির ভাষা কূটনৈতিক দিক দিয়ে ছিল খুবই কড়া। তিনি লিখেছিলেন, "পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দু'একটি কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমানে পাকিস্তানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং তা করতে হবে।"[২৬] তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরুতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। ১৯৭১ সালের ২৮-২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ৩ জন সোভিয়েত শীর্ষনেতা – লিওনিদ ব্রেজনেভ, নিকোলাই পদগর্নি এবং আলেক্সি কোসিগিন দীর্ঘক্ষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় ব্রেজনেভ বুঝতে পারেন যে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রমাণ রয়েছে।[২৭]

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "... When millions of people are pushed into another territory, jeopardizing its normal life, its plans for the future, and its very security, it is obvious that peace is in peril."[২৮]

২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভারতের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ: "বাঙালি নিধনযজ্ঞের মুখে বিশ্ববিবেক নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারেনা।"[২৯]

---

[২৬] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১৩শ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৫৬১।

[২৭] সাক্ষাৎকার, ডি.পি. ধর, মঈদুল হাসান, পৃ. ৩০০।

[২৮] *স্বাধীনতার দলিল*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৮০।

[২৯] Robert Jackson, *South Asia Crisis* (New Delhi, 1974), p. 150.

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সে প্রসঙ্গ টেনে ইন্দিরা গান্ধি বলেন, "We don't want to go to war. In fact, we tried to avoid it. ... but, what is peace? Peace does not mean that we keep quite while the people of a neighbouring country are being annihilated. This is not peace."[৩০]

ভারতে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ডি এম মার্শাল এন্ডি গ্রেচকো'র (D M Marshal Andey Grechko) ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রেরিত গোপন বার্তা থেকে জানা যায়, ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ভারত আক্রমণ করলে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার 'রাজপুত' হতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানি সাবমেরিনকে ডুবিয়ে দেয়। ৪ঠা ও ৯ই ডিসেম্বর ভারতীয় স্পিডবোটগুলি সোভিয়েত নির্মিত এন্টিশীপ পি-১৫ মিসাইল আক্রমণ দ্বারা ১০টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজকে ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে ১২টি পাকিস্তানি তৈল গুদাম অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন ও সোভিয়েত ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য; কেননা ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের অন্যতম শক্তিশালী উপনিবেশ। এ সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতিতে নিজেকে যথাসম্ভব না জড়ানোর নীতি অনুসরণ করে। ফলে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্রিটেনের উপনিবেশ ভারতের ব্যাপারে তার আনুষ্ঠানিক কোনো তৎপরতা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও উপমহাদেশে অব্যাহত স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্রিটিশশক্তি তাদের চিরন্তন নীতি অনুযায়ী, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতকে দুটি চরম বিবদমান রাষ্ট্র – ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে বিভক্ত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

লোকবল, সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তির বিচারে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান তার নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে সে মার্কিন বলয়ে যোগদান করে। মার্কিন আকাঙ্ক্ষার সাথে মিল রেখে পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাঙালিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আন্দোলনকারীদের শুরু থেকেই কমিউনিস্টদের 'চর', হিন্দু ভারতের 'দালাল' প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করে। পাকিস্তানি অপপ্রচারে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মার্কিন শাসকদের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়নি।

অপরদিকে ভারত নিজেকে দ্বি-মেরু কেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতি থেকে সযত্নে দূরে রাখে। এজন্য ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেয়। ভারত সোভিয়েত বলয়ে যোগদান না করলেও তার 'নিরপেক্ষ' নীতি নিয়ে অগ্রসর হওয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহের চোখে দেখে। ভারতের বিশাল জনসংখ্যার ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে সেখানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিস্তারের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে তা মার্কিন নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যানের বিদেশ সচিব জর্জ সি. মার্শালের পরামর্শ মোতাবেক ইউরোপের অর্থনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কমিউনিজমের বিস্তার রোধের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এশিয়াতেও বিস্তার লাভ করে। এরই অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায়

---

[৩০] *স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

সোভিয়েত প্রভাবকে 'বোতলবন্দী' করার প্রক্রিয়া শুরু করে।[৩১] পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত প্রভাবে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট ভারতকে আরেকটি সমাজতান্ত্রিক চীনে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তার দক্ষিণ এশিয় নীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করে।

১৯৬২ সালে যখন চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করে। তবে পাকিস্তানকে এই বলে নিশ্চয়তা দেয় যে ভারতকে দেওয়া অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। কেনেডি প্রশাসন (১৯৬১-৬৩) এ সময়ে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই কাশ্মীর প্রশ্নে সমঝোতায় আসতে চাপ প্রয়োগ করে। আবার ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের উপর সামরিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং উভয় পক্ষকে চাপ দিয়ে যুদ্ধ বিরতি করতে বাধ্য করে। তবে জনসন প্রশাসনের সময়ে (১৯৬৩-৬৯) দিল্লী-ওয়াশিংটন সম্পর্ক শীতল হয় কেননা, ভারত এ সময়ে কিউবার ফিডেল কাস্ট্রোর সাথে জোরালোভাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পাকি-মার্কিন সম্পর্ক জোরদার হয়।

ষাটের দশকের শেষের দিকে মার্কিনের ভারত-প্রীতি পাকিস্তানকে তার নিরাপত্তার জন্য বিকল্প বন্ধুর সন্ধান করতে বাধ্য করে। এজন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান চীনের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে নতুনভাবে মনোযোগ দান করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পরবর্তী সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের সহায়তায় চীন-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কেরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে ভারতের একার পক্ষে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা প্রভাব মোকাবেলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত-পাকিস্তান উভয়কেই তার 'security system' এ আনতে চেয়েছিল কিন্তু পাকিস্তানের চীনবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি তাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি হেনরি কিসিঞ্জারের গোপন বেজিং সফর চীন-পাকিস্তান-মার্কিন কূটনীতির নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করলে রুশ-ভারত মৈত্রী আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।[৩২]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন-সোভিয়েত স্নায়ুযুদ্ধ প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় যেকোন মূল্যে কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার উপমহাদেশে মার্কিন নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা অনুসরণ করে 'containment barrier' সৃষ্টি করে পাকিস্তান ও ভারত-উভয়কেই চীন-সোভিয়েত বলয়ের বাইরে রাখার চেষ্টা করে। ষাটের দশকে চীন-ভারত ও ভারত-পাকিস্তান

---

[৩১] ১৯৪৬ সালে মস্কোয় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কিন্নান *ফরেন এফেয়ার্স* পত্রিকায় 'এক্স' ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ লিখে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মার্কিন নীতি কীরূপ হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন যে, সোভিয়েত সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ ঐতিহ্যগত হওয়ায় মস্কো নিজ অবস্থান থেকে নড়বে না। সুতরাং মস্কোকে তার অবস্থানেই সীমাবদ্ধ করে ফেলা উচিত। তিনি বলেন, 'মস্কোর শক্তি বিস্তারের চাপ রুখতে হবে দৃঢ় ও সতর্কভাবে বোতলবন্দী করার মাধ্যমে।' এটি কিন্নানের বিখ্যাত 'বোতলবন্দী নীতি' নামে পরিচিত যা উত্তর ইরান, গ্রীক, তুর্কি প্রণালী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফল হয়েছিল। (দেখুন: *মার্কিন ইতিহাসের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১)।

[৩২] Abul Kalam, "Bangladesh Independence Movement, South Asia and Great Power Triangle: A Strategic Re-assessment," *Bangladesh South Asia And The World,* edited by Emajuddin Ahmed & Abul Kalam (Dhaka: Academic Publishers, 1992), p. 25.

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে সোভিয়েতের এবং পাকিস্তানের সাথে মার্কিন সম্পর্ক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। চীন-সোভিয়েত আদর্শিক দ্বন্দ্ব শুরু হলে পাকিস্তানের সহায়তার চীন-মার্কিন সম্পর্কে নতুন মেরুকরণ ঘটে। এজন্য আমরা লক্ষ করি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সংকট নিরসনের জন্য ১৯৭১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম (বিশেষ) অধিবেশন শুরু হলে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ঘোষণা করেছে; পাকিস্তানের নিষ্ঠুর গণহত্যার বিষয়ে সচেতনভাবে উদাসীন থেকেছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী পাকিস্তানি হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন সত্ত্বেও বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দানের পরিবর্তে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতিই তারা তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। বাঙালিদের স্বাধীনতার দাবির বাস্তবতার চেয়ে তাদের নিকট পাকিস্তান ভেঙে গেলে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি পাবে – এই আশঙ্কাই মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। আর তাই যুক্তরাষ্ট্র নেপথ্যে থেকে এবং চীন প্রকাশ্যে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এর ফলে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে ২৬তম (বিশেষ) অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব (A/L 648) গৃহীত হওয়ার পরিবর্তে ৩৪টি দেশের সংশোধিত প্রস্তাব (A/L 647 Rev) গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানকে নিজ নিজ ভূ-খণ্ডে তাদের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেওয়াসহ যুদ্ধবিরতির আহবান জানানো হয়। জাতিসংঘের এ প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়।

টেলিগ্রামের মাধ্যমে জাতিসংঘের মহাসচিব উভয় দেশকে প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করে। ভারত এসময় সময়ক্ষেপনের কৌশল অবলম্বন করে এবং ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রস্তাব সম্পর্কে নীরব থাকে। ভারত জাতিসংঘকে সহযোগিতাদানের সদিচ্ছা প্রকাশের পাশাপাশি প্রস্তাব সম্পর্কে তার নেতিবাচক মনোভাবও ব্যক্ত করে। ইত্যবসরে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। স্নায়ুযুদ্ধের আগল ভেঙে উদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্বরাজনীতির অন্যতম আলোচ্যসূচিতে পরিণত হয়েছিল। শুধুমাত্র সোভিয়েত প্রভাবকে মোকাবেলা করার স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। মার্কিন প্রশ্রয়প্রাপ্তির ফলেই ইয়াহিয়ার পক্ষে মানবেতিহাসের অন্যতম বৃহৎ গণহত্যা সংঘটন করা সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদিও প্রথম দিকে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে' ভারত-পাকিস্তানের স্বাভাবিক বৈরিতার ফল হিসেবেই গ্রহণ করেছিল; সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মস্কো সফরের মধ্য দিয়ে তারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারে। ফলে জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার জনযুদ্ধের মুখে যখন পাকিস্তান হানাদারবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল, সেসময় পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারত-পাকিস্তান' যুদ্ধে রূপান্তরিত করে জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে আসন্ন পরাজয় এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়োচিত 'ভেটোর' কারণে তাদের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি বঙ্গোপসাগরে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে প্রেরণ করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ভারত মহাসাগরে সময়মত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ সাবমেরিন প্রেরণের ফলে সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত অপরিমেয় রক্তদান আর অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় 'বাংলাদেশ'।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার: উদ্দেশ্য ও ফলাফল

মোহাম্মদ নাজিমুল হক*

Abstract: Murshid Quli Khan also known as Mohammad Hadi was the first Nawab of Bengal and ruled from 1717 to 30 June 1727. During his regime, he became a prominent figure for his revenue reforms. He surveyed the lands and fixed the revenues of the rayats after determining the capacity of the husbandmen to pay. In this regard, he replaced the Mughal *jaigirdari* system with the *mal zamini* system. He took security bonds from the contractors or *ijardaars* who later collected the land revenue. Quli Khan continued his policy of sending a part of the revenue collected to the Mughal Empire. He did so even when the empire was in decline with the emperor loosing no power, and the power got concentrated in the hands of kingmakers the Nawabs. In this paper, the author tries to give focus on what measure had been taken by Murshid Quli Khan to rearrange the revenue administration, how it affected the general people, what was the result of that reforms and how he became successful in doing the reforms.

ভূমিকা

সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে রাজস্ব সংস্কার বাংলার রাজস্ব ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রাজস্ব পরিচালনার নীতি, রাজস্বের গতি ও প্রবণতা এবং রাজস্বের সঞ্চয় ও ব্যয়ের মৌল প্রকরণগুলি মুর্শিদকুলী খানই নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে দিউয়ান হিসেবে তাঁর নিযুক্তির সময় থেকেই তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বাংলার ভূমি রাজস্ব পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সুবাদারি (১৭১৭-১৭২৭) লাভের পর তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদকুলী খান সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল রাজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ সময় থেকে বাংলার সুবাদাররা প্রায় স্বাধীনভাবেই কাজ করতে থাকেন এবং বংশানুক্রমে সুবাদার বা নবাবের পদ লাভ করেন। মুঘল সিংহাসন নিয়ে ক্রমাগতভাবে উত্তাধিকার যুদ্ধের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, প্রাদেশিক সুবাদাররা ক্ষমতাবান হয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো সুবা স্বাধীন হয়। সুবা বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না এবং এ প্রক্রিয়ায় আইনত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হলেও সুবাদাররা মোটামুটিভাবে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেন। ফলে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলার ইতিহাস নবাবি আমল নামে পরিচিত লাভ করে। ভূমিরাজস্ব উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, তাই মুসলিম আমলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির দিকে লক্ষ রেখে ভূমিকর পরিবর্তন করা হতো। মুর্শিদকুলী খানও ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করেন। বাংলা নদীমাতৃক, নদীর এককূল ভাঙ্গে অন্যকূল গড়ে। ফলে ভাঙা গড়ার মধ্যে আবাদ নষ্ট হয়। তাই ভূমি রাজস্বব্যবস্থাও নতুন করে নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়। মুর্শিদকুলী খান সম্পূর্ণ রাজস্বব্যবস্থা পরীক্ষা করে সংস্কারের উদ্যোগী হন এবং তাঁর সংস্কার নীতিসমূহ ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করে।

---

* ড. মোহাম্মদ নাজিমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলায় প্রাক-মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থা

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে নদীয়া ও লখনৌতিতে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মধ্য এশিয়ায় মুসলিম রাজস্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় সুলতানি আমলে যদিও মুসলিম শরিয়ত এবং দিল্লির রীতিনীতি অনুসরণ করে সুলতানগণ রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তথাপি স্থানীয় রাজস্ব প্রথার সঙ্গে এর খুব একটা পার্থক্য ছিল না। বাংলার বিজিত শাসকগণের মুসলিস রাজস্বনীতি সামান্য রদবদলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে মোটেও অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। বাংলার সুলতানগণ এদেশে মুসলিম ও হিন্দু রাজস্ব প্রথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সফল রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাংলায় সুলতানি আমলে বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে রাজস্বের উৎস ছিল গনিমাহ্, ভূমিরাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক, এবং আবগারি শুল্ক।[১] গনিমাহ্ অবশ্য কোনো কর নয়, এটি যুদ্ধলব্দ সামগ্রী। তবে যুদ্ধ সবসময় সংঘটিত হতো না বিধায় এটি রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক রাজস্বের উৎস ছিল না। সুলতানি আমলে বাংলার রাজস্বের উৎসগুলির মধ্যে ভূমি রাজস্বই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। কারণ প্রাচীনকালে ভূমিরাজস্ব ছিল রাজ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। রাজা বা রাষ্ট্র দেশের সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক দুইই ছিলেন।[২] সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে এই চেতনাই বিকাশ লাভ করে যে, রাজা বা রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থার ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলায়ও অর্থনৈতিক জীবনে জমিই ছিল প্রধান ভিত্তি। প্রাক-মুসলিম আমলে বাংলার ভূমিরাজস্বের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের আভাস আছে। প্রাচীনকালে এদেশে ভাগচাষ পদ্ধতি প্রচলন ছিল; তখন কৃষককুল উৎপাদিত শস্যের এক চতুর্থাংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করতো। তবে ঐ অংশের পরিবর্তে নগদ অর্থেও খাজনা পরিশোধ করা যেতো।[৩] সেন শাসনামলে নগদ টাকায় রাজস্ব দেওয়া যেতো-যা হিরানিয়া পদ্ধতি নামে খ্যাত।[৪] দিল্লির প্রথম সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবক ভূমিরাজস্বের হার নির্ধারণ করেন উৎপাদিত শস্যের এক পঞ্চমাংশ। এই হার বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল কি-না তা জানা যায় না। তবে আলী মর্দান খলজির (১২১০-১২১২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু রায়গণ তাঁকে রাজস্ব পাঠাতে শুরু কর। সুলতান মুঘীস উদ্দিন উযবক মন্দারন ও নদীয়ার ভূমি রাজস্ব দিয়ে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন (১২৫৫ খ্রি.)। সুলতান রুকন উদ্দিন কায়কাউস বঙ্গের (পূর্বাঞ্চলের) ভূমি রাজস্ব দিয়ে মুদ্রা জারি করেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন তিনি এক ঘোষণাপত্রে (বাংলা) জমিদারদের ভূমি রাজস্ব মওকুফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৫] যা সুলতানি আমলের প্রারম্ভকাল থেকেই ভূমি রাজস্ব আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে (১৩৪৫-১৩৪৬ খ্রি.) জানা যায় রাজস্বের হার ছিল উৎপাদিত শস্যের এক দ্বিতীয়াংশ। ইবনে বতুতার সমসাময়িক লেখক ওয়াং তা- ইউয়ানের বিবরণে রাজস্বের হার ছিল এক পঞ্চমাংশ। শের শাহের ভূমি রাজস্বব্যবস্থা অত্যধিক বিস্তারিত, সুসম্পন্ন ও সুপরীক্ষিত ছিল।[৬] শের শাহের শাসনামলে (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.) ভূমিরাজস্ব ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ।

---

[১] মো.আব্দুল করিম, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস-মুসলিম আমল (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.)* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৮), পৃ.৩১-৩২।

[২] *Journal of the Asiatic Society of Pakistan* (Dhaka), vol.3, 1958, pp.83-84.

[৩] I. H. Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, 2nd edition (Karachi: Pakistan historical society, 1944), p. 86.

[৪] Khitis Chandra Chaudhuri, *The History and Economic of the Land System in Bengal* (Kolkata: The book company, 1927), p. 27.

[৫] Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal (down to A.D 1538)* (Dhaka: Asiatic society of Pakistan, 1960), p. 22.

[৬] Basher Ahmed Khan Matta, *Sher Shah Suri: A Fresh Perspective* (London: Oxford University press, 2005), P.70.

সুলতানি আমলের ন্যায় মুঘল শাসনামলেও ভূমিরাজস্বই ছিল সুবা বাংলা সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। ন্যায় ও কার্যকর নীতির ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা মুঘল শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল । তখন বাংলার রাজস্ব আদায়ের দুটি উৎস ছিল যথা মাল ও সায়ের। মাল হলো ভূমি রাজস্ব এবং সায়ের হলো ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্য সকল আয়। ভূমি আবার খালিসা ও জায়গির নামে বিভক্ত।[৭] ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয় শুরু হলেও সর্বাংশের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই মুঘলদের দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ভূমি রাজস্ব জায়গিরে বিভক্ত ছিল। ফলে বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্বের উন্নতির গুরুত্ব মুঘলদের নিকট যতই অনুভূত হয়ে থাকুক টোডর মলের ব্যবস্থার প্রয়োগ ভিন্ন বাংলার ভূমির জরিপ, জরিপের মাধ্যমে ভূমির শ্রেণিগত বিন্যাস সাধন, নিখুঁত হিসাবের ভিত্তিতে ভূমির রাজস্ব নির্ধারণ, কৃষকের স্বার্থ, রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিতে পূর্ণ শৃঙ্খলা আনয়ন, সর্বোপরি ভূমিরাজস্বের সুবিধাভোগ তথা ভূ-অভিজাতবর্গের সমগ্র অংশকে অপরাপর প্রদেশের মতো একটি কর্তৃত্বাধীন অবকাঠামোর আওতায় পূর্ণ মাত্রায় সম্পাদন মুঘল সুবাদারদের পক্ষে রাতারাতি সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[৮] রাজা টোডর মলের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের মধ্যে উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে টোডর মলের রাজস্বনীতিই আদর্শই হিসেবে অনুসৃত হয়। তবে শাহ শুজার সময়ে রাজস্ব ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু কেবল মুর্শিদকুলী খানের সময়ই তা ফলপ্রসূ হয়। মুর্শিদকুলী খানের বাংলায় আগমনের প্রাক্কালে এখানকার ভূমি রাজস্বের বিষয়ে সঠিক কোনো পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো না এবং প্রকৃতপক্ষে সরকার এখাত হতে কোনো নির্দিষ্ট রাজস্ব পেতেন না। বাংলায় মুঘলদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ার পর থেকে এ প্রদেশে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের পরিবর্তে জায়গির হিসেবে ভূমি বণ্টন করে দেয়া হতো।[৯] এমনকি সরকারি কর্মচারীদেরকে জায়গির হিসেবে রাজকীয় ভূসম্পত্তিও প্রদান করা হতো। এ সব জায়গিরদার সরকারকে খাজনা বা রাজস্ব দিতেন না বা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করতেন না। অধিকন্তু, রাজস্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে যেমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ছিল না, তেমনি তা আদায় করার ব্যাপারেও কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। কর আদায়কারী কর্মচারীদের মর্জির উপর রায়তদের নির্ভর করতে হতো। এসব কর্মচারী নিজেদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য কৃষকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না।[১০] বলা বাহুল্য, সরকার এ গুরুত্বপূর্ণ উৎসের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতেন। সরকারের আর একটি আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য শুল্ক। এ বাণিজ্য ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। বস্তুত, বাংলায় মুঘল প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন পর্যন্ত কখনও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনোরূপ সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডর মল উত্তর ভারতীয় রাজস্বনীতি বাংলায় চালু করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[১১] এছাড়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলায় অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে কোনরূপ সুষ্ঠু রাজস্বনীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান যখন বাংলার দিওয়ান নিযুক্তি হয়ে আসেন তখন সুবার রাজস্বব্যবস্থা

---

[৭] W.H. Moreland, *The Agrerian System of Moslem India*, reprint 2nd ed. (Delhi: Oriental books, 1968), p. 92.

[৮] Abul Fazl Allami, *Ain-i-Akbari,* Vol.1, tr. H. Blochmann (Kolkata: Asiatic society of Bengal, 1873), p. 165.

[৯] N.K.Sinha, *Economic History of Bengal,* vol. 11 (Kolkata: Farma K.L. Mukhapadhyay, 1968), p.65.

[১০] এন এ সিদ্দিকী, *মোঘল রাজত্বে ভূমি রাজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা, ১৭০০-১৭৫০* (কলকাতা: পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮০), পৃ.১৪৬।

[১১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২৬৫-২৬৬।

সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিলো না। বস্তুতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের এককালের সফল ও সুদক্ষ দিওয়ানি প্রশাসক মুর্শিদকুলী খানকে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার রাজস্ব প্রশাসনের উন্নতি বিধান ও সংস্কার সাধন।[১২] ইতঃপূর্বে মুজাফফর খান তুরবতী, রাজা টোডর মল, মীর জুমলা প্রমুখ বাংলার রাজস্ব প্রশাসনের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের মূলকথা ছিল একটি সার্বিক রাজস্ব তালিকা তৈরি করা, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তালিকা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা।[১৩] যতোদিন পর্যন্ত জমিদারেরা যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে পাঠাতো, ততোদিন তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদার বহাল রাখা হতো।

রাজস্ব সর্বাধিকরণ (revenue maximization) যে কোনো সরকারের মূল লক্ষ্য। শাসনের আর্থিক উপকরণ না থাকলে শাসনযন্ত্র দুর্বল হয় এটি যে কোনো যুগে অর্থনীতি ও সমাজনীতির একটি সত্য প্রত্যয়ন। মুর্শিদকুলী খান চেয়েছিলেন রাজস্বের প্রাক-অঙ্গীকার (pre-gurantee)। এখানে রাজস্বে স্থায়ীকরণের কোনো প্রশ্ন ছিল না বরং বছর বছর স্থির হবে।[১৪] লর্ড কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন রাজস্বের স্থায়ীকরণ ও প্রাক-অঙ্গীকার দুইই।[১৫] মুঘল শাসনামলে বাংলার ভূমিরাজস্বের তিনটি ভাগ ছিল: মাল, সায়ের ও বাজি বা বাজে জমা। কৃষকদের দেয় মূল খাজনাকে বলা হতো-মাল। আমিনি কমিশনের ভাষায় যে রাজস্ব নির্দিষ্ট, যাকে নির্ণয় করা যেতো, যার উৎস জানা ছিল, যা চরিত্রগতভাবে ছিল প্রায় স্থায়ী-তাকে মাল বলা হতো। ফল ও ফুল বাগিচা, বিশেষ বিশেষ জীবিকার উপর কর, চিনি ও লবণ উৎপাদনের খাজনা ইত্যাদিও মাল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পণ্যদ্রব্যের উপর খাজনা বা শুল্ককে সায়ের বলা হতো যা স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে শুল্ক নির্ধারিত হতো। মাল ও সায়ের বাদ দিয়ে আর যে সব বিবিধ খাজনা ও শুল্ক ছিল তাকে বাজি জমা, ইংরেজ দলিলে যাকে বাজে জমা বলা হতো।[১৬] যে সব খাজনা পূর্বাহ্নে স্থির করা যেতো না, যাকে নির্ণয় করা কঠিন ছিল, যাকে সহজে বাড়ানো বা কমানো যেতো, যা ঐতিহ্য, প্রথা বা আইন কোনো কিছুর ওপর সুনিশ্চিতভাবে নির্ভরশীল ছিল না, সেরকম শুল্ক বা খাজনাকে বাজি জমা বলা হতো।

নবাবি আমলে নবাবরা মোটামুটিভাবে মূল ভূমিরাজস্ব বা মালকে স্থির বা অপরিবর্তনীয় রেখে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। মাল ছিল ঐতিহ্যগতভাবে স্থির এবং প্রথাগতভাবে নির্দিষ্ট। বিধায় মুঘল আমলে নবাবরা মূল ভূমিরাজস্বের হেরফের না ঘটিয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তারা আবওয়াব নামে এক নতুন করের উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত আবওয়াবকে আবওয়াব-ই-খাসনবিশি বলা হতো।[১৭] পরবর্তীতে শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খানও কয়েকটি আবওয়াব প্রবর্তন

---

[১২] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১০ম সংস্করণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৩), পৃ.২৭৯।

[১৩] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ.৬৩।

[১৪] রঞ্জিত সেন, *বাংলাদেশের রাজস্ব শাসন:১৮ শতক* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১।

[১৫] ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতায় গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন। কর্নওয়ালিস ছিলেন একজন বড় এস্টেটের মালিক। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তকৃত দশশালা রাজস্ব ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করেন। এর দ্বারা জমিদারকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়। জমিদারকে জমি হস্তান্তর ও দান করা এবং বংশ পরম্পরায় জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রতিদানে জমিদারগণ ধার্যকৃত রাজস্ব সময়মত প্রদান করার জন্য সম্মত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বলা হয় যে, কৃষির উন্নতির জন্য সম্পদ বৃদ্ধি হলেও ধার্যকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না।

[১৬] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭)*, পৃ. ১৯৮।

[১৭] এ কে এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৬), পৃ. ১৪৬।

করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে এই কর চালু হয়েছিল এবং প্রথমদিকে এই করের পরিমাণ কম থাকলেও পরবর্তীকালে তা কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুর্শিদকুলী খান থেকে মীর কাশিম (১৭১৭-১৭৬৪) পর্যন্ত সকলে যে আবওয়াব প্রবর্তন করেন তার মোট অঙ্কের পরিমাণ ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকা।[১৮] মুর্শিদকুলী খানের সময়ে মুঘল বাংলায় ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা হয়েছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে ন্যায় ও কার্যকর নীতির ভিত্তিতে বাংলার রাজস্ব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে দিওয়ান হিসেবে তাঁর নিযুক্তির সময় থেকেই তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বাংলার ভূমি রাজস্ব পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সুবাদারি লাভের পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব সর্ধাধিকরণে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ছিল উদার কিন্তু সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর।[১৯] তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপ:[২০]

১. তিনি প্রশাসনে অপব্যয় বন্ধ করেছিলেন;
২. তিনি নিজে সরাসরিভাবে রাজস্ব প্রশাসনের খুঁটিনাটির উপরও নজর রাখতেন;
৩. মুর্শিদকুলী খান অত্যন্ত কঠোরভাবে এই প্রথা চালু করেছিলেন যে জমিদারদের যথাসময়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাষ্ট্রের তহবিলে রাজস্বরূপে জমা দিতে হবে। তা না করতে পারলে জমিদারদের ওপর নির্মম নিষ্পেষণ নেমে আসতো।
৪. তিনি সমস্ত প্রশাসনকে, বিশেষভাবে রাজস্ব প্রশাসনকে মুর্শিদাবাদে নবাবের হাতে অর্থাৎ তাঁর নিজের হাতে কেন্দ্রায়িত করেছিলেন। নবাবের রাজনৈতিক ও দেওয়ানের আর্থিক ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রায়িত করার ফলে তাঁর পক্ষে রাজস্ব প্রশাসন সংরক্ষণ করা এবং রাজস্বের প্রাক্-অঙ্গীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।
৫. মুঘল কর্মচারীদের সমুদয় জায়গির খাস জমিতে পরিণত করেন এবং কর্মচারীগণকে তাঁর পরিবর্তে উড়িষ্যা অনুন্নত ও জঙ্গলাবৃত অঞ্চলে জায়গির প্রদান করেন।
৬. রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইজারাদারদের হাতে ন্যস্ত করেন।

সরকারি কর্মকর্তারা সরাসরি রায়ত বা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করত যা খালিসা ভূমি নামে খ্যাত ছিল। আবার কিছু ভূমি বেতনের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জায়গির দেওয়া হতো যাকে জায়গির ভূমি বলা হতো।[২১] কার্যত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা খুব একট সহজ ছিল না, বরং এটি একটি জটিল বিষয় বলে গণ্য হতো। সায়ের রাজস্ব হলো ভূমি ছাড়া যেমন-ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান পাট কেনাবেচার উপর আরোপিত কর, নদী, খাল বিল, মৎস্য সম্পদের উপর আরোপিত কর, লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও বনমহাল ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শুল্ক সায়েরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে খালিসা, জায়গির ভূমি, সরকারি দিউয়ানি বিভাগের কর্মচারীদের রাজস্ব সংগ্রহ, জমিদারি প্রথা, সায়ের রাজস্ব ইত্যাদি সব মিলিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থা খুব একটা উদার ছিল না।[২২] মুর্শিদকুলী খান সমগ্র বাংলার কর্ষিত জমি জরিপ করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। জমির বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকের নাম ও তাদের রাজস্বের পরিমাণও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মুর্শিদকুলী খান দীর্ঘদিন ভূমি পরীক্ষা করে রাজস্ব সংগ্রাহক, কানুনগো ইত্যাদির মাধ্যমে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। উড়িষ্যার

---

[১৮] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭)*, ২য় খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানও ফজলে রাব্বী অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ৮৫।

[১৯] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times* (Dhaka: Asiatic society of Pakistan, 1963), p. 220.

[২০] James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal*, 1786, apendix 4. pp. 162-163.

[২১] F. D. Ascoli, *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, 1812* (Oxford: Claredon press, 1917), p. 26.

[২২] Ibid.

ভূমি বাংলার ভূমির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ছিল। তাই তিনি জায়গিরদারদের জায়গির ভূমি বাংলা থেকে উড়িষ্যায় স্থানান্তর করেন।[২৩] ভূমির উৎপাদন শক্তি নির্ধারণে জমিদারেরা অশুভ প্রভাব খাটাতে পারে মনে করে তিনি জমিদারদের আটক করে রাখেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতেই ভূমির উৎপাদন শক্তি নির্ধারণ করেন। তিনি শিকদার, আমিন, কারকোন ও জরিপকারিদের সাহায্যে আবাদি ও পতিত জমি পৃথকভাবে পরিমাপ এবং রাজস্ব নির্ধারণ করেন।

মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব ক্ষেত্রে জায়গির প্রথার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হন। জায়গির প্রথার কুফল ও ত্রুটিযুক্ত হয়ার কারণে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে জায়গিরের পরিবর্তে বেতন গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠায় মুর্শিদকুলী খানের জায়গির প্রথা বিলোপের নীতি সরকারি কর্মচারীদের সমর্থন লাভ করে এবং তা উঠিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়। তিনি সমস্ত কর্মচারীদের জায়গির সরকারি সম্পত্তি বা খালিসায় পরিণত করেন এবং এর রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারি আদায়কারী নিয়োগ করা হয় যা আমিল নামে পরিচিত। অভিজ্ঞ, বিশ্বাসী ও পরিচিত বাঙ্গালিদের মধ্য থেকে যাচাই করে আমিল নিয়োগ করা হতো। এ ব্যবস্থার ফলে যে সব কর্মচারী জায়গির থেকে বঞ্চিত হতেন মুর্শিদকুলী খান তাদেরকে নতুন জায়গির স্বরূপ উড়িষ্যার অনুন্নত ও স্বল্প মূল্যের ভূমি প্রদান করেন।[২৪] মুর্শিদকুলী খানের এ নয়া ব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব খাতে রাষ্ট্রের আয় বহুগুণ বেড়ে যায়। এ নীতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই কেবল শুভ হলো না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুফল বয়ে এনেছিল। কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির প্রদান প্রথার কুফল সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় হতেই লক্ষ করা গিয়েছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের পূর্বে এ প্রথা উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাজস্ব সংগ্রহের নীতি সম্পর্কে দেখা যায় যে, জমিদার ও আমিল উভয়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। আমিন বা আমিন গুজার নামক কর্মচারীদের প্রবর্তন করে মুর্শিদকুলী খান রাজস্বব্যবস্থার কিছুটা অভিনবত্ব এনেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচলিত প্রথা থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেননি, কারণ তিনি জমিদারদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেননি। আকবর জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান তা বহাল রাখলেন।[২৫] মুর্শিদকুলী খান জমিদার, আমিল ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে স্থিরীকৃতহারে রাজস্ব আদায় করতেন। এতে বোঝা যায় যে, জমিদার ও আমিল সকলেই জরিপের পর স্থিরীকৃত রাজস্ব নথি বা খতিয়ানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। মুর্শিদকুলী খান সময়মত রাজস্ব আদায়ে জমিদারদের উৎসাহিত করতেন, কিন্তু রাজস্ব খেলাফিদের কারারুদ্ধ করে শাস্তি দেন। খেলাফি জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি নতুন জমিদারদের নিকট জমিদারি দিতেন, ফলে নতুন নতুন জমিদারি সৃষ্টি হতো।[২৬] নতুন জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে বেশি তৎপর হতেন। কার্যত মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের মূলনীতি হলো, ভূমি থেকে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা এবং একই সাথে রায়ত বা কৃষকদের সুখে শান্তিতে রেখে সন্তুষ্টি বিধান করা। এ লক্ষ্যে অকর্ষিত ও অনাবাদি ভূমি কৃষির উপযোগী করে তোলা এবং দিওয়ানি বিভাগের খতিয়ানভুক্ত করা হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত রাজা টোডর মলের বন্দোবস্ত প্রায় ৭৬ বছর বাংলায় অপরিবর্তিত ছিল। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে শাহ শুজার আমলে

---

[২৩] R.B. Ramshothan, *Studies in the Land Revenue History of Bengal 1769-1787* (London: Oxford university press, , 1926), p. 68.

[২৪] E. Thomas, *Revenue Resources of the Mughal Empire in India* (London : Trubner & Co., 1871), p. 109.

[২৫] S. Bhattacharyya, *East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740* (London: Trubner & Co., Ltd, 1954), p. 53.

[২৬] H.V. Bowen, *Revenue and Reforms: The Indian Problem in British Politics 1757-1773* (Cambridge: Cambridge University press, 2009), p. 27.

নতুন বন্দোবস্ত হয়।[২৭]

টোডর মলের বন্দোবস্ত থেকে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত পর্যন্ত রাজস্ব বৃদ্ধি নিম্নরূপ:[২৮]

বন্দোবস্ত	খালিসা	জায়গির	মোট রাজস্ব
টোডর মল	টা. ৬৩,৪৪,২৬০	টা. ৪৩,৪৮,৮৯২	টা. ১,০৬,৯৩,১৫২
শাহ শুজা	টা. ৮৭,৬৭,০১৫	টা. ৪৩,৪৮,৮৯২	টা. ১,৩১,১৫,৯০৭
মুর্শিদকুলী খান	টা. ১,০৯,৬০,৭০৯	টা. ৩৩,২৭,৪৭৭	টা. ১,৪২,৮৮,১৮৬

মুর্শিদকুলী খান যতবড় অর্থসচিব ছিলেন ততবড় প্রশাসক ছিলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মধ্যস্বত্বভোগীরূপে জমিদাররা অনেকখানি অর্থ আত্মসাৎ করেন। শুজা জমিদারি জমির বন্দোবস্তভুক্ত রাজস্বের পরিমাণ ১৫% বৃদ্ধি করেছিলেন। আর মুর্শিদকুলী খান সেই বন্দোবস্তকে ১৪% বৃদ্ধি করেন। ১৪% বৃদ্ধি এমনকিছু বড়মাপের বৃদ্ধি নয়। উপরের বন্দোবস্তের পরিসংখ্যানটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের সময়ে রাজস্বের কোনো বৈপ্লবিক বৃদ্ধি হয়নি। টোডর মলের সময় মোট বন্দোবস্ত ছিল ১০৬.৯৩ লক্ষ টাকা এবং ৭৬ বছরে বেড়ে হয়েছিল ১৩১.১৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৭৬ বছরে বেড়েছিল ২৪.২৩ লক্ষ টাকা যা টোডর মলের বন্দোবস্ত থেকে শুজার বন্দোবস্তের মধ্যে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল গড়ে বছরে প্রায় ৩৩০০০ টাকা। শুজার বন্দোবস্ত থেকে ৬৪ বছর পরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি গড়ে বছরে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। ফলত টোডর মলের রাজস্ব বন্দোবস্ত থেকে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের মধ্যে কোনো বড় মাপের পরিবর্তন ঘটেনি। এই বৃদ্ধির জন্য তিনটি প্রধান নীতি গ্রহণ করেছিলেন।[২৯] প্রথমত, তিনি 'হস্তাবুদ'[৩০] ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন; দ্বিতীয়ত, নির্মম নিষ্পেষণের নীতি নিয়েছিলেন; এবং তৃতীয়ত, রাজস্ব আদায়ের খরচ কমানো অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

মুর্শিদকুলী খানের রাজত্বকালে রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করলে বোঝা যায় তিনি জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন কি-না। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলী খান দেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করলেন তখন রাষ্ট্রের বাৎসরিক নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ১,১৭,২৮,৫৪১ টাকা। তারপর থেকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নির্ধারণের পরিবর্তন হার নিম্নে দেখানো হলো:[৩১]

সাল	বাৎসরিক রাজস্ব (টাকায়)	বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ	বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৭০০	১,১৭,২৮,৫৪১		
১৭০১	১,২০,৪৯,৯৮৯	৩,২১,৪৪৮	২.৭২
১৭০২	১,২৪,৭৯,২৫১	৪,২৯,২৬২	৩.৫৬
১৭০৩	১,২৫,৪১,০৮১	৬১,৭৬৭	০.৪৯

[২৭] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, op.cit., pp.224-225.

[২৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (অর্থনৈতিক ইতিহাস) ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৭।

[২৯] রঞ্জিত সেন, *বাংলাদেশের রাজস্ব শাসন : ১৮ শতক*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

[৩০] হস্তাবুদ শব্দটি ফারসি "হস্ত ও বুদ" থেকে উৎপত্তি যার অর্থ হলো: 'যা আছে এবং যা ছিল' মুর্শিদকুলী খান প্রত্যেকটি জেলার জমিদারদের জমি জরিপ করিয়ে সেই জমিতে কত ফসল উৎপন্ন হয়, সেই ফসলভিত্তিক খাজনা কি হতে পারে, সেই খাজনা আদায়ের জন্য সরকারের কত অর্থ ব্যয়িত হতে পারে, প্রকৃত আদায় থেকে আদায়ের খরচ ও জমিদারদের মুনাফা বাদ দিয়ে কি পরিমাণ রাজস্ব সরকারের তহবিলে জমা পড়তে পারে তা স্থির করলেন। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের ভিত্তিতে দেশের রাজস্ব নির্ধারিত হতো।

[৩১] রঞ্জিত সেন, *বাংলাদেশের রাজস্ব শাসন: ১৮ শতক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

১৭০৪	১,২৬,৫৫,৫৬৯	১,১৪,৫৫১	০.৯১
১৭০৫	১,২৬,৬৯,০৬৯	১৩,৫০০	০.১০
১৭০৬	-		
১৭০৭	১,২৬,৭৬,৬৪৭		
১৭০৮	১,২৬,৭৬,৮৫৩	০,০০,২০৬	০.০০১
১৭০৯	১,২৬,৭৯,৫৭১		
১৭১০	১,২৬,৭৮,৭২৪	০,০০,৮৪৭	০.০০৬
১৭১১	১,৩৪,০০,১৭৫	৮,২১,৪৫১	৬.৪৭
১৭১২	১,৩৪,২৬,৯৩৮	২৬,৭৬৩	০.১৯
১৭১৩	১,৩৫,৭০,০৮৭	১,৪৩,১৪৯	১.০৬৬
১৭১৪	১,৩৫,৭১,৫১৭	১,৪৩০	০.০১০
১৭১৫	১,৩৮,৭৯,৫৪৮	৩,০৮,০৩১	২.২৬
১৭১৬	১,৩৯,৩৯,৪০১	৫৯,৮৫৩	০.৪২
১৭১৭	১,৪০,২৭,৭৯৫	৮৮,৩৯৪	০.৬৩
১৭১৮	১,৪০,৪৭,৮৬৯	২০,০৭৪	০.০৯
১৭১৯	১,৪০,৬৭,৩৫৩	১৯,৪৮৪	০.০৭
১৭২০	১,৪১,২৮০২৬	৬০,৬৭৩	০.২৩
১৭২১	১,৪১,৫৫,৮৯৪	২৭,৮৬৮	০.১৪
১৭২২	১,৪১,৮৬,২৯৪	৩০,৪০০	০.১৫
১৭২৩	১,৪২,১৮,৪৯৫	৩২,২০১	০.১৩
১৭২৪	১,৪২,৫৪,৩৮১	৩৫,৮৮৬	০.০৯
১৭২৫	১,৪২,৬০,২৭৩	৫,৮৯২	০.০৩
১৭২৬	১,৪২,৭০,৪৩৯	১০,১৬৬	০.০৬
১৭২৭	১,৪২,০০,৫৭১	১৭,৭৪৭	০.০৪

উৎস: Governor General in Council, Revenue Proceedings, vol.17, 1875.

টোডর মল বন্দোবস্ত থেকে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তোডর মল বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, শাহ সুজার বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। তোডর মল বন্দোবস্ত থেকে শাহ সুজার বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৫% এবং মুর্শিদকুলী খানের সময়ে আরও বৃদ্ধি পায় ১৪.৫০%।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশলসমূহ:[৩২]

১. সমস্ত প্রশাসনের ব্যয়ভার তিনি কমিয়ে ফেলেছিলেন। সমস্ত বিলাস ও বৈভব তাঁর আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে রাজস্বের সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল।

২. তাঁর আমলে বড়মাপের যুদ্ধবিগ্রহ বা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় হয়নি। ফলে রাষ্ট্রের রাজস্বের অপচয় ঘটেনি। তিনি সৈন্যবাহিনীর আয়তন কমিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক বাজেট হ্রাস করেছিলেন। এতে নূতন করে রাষ্ট্রের তহবিল অর্থ সঞ্চয় হয়েছিল।

৩. মুর্শিদকুলী খান নির্মম নিষ্পেষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারদের কাছ থেকে তিনি যা ন্যায্য তাই আদায় করতেন, কিন্তু যা আদায় করতেন তা নির্মম নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে। রাজস্ব অনাদায়ে জমিতারদের ওপর নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালাতেন এবং তাদের ধর্মের

[৩২] Atul Chandra Roy, *History of Bengal: Mughal Period (1526-1765)* (Dhaka: Nababharat publishers, 1968), p. 65.

উপরেও হস্তক্ষেপ করতেন।

৪. মুর্শিদকুলী খান এক অভিনব রাজস্ববৃদ্ধির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো আবওয়াব। সময় সময় প্রয়োজন হলে নাজিম সুবাদার হিসেবে তিনি জমিদারদের ওপর কিছু অতিরিক্ত কর আরোপ করতেন। তাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করতেন। পূর্বে বড় বড় জমিদারদের দেয় নজরানা দিল্লির সম্রাট গ্রহণ করতেন। মুর্শিদকুলীর সময় থেকে সেই সব নজরানা কেন্দ্রের হাতে না গিয়ে প্রাদেশিক তহবিলে জমা পড়ত।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের মধ্যে মাল জামিনি ব্যবস্থা ছিল অন্যতম। ফার্সি ভাষায় মাল শব্দের অর্থ ভূমি রাজস্ব, জামিন অর্থ জামিন দেওয়া বা জামিন রাখা। মাল জামিন কথার অর্থ হলো অঙ্গীকার (security), জামিন। কাজেই মুর্শিদকুলী খান পুরাতন জমিদারদের খাজনা প্রদানের অনিয়ম ও অক্ষমতা এবং রাজকীয় সম্পত্তি বা খাজনার স্বল্পতাজনিত সমস্যা দূর করে রাজস্ব প্রথা প্রবর্তনে মনোনিবেশ করেন। মুর্শিদকুলী খান জমির ক্ষমতা নিরূপণের জন্য জমিদারদের নিকট উপযুক্ত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইজারাদারগণ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতেন, এজন্য তাদিগকে পূর্বেই জামিন স্বরূপ সে পরিমাণ টাকার চুক্তিপত্র সহি করে দিতো যা মাল জামিনি প্রথা নামে পরিচিত।[৩৩] তিনি আমিন নামে এক ধরনের ঠিকাদার নিয়োগ করলেন। তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করল, রাষ্ট্রকে বন্ড বা অঙ্গীকারপত্র দিল এবং কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনাকে রাজস্বরূপে সরকারের ঘরে প্রেরণের দায়িত্ব নিল। রাজস্ব আদায়ের পূর্বেই নির্দিষ্ট রাজস্বকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের তহবিলে প্রদানের প্রতিশ্রুতি কিন্তু সাধারণ চুক্তি নয়। সে চুক্তি প্রতিবছর জমিদারদের সঙ্গে রাষ্ট্রের হয়ে থাকে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের প্রথম দিনকে পুণ্যাহ বা পবিত্র দিন ধরে জমিদাররা তাদের সম্বৎসরের দেয় রাজস্বের প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান অগ্রগামী হয়ে প্রতিশ্রুত রাজস্বের অনাদায়জনিত ক্ষতিকে রোধ করার জন্য আগে থেকেই রাজস্বের জন্য জিম্মাদারের ব্যবস্থা করলেন – ক্ষতিগ্রস্ত রাজস্বের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তজ্জনিত অশ্চিয়তাকে এড়ানোর জন্য তিনি অর্থ বা অর্থবান ব্যক্তিকে রাজস্বের জামিন করে রাখলেন।[৩৪] অতএব রাষ্ট্রের ভূমি রাজস্বের অনাদায়ের ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আর রইল না।

রাজস্ব আদায়ের সঠিক হিসাব রাখার জন্য মুর্শিদকুলী খান উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের ব্যাপারে দুটি স্বাধীন পদ্ধতি রক্ষা করা হতো। গ্রাম পাটোয়ারীরা একদফা হিসাব এবং বিতিকসি আর এক দফা হিসাব রক্ষা করতেন। পাটোয়ারীরা তাদের হিসাব জেলা কানুনগোর নিকট দাখিল করতেন এবং তিনি এটা সংক্ষিপ্তাকারে প্রাদেশিক কানুনগোর নিকট পেশ করতেন। বিতিকসি তাদের হিসাব জেলা কালেক্টর ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যুগপৎভাবে দাখিল কতেন। অতঃপর প্রাদেশিক দিওয়ান ও প্রাদেশিক কানুনগো উভয়েই বিশদভাবে হিসাব মিলিয়ে তাদের যৌথ সই প্রদান করতেন।[৩৫] 'পুণ্যাহ'[৩৬] প্রথা মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বছরের নির্ধারিত দিনে (১ বৈশাখ) জমিদাররা, ইজারাদাররা তাদের নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতো। এটা ছিল সালতামামি উৎসব, যখন রাজস্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণ করা হতো এবং

---

[৩৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ২৪০।

[৩৪] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[৩৫] E. Thomas, *Revenue Resources of the Mughal Empire in India, op.cit.*, p.112.

[৩৬] মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ উৎসব প্রবর্তন করেন। (W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*,Vol. 1X (London: Trubner & Co., 1876, p.133. পুণ্যাহ মূলত হিন্দু আমলের রাজস্ব বিভাগীয় উৎসব। এটা হিন্দু আমল থেকে মুসলমাল আমলে এবং বৃটিশ আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা একটা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য বলেই মনে হয়, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের আগে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজ আমলে জমিদারেরা পুণ্যাহ উৎসব পালন করতো। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস (অর্থনৈতিক ইতিহাস) ১৭০৪-১৯৭১, ২য় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ.১৬৬।

স্থিতিপত্র তৈরি করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে ফসলহানি হলে রেয়াত দেওয়ার প্রশ্নে ঐ দিনই বিবেচনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসা করা হতো।[৩৭] মুর্শিদকুলী খানের বা তাঁর পূর্বের বন্দোবস্তে প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, নির্ধারিত রাজস্ব কোনো সময়ই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হতো না। মুর্শিদকুলী খান যা করলেন তিনি প্রতিশ্রুত রাজস্বের অনাদায়জনিত ক্ষতিকে রোধ করার জন্য আগে থেকেই রাজস্বের জন্য জিম্মাদারের ব্যবস্থা করলেন – ক্ষতিগ্রস্ত রাজস্বের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তজ্জনিত অনিশ্চয়তাকে এড়ানোর জন্য তিনি অর্থ বা অর্থবান ব্যক্তিকে রাজস্বের জামিন রাখতেন। অতএব, রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্বের অনাদায়ের ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আর রইল না। রাজস্ব যদি নিশ্চিত হয় তবে শোষণের আয়োজনটিও পরিশীলিত হয়। মুর্শিদকুলী খান দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে রেখে দেশের আর্থিক সম্পদকে বিনাশের হাত থেকে বাচাঁলেন এবং প্রগতিশীল খাজনার ধারণাকে চালু রেখে রাজস্বের স্থিতিকরণের কাজটি প্রশস্ত করলেন।[৩৮] রাজস্বের হারও ছিল মধ্যম (Moderate), উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশের বেশি নয়। কৃষকদের বীজ সংগ্রহের জন্য একটি তকবি লোন দান, অনতিরিক্ত রাজস্বহার নির্ধারণ, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা অবলম্বন এবং সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত প্রদান ইত্যাদি দারণা দেয় যে, মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার নীতি দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। প্রথমত যতো বেশি সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত রায়তদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করা। মুঘল আমলে মুর্শিদকুলী খানের পরে আর কোনো বন্দোবস্ত হয়নি।[৩৯] কিন্তু পরবর্তীতে সুবাদারেরা আবওয়াব প্রবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করে।

মুর্শিদকুলী খানের আদায় পদ্ধতি খুব সহজ ছিল। জমিদার ও তালুকদারগণ তাদের নির্ধারিত রাজস্ব ১২ কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারতেন। সীমান্তে কিছু সংখ্যক জমিদারি ব্যতিরেখে সমস্ত জমি বিঘা প্রতি পরিমাপ করা হয়। জমির অতীত ও বর্তমানে উৎপন্ন ফসল বিবেচনাপূর্বক গড়পড়তাভাবে হিসাব করা হতো। গড়পড়তা উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ সরকারি রাজস্ব নির্ধারিত হতো। কানুনগোর দফতরের কাগজপত্রের কয়েক বছরের ফসলের মূল্য পাওয়া যেতো। গড়পড়তামূল্যের ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশ গড়পড়তা উৎপন্ন ফসল নগদ অর্থে রাজস্ব নিরূপিত হতো। এভাবে বিঘা প্রতি ভূমি রাজস্ব আট আনায় ধার্য করা হতো।[৪০] বিভিন্ন এলাকায় উৎপন্ন ফসল ও মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে তারতম্য ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ হার আট আনারও কম, আবার অন্যত্র বার আনাও ছিল। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় নগদ অর্থের হার বিভিন্ন থাকলেও তা সর্বত্র উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ ছিল।[৪১] তৈমুর তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন। বাবর এই প্রচলিত ভূমিরাজস্ব শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করেন।[৪২] শের শাহ এবং আকবরের সময়ে রাজস্ব হার ছিল উৎপাদিত শস্যের বা উৎপাদন ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ। মুর্শিদকুলী খান অধিক সংখ্যক সরকারের পরিবর্তে কম সংখ্যক চাকলা গঠন করে একটি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তিনি সমগ্র বাংলাকে ৩৪টি সরকারের পরিবর্তে ১৩ টি চাকলা ও ১৬৬০ টি পরগনায় বিভক্ত করেন।[৪৩]

---

[৩৭] Tapan Ray Chaudhuri & Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, Vol.1 (Cambridge: Cambridge University press, 1982), p. 27.

[৩৮] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, op.cit., p.77.

[৩৯] Atul Chandra Roy, *History of Bengal-Mughal Period (1526-1765),* op.cit., p .67.

[৪০] Ramesh Dutt, *The Economic History: Under Early British Rule*, 6th edition (London: Trubner & Co., Ltd.,1902), p.17.

[৪১] Tapan Ray Chaudhuri & Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, Vol.1, *op.cit.*, p. 29.

[৪২] এ কে এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮।

[৪৩] চাকলাগুলি হচ্ছেঃ ১. হুগলী, ২. হিজলী, ৩. মুর্শিদাবাদ, ৪. বন্দর বালেশ্বর, ৫. সাতগাঁও, ৬. ভূষণা, ৭. যশোহর, ৮. আকবরনগর, ৯. ঘোড়াঘাট, ১০. কুরিবারি, ১১. জাহাঙ্গীরনগর, ১২. সিলেট, এবং ১৩.

ফলাফল

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার বাংলার ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাজস্ব নীতির ফলেই বাংলার প্রজারা দ্বৈত শাসনের হাত থেকে রক্ষা পায়। একদিকে অস্থায়ী সুবাদার বা শাসনকর্তারা বাংলা থেকে অন্যত্র বদলি হবার পূর্বে অসাধু উপায়ে টাকা কড়ি সংগ্রহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে রাজানুগত দিওয়ান কড়ায়-গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করার জন্য সচেষ্ট হতেন। ফলে প্রজারা দ্বৈত শাসনের শিকার হতো। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান একহাতে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করায় জনগণ শোষণমুক্ত হয়।[৪৪] ফলে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলী খান শুধু খেলাফি জমিদারদের শাস্তি দিতেন। তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কারণে রায়তরা বিনা বাধায় ফসল উৎপাদনের সক্ষম হয় এবং তাদের করদানে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তোডর মলের বন্দোবস্ত থেকে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।[৪৫] তোডর মলের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, শাহ সুজার বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। তোডর মলের ৭৬ বছর পরে শাহ সুজার বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৫% এবং শাহ সুজার ৬৪ বছর পরে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব আরও ১৪.৫০% বৃদ্ধি পায় ।

ইজারাদার বা ঠিকাদার নিয়োগের বেলায় মুর্শিদকুলী খান র্সবদা হিন্দুদের প্রাধান্য দিতেন। কারণ পূর্বে অধিকাংশ মুসলমান রাজস্ব আদায়কারী টাকা আত্মসাৎ করত এবং এবং এ টাকা তাদের নিকট থেকে আদায় করাও সম্ভব হতো না। ফলে মুর্শিদকুলী খান বাঙালি হিন্দুদেরকে রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করেন, কারণ তাদের নিকট থেকে পাওনা আদায় করা সহজ ছিল। হিন্দুদের দক্ষতার উপরও মুর্শিদকুলী খানের যথেষ্ট আস্থা ছিল। রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অভিজ্ঞতা ছিল বেশি। এজন্য রাষ্ট্রের দুটো প্রধান পদে তিনি দুজন হিন্দুদের নিয়োগ দেন।[৪৬] তিনি কিশোর রায় নামক একজন হিন্দু ব্রাহ্মণকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব এবং ভূপতি রায় নামক অন্য একজন ব্রাহ্মণকে রাজ কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরাও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের বহুমুখী সুফল যেমন ছিল, তেমনি কুফলও কম ছিল না। এ নীতির ফলে অনেক পুরাতন জমিদার, বিশেষত মুসলমান জমিদার ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে ইজারাদার সৃষ্টি করে তিনি নতুন এক ধরনের জমিদার শ্রেণীর প্রবর্তন করেন। হিন্দুদের মধ্য থেকেই বেশিরভাগ ইজারাদার গ্রহণ করা হতো এবং তারাই কালক্রমে জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হন। মুর্শিদকুলী খানের পূর্বে সুবাদারগণ দিল্লি হতে নিযুক্ত হয়ে আসতেন এবং নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষে তাঁরা স্বস্থানে ফিরে যেতেন। মুর্শিদুলী খান রাজস্ব সর্বাধিকরণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম নীতি ও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্মম শোষণের দ্বারা কৃষকরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল। ঠিকাদারদের অমানবিক চাপে তারা ছিল নিষ্পেষিত সমস্ত কিছুর চূড়ায় বসে নবাব যে চাপ দিতেন তা নীচের সব স্তরগুলির ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষকের কাঁধে এসে পড়ত। নির্মম কৃষক শোষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেই মুর্শিদাবাদ ও দিল্লির জৌলসকে বাড়ানো হয়েছিল ঐশ্বর্য আর রত্নমাণিক্য। রাজ ঐশ্বর্যের

ইসলামাবাদ। প্রতি চাকলায় একজন করে আমীল নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত এলাকায় রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি দায়ী থাকতেন। মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব প্রদানের উপযোগী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। P.Sharan, *The Provincial Government of the Mughals 1526-1658* (Allahabad, 1951), p.56.)

[৪৪] Tapan Ray Chaudhuri & Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, vol.1 (Cambridge: Cambridge University press, 1982), p. 27.

[৪৫] Tapan Ray Chaudhuri & Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, vol.1, op.cit., p. 33.

[৪৬] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.. ২৮১।

এই সঞ্চয় বৃদ্ধি যতই ঘটেছে ততই সাধারণ মানুষ পশুর মতো মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিপুল পরিমাণ রাজস্বরূপে দিল্লিতে প্রেরণ করা হতো।[৪৭] এই রাজস্ব যেত কিছুটা স্বর্ণ এবং প্রায় সমস্তটাই রৌপ্য মুদ্রায়। ক্রয় ক্ষমতার অভাবে দ্রব্যমূল্য ছিল অনড় ও নিম্নমুখী। দেশে কৃষি বেড়েছিল, বাণিজ্য বেড়েছিল অথচ দেশের সম্পদ ছিল ক্রমশঃ অপমূয়মাণ।

কিন্তু নবাবি আমলে বংশানুক্রমিক ধারায় সুবাদাররা বাংলার চিরস্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হন। অধিকন্তু এসব জমিদারদের দফতর পরিচালনার জন্য সরকার, আমিল, কানুনগো প্রভৃতি কর্মচারীর দরকার হতো। প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো থেকে আগত মুসলমানরা এ সব পদ পূরণ করতো। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তখন মুর্শিদকুলী খান বাঙ্গালি হিন্দুদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। এভাবে বাংলায় মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের মধ্য থেকে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হলো। এদের মধ্যে অনেকে কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে কিংবা নবাবের অনুগ্রহে জমিদারি লাভ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন,[৪৮] এবং অনেক সময় তারাঁ রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পেতেন। বর্ধিত ভূমি রাজস্ব বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনতে পরেনি। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। ফলে তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। একদিকে কর আদায়কারীদের অত্যাচারে তারা গুমরিয়ে মরছিল, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রাজকোষে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হচ্ছিল। সুবাদার বা শাসকগোষ্ঠীর সাথে প্রজা বা কৃষককুলের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তারা হৃদয়হীন আদায়কারীদের মর্জির উপরে নির্ভরশীল ছিল। এ আদায়কারীগণ কৃষকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে রাজস্ব আদায় করত। মুর্শিদকুলী খানের সদিচ্ছা থাকলেও সুদক্ষ কর্মচারীর অভাবে তারঁ ন্যায়-নীতির ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এটা তারঁ প্রশাসনিক দুর্বলতারই পরিচায়ক।

উপসংহার

রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদকুলী খানের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম এবং তাঁর মৌলিক প্রতিভার যথার্থ পরিচায়ক। তিনি রাজস্ব সংস্কারে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুর্শিদকুলী খানই সর্বপ্রথম বাংলার ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি একটি সুদৃঢ় কাঠামোর উপর সুংগঠিত করেন। মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শোষণের আয়োজনটি পরিশীলিত করেন। তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে থেকে দেশের আর্থিক সম্পদকে বিনাশের হাত থেকে বাচাঁলেন এবং প্রগতিশীল খাজনার ধারণাকে চালু রেখে রাজস্বের স্থিতিকরণের কাজটি প্রশস্ত করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে বাংলা থেকে নিয়মিত যে রাজস্ব আদায় হতো, তা দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অতি সংকটপূর্ণ সময়ে মুঘল বাহিনী তথা রাজপরিবারকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে বাংলার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বাংলার আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিস এ পদ্ধতিকে তারঁ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অতএব যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানসম্মত ও উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

---

[৪৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২০ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

[৪৮] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, op.cit., pp. 90-93.

বাচনিক ইতিহাস: প্রত্যয়, প্রকৃতি ও প্রয়োগ

মোঃ মাহমুদ আলম*

Abstract: 'Oral history' is a comparatively new field as a method of historical study. During the period of adoption 'oral history' was considered as an imprecise term. But with the passage of time, the idea has changed much this and it has become a generic term. Oral history is a field of study and a method of collecting, preserving and interpreting the voices and memories of people, communities, and participants about past events. The concrete evidence of history is depicted by the lived experience of the ordinary people who are avoided and excluded from historical inquiry and process. It transmits past knowledge from one generation to another for interpreting and actualizing of the past events by highlighting individual participation, observation and understanding. In this paper, an attempt has been made in defining clearly the term 'oral history' in present time along with its characteristic and application in historical research.

ভূমিকা

ইতিহাস গবেষণায় তুলনামূলক নতুন একটি ধারা হলো বাচনিক ইতিহাস যা ইংরেজিতে Oral History নামে সমধিক পরিচিত। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে মৌখিক প্রথার উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা শুরু হয়। তারপর এর বিকাশ পর্যায়ে নানান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো বাচনিক ইতিহাস। তবে একইসঙ্গে এ পদ্ধতির মাধ্যমে রচিত ইতিহাসও বাচনিক ইতিহাস নামে অভিহিত করা হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অ্যালান নেভিন্সের হাত ধরে এটি ইতিহাস গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে এবং ইতিহাস অধ্যয়নের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে বর্তমানে লিখিত উপাদানের একক প্রাধান্য নেই। লিখিত উপাদানকে অন্যান্য উৎসের মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যাতে আরো নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচিত হতে পারে। নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং জনইতিহাস রূপায়ণে এ পদ্ধতি কেন্দ্রীয় স্থান লাভ করে থাকে, যার মাধ্যমে অতীত সত্যিকার অর্থে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাচনিক ইতিহাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কাজ এ ক্ষেত্রে যথাযথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, হোক তা একক, দলভিত্তিক কিংবা কমিউনিটিভিত্তিক। এ প্রবন্ধে বাচনিক ইতিহাসের উৎস, প্রাথমিক পর্যায়ে এর বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* ড. মোঃ মাহমুদ আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

বাচনিক ইতিহাস বা Oral History পরিভাষাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন সেটি নিয়ে গবেষক এবং বাচনিক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন যে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালান নেভিন্স ১৯৪৮ সালে 'ওরাল হিস্টি' পরিভাষাটি উদ্ভাবন করেন। তবে চার্লস টি. মরিসি ১৯৮০ সালে এক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, উইন্সলো সি. ওয়াটসন ১৮৬৩ সালে এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।[১] আরেকজন ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের পূর্বে কেউ কেউ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তখন এর সাথে যথাযথ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াটি সম্পৃক্ত ছিল না।[২] কিন্তু হার্ভার্ড পড়ুয়া গ্রিনিচ গ্রামের জোসেপ গুল্ড নামের এক বোহেমিয়ান ম্যানহাটনের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পথচারীদের টুকরো টুকরো কথা রেকর্ড করেছিলেন। আর তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'আমাদের সময়ের মৌখিক ইতিহাস' 'An Oral History of Our Time'.[৩] জো গুল্ড যে প্রায়োগিক অর্থে বাচনিক ইতিহাস প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তা চার্লস টি. মরিসিসহ অনেক গবেষকই স্বীকার করেন।[৪] আর জো গুল্ড এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ধারণা থেকে অ্যালান নেভিন্স কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাচনিক ইতিহাসের প্রথম সফল প্রকল্প শুরু করেছিলেন যার প্রমাণ মেলে লুইস এম. স্টার এর বক্তব্যে, "তিনি যখন এ প্রকল্পের কাজে নিবিষ্টভাবে অগ্রসরমাণ ছিল তখন কোনো এক সকালে নেভিন্সের তরুণ সহকারী ডিন আলবার্টসন (Dean Albertson) তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এর নাম কী। তখন ক্যাম্পাস পদক্ষেপ করতে করতে নেভিন্স চিন্তা করছিলেন এবং উত্তরে বলেছিলেন 'ওরাল হিস্ট্রি।' এটি অনেককে বিভ্রান্ত করেছে কিন্তু আমরা এটিকে সফল প্রমাণ করতে পারি। আর এরপর থেকে এটি জাতিবাচক পদে পরিণত হলো।"[৫]

নেভিন্সের পক্ষে আরো প্রমাণ দিয়ে ওয়ালটারস জুনিয়র বলেন, Oral History নামকরণ হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৮ মে যখন নেভিন্স এবং আলবার্টসন কলম্বিয়া প্রকল্পের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন।[৬] তবে এ সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হলো টি. মরিসিকে লেখা ডিন

---

[১] Charles T. Morrissey, "Why Call It "Oral History"? Searching for Early Usage of a Generic Term," *The Oral History Review*, Journal of the Oral History Association, 1980, 8(1), pp. 21, 40-42; doi10.1093ohr8.1.20, accessed on 25th Feb. 2015.

[২] Donald A. Ritchie, *Doing Oral History: A Practical Guide*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 22.

[৩] Ibid., p. 22. জোসেপ গুল্ডের আরেক নাম ছিল প্রফেসর সিগাল। তাঁর সম্পর্কে Joseph L. Mitchell "Professor Seagull," *New Yorker*, December 12, 1942; Ges *Joe Gould's Secret* (New York: Viking Press, 1965) নামক গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছেন; David K. Dunaway and Willa K. Baum eds, 2nd edition, *Oral History: An Interdisciplinary Anthology* (Walnut Creek: AltaMira Press, 1996), p. 43.

[৪] Charles T. Morrissey, op. cit., p. 24.

[৫] Louis M. Starr, "Oral History: A Term Becomes a Movement," *George C. Marshall Research Library Newsletter*, 8; 1 (Fall, 1969), p. 2, cited by Charles T. Morrissey, "Why Call It "Oral History"? Searching for Early Usage of a Generic Term," p. 23.

[৬] কলম্বিয়া প্রকল্পের জন্য নেভিন্স এবং তার সহকারী ডিন আলবার্টসন ১৮৪৮ সালের ১৮ মে তারিখে নিউ ইয়র্ক-এর ব্যাংক কর্মকর্তা ও নগরের একজন নেতা জর্জ ম্যাকানির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়ে আলবার্টসন নেভিন্সের নিকট থেকে জানতে চেয়েছিলেন তাদের এ কর্ম উদ্যোগকে কী নামে অভিহিত করা হবে। এর উত্তরে নেভিন্স বলেছিলেন 'ওরাল হিস্ট্রি'। উৎস: Raymond Walters, Jr., "The Last Word: Call It Oral History," New York Times Book Review, January 2, 1972, p. 23, cited by Charles T. Morrissey, "Why Call It "Oral History"? Searching for Early Usage of a Generic Term," p.

আলবার্টসনের চিঠি যেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে এ বিষয়ে নেভিন্সের সাথে তার আলাপ হয়েছিল।[৭]

তাই প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত যে, নেভিন্সের পূর্বে যারা Oral History পরিভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন তাদেরকে এর উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করা হয় না কেন। এমন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বেশ কঠিন, কেননা ঐতিহাসিকগণ এ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখা করার চেষ্টা করেছেন বলে তাদের লেখায় প্রতীয়মান হয়নি। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৩ সালের ২০ অক্টোবর উইন্সলো কসৌল ওয়াটসন 'ভারমন্ট হিস্টরিক্যাল সোসাইটি'র আমন্ত্রণে 'মন্টপেলিয়ার ভারমন্ট সিনেট হাউজে' রিচার্ড স্কিনারের জীবনের উপরে পঠিত এক ভাষণে Oral History প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন।[৮] এটিকে তিনি ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেননি বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন। কিন্তু তার অন্তর্জ্ঞান বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি সচেতনভাবে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসেবে এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছিলেন যা তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, "I have been amazed by observing in my own local researches, the ravages made by a single decade, among the fountains of – oral history in a community."[৯] এ বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় তার এরকম উদ্বেগের কারণ ছিল যে, তার এলাকার ইতিহাস রচনায় সে সময়ে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না বা যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা ওয়াটসনের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক বা বাচনিক ইতিহাসবিদ এ বিষয়টি উল্লেখ করেননি বা কোনোভাবে এড়িয়ে গেছেন। একমাত্র টি. মরিসি এ বিষয়টিকে বিবেচনা করে তাকে বাচনিক ইতিহাস প্রত্যয়টির উদ্ভাবক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, জো গুল্ড এ প্রত্যয়টি সরাসরি ব্যবহার করেন। কিন্তু তার গৃহীত প্রচেষ্টা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। অর্থাৎ এ থেকে তিনি কোনো দালিলিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হননি, যদিও তার ধ্যানজ্ঞান ছিল বাচনিক ইতিহাস। আর সম্ভবত এ কারণে গবেষকগণ তাকে এ প্রত্যয়টির উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেননি। তাই আমরা যদি বাচনিক ইতিহাসকে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে টি. মরিসির সঙ্গে একমত পোষণ করে বলতে হবে উইন্সলো সি. ওয়াটসন Oral History বা বাচনিক ইতিহাস প্রত্যয়টি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু বর্তমানে বাচনিক ইতিহাস প্রত্যয়টি যে মাত্রায় ব্যবহৃত হয় এবং এর ক্ষেত্র যে

23.

[৭] চার্লস টি. মরিসিকে আলবার্টসন লিখেছিলেন: The name 'Oral History' was used by Nevins on that day that I first discussed the matter with him in his Fayerweather Hall Office at Columbia in February or March 1948. I thought then that it was a hockey name—sounded like a dentist or a porn flick. But, to my amazement, the name stuck, and we are stuck with it. Nevins was into the interviewing aspect completely—the actual name was in his mind and in mine in-consequential. Drm: Dean Albertson to Charles T. Morrissey, February 22, 1977, cited by Charles T. Morrissey, op. cit., p. 24.

[৮] নজরটান গবেষকের। Winslow Cossoul Watson, "The Life and Character of the Hon. Richard Skinner; A Discourse Read Before at the Request of the Vermont Historical Society at Montpelier, October 20, 1863" (Albany, N. Y.: J Munsell, 1863), included in Vermont Historical Society Proceedings, 2 (1863-1870), pp. 3-30, cited by Charles T. Morrissey, op. cit., p. 21.

[৯] Ibid, p. 4.

আকারে সম্প্রসারিত হয়েছে তা বিবেচনা করলে অ্যালান নেভিন্সকে যথার্থভাবে এ প্রত্যয়টির উদ্ভাবক ও যথাযথ ব্যবহারক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। নেভিন্স এটিকে শুধু গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেননি বরং এর ফল হিসেবে যে ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ বাচনিক ইতিহাস ছিল।

সংজ্ঞা

ওরাল হিস্ট্রি বা বাচনিক ইতিহাস কী? এর অর্থ কী? এটি দ্বারা কী ইঙ্গিত করা হয়? এসব নিয়ে শুরু থেকেই এক ধরনের অস্পষ্টতা ছিল। টি. মরিসির মতে, "আমি যেভাবে এটির প্রয়োগ করি ক্ষুদ্রার্থে তা এভাবে বলা যেতে পারে, বাচনিক ইতিহাস হলো ধারণকৃত সাক্ষাৎকার যা সচারাচর লিপ্যন্তর করা হয় এবং এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জি ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য মহাফেজখানায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।"[১০] ১৯৭১ সালে এর সংজ্ঞায় আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব ম্যানুসক্রিপ্ট কালেকশন্স' লিখেছিল, "বাচনিক ইতিহাস হলো মৌখিকভাবে সংগৃহীত এবং টেপের মাধ্যমে ধারণকৃত তথ্যাবলি যার সবকিছু সম্পাদিত হয় পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আর ক্যাটালগে সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই এর লিপ্যন্তর ঘটাতে হবে।"[১১] আরেকজন লিখেছেন, "মানুষের মুখ থেকে নির্গত বাণীই বাচনিক ইতিহাস। তবে এ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে তা লিপিবদ্ধ করে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।"[১২]

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুরুর দিকে বাচনিক ইতিহাস বলতে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অতীত ইতিহাসকে নির্দেশ করা হতো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এর লিপ্যন্তরকরণ। তাই এই ধারণাকে প্রথমে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। যেমন লুইস এম. স্টার মনে করেন,

> শুরুতেই বলতে হয় এটি নিজেই একটি বিরক্তিজনক পদ – সামাজিক নিরাপত্তার মতো এটি হলো শব্দের অপপ্রয়োগ। এর পরিণতিতে যা পাওয়া যায় তা বাচনিকও নয়, ইতিহাসও নয়; এটি হলো একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যজনের নিকট প্রদত্ত একটি বা ধারাবাহিকভাবে একাধিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথাবলির টাইপ করা প্রতিলিপি যা সাধারণত সম্পাদনা করা হয়, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো গোছানো এবং বিন্যস্ত করা হয়। আর এসবের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান লিখিত বিবরণের সঙ্গে নতুন কিছু মূল্যবোধ সংযুক্ত করা।[১৩]

উপরের মন্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, শুরু থেকে কয়েক দশক পর্যন্ত বাচনিক ইতিহাস নিয়ে গবেষক ও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি কাজ করেছিল। এর পিছনের কারণ ছিল এই যে, অতীত ইতিহাসের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও এতে ব্যবহৃত সাক্ষাৎকারের ধরন

---

[১০] Charles T. Morrissey, op. cit., p. 22.

[১১] *Information Circular No. 7*, issued by the Manuscripts Section, Descriptive Cataloging Division, Library of Congress, Washington D.C., May 1971.

[১২] Susan Emily Allen, "Resisting the Editorial Ego: Editing Oral History," *Oral History Review 10*, 1982, p. 35.

[১৩] Louis M. Starr, "Oral History: Problems and Prospects," *Advances in Librarianship*, Volume 2, Melvin J. Voigt ed. (New York: Seminar Press, 1971), p. 276.

নিয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না। আর এটি যে একইসঙ্গে গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণাফল তা উল্লিখিত হতো না। তাইতো জর্জ ইওয়ার্ট ইভান্স এ প্রত্যয়টিকে বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেছেন।[১৪] আবার লিন্ডা সোপও প্রায় একই রকম মন্তব্য করে বলেছেন, এটি হলো 'পাগলামিপূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ পরিভাষা'।[১৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অন্য একটি বিষয় কিছুটা সময় গবেষকগণের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা সৃষ্টি করেছিল। আর সেটি হলো মৌখিক সাক্ষ্য বা প্রমাণপঞ্জি সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা। প্রায় ৩০০০ হাজার পূর্ব থেকেই মৌখিক সাক্ষ্য বা প্রমাণপঞ্জির উপর ভিত্তি করে মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা এবং জীবন সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ইতিহাস, সাহিত্যসহ অন্যান্য মাধ্যমে অন্য মানুষের সামনে হাজির করতে শুরু করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, লৌকিক উপাখ্যান, গল্প এবং নাটক; এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে আসা পরিবার বা গোষ্ঠী ইতিহাস; বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণমূলক বর্ণনা। আর মৌখিক এসব সাক্ষ্য বা প্রতীতি এককভাবে কিংবা গ্রুপভিত্তিক সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর বৃহত্তর আঙ্গিকে এগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। সেগুলো হলো: ওরাল হিস্ট্রি, ওরাল ট্রাডিশন এবং লাইফ স্টোরিজ।[১৬] তাই মৌখিকভাবে বিবৃত সবগুলো মাধ্যমকে বাচনিক ইতিহাস (ওরাল হিস্ট্রি) হিসেবে গণ্য করলে ভুল হবে। কেননা এর প্রতিটির বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি, ধরন, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রায়োগিক পদ্ধতি আলাদা আলাদা। কিন্তু সাধারণভাবে এগুলোকে একত্রে প্রামাণিক মৌখিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যথাযথ তথ্যের অভাব ও গবেষকগণের সামনে এসব উৎস এবং তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও ব্যাখ্যার অভাবে বেশ কিছু সময়ে এ বিভ্রান্তি অব্যাহত থাকে। তবে সময়ের বিবর্তনে এরূপ ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার ফলে পূর্বেকার সংশয় অনেকটা দূরীভূত হয়। কিন্তু 'বাচনিক ইতিহাস' প্রত্যয়টি এতই গতিশীল এবং সৃজনশীল শৃঙ্খলা যে কোনো একক সংজ্ঞার মাধ্যমে এটিকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন।[১৭] সে কারণে নিম্নের কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করা যেতে পারে:

---

[১৪] এ বিষয়ে তার মন্তব্য ছিল এরকম: "... it implies a misleading analogy with already differentiated aspects of history—economic, agricultural, medical, legal, and so on. Whereas oral History can never be a 'compartment' of history in its own right, it is a technique that could conceivably be used in any branch of the discipline. The title also suggests, indeed invites, another hiving off when in fact it is clear to anyone who has taken oral evidence in the field over any length of time that compiling oral sources in an activity that points to the connectedness of all aspects of history and not to their divisions from each other." George Ewart Evans, *The Days That We Have Seen* (London: Faber and Faber, 2011), p. 24.

[১৫] "Oral History" is a maddeningly imprecise term: it is used to refer to formal, rehearsed accounts of the past presented by culturally sanctioned tradition-bearers; to informal conversations about "the old days" among family members, neighbors, or coworkers; to printed compilations of stories told about past times and present experiences; and to recorded interviews with individuals deemed to have an important story to tell. Linda Shopes, "What Is Oral History?" http://historymatters.gmu. edu/mse/oral/ oral.pdf., accessed on 11th March 2015.

[১৬] Hugo Slim and Paul Thompson, *Listening for a Change: Oral Testimony and Development* (London: Panos Publications, 1993), p. 11.

[১৭] Donald A. Ritchie, op. cit., p. 19.

হুগো স্লিম ও পল থমসন সরল সংজ্ঞায় বাচনিক ইতিহাসকে অতীতের জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন, প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু গল্প বা ঘটনা থাকে যা অন্যের কাছে বলা যায়। এসব ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে এই শতাব্দীর ইতিহাসের মূল্যবান কাঁচামাল। যেসব নর-নারী এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের নানান অভিজ্ঞতা লাভ করেন তারা অতিক্রান্ত সময়ের প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে পারেন। আর তাদের বর্ণিত গল্প ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। যদি এসব বর্ণনা সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে এসব জীবন্ত স্মৃতি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।[১৮]

আবার ডোনাল্ড এ. রিচির মতে,

বাচনিক ইতিহাস সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তির স্মৃতি, মন্তব্য ও ভাষ্য ধারণ করে। যথাযথ ও পরিকল্পিত উপায়ে প্রণীত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা এবং সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যকার আলাপচারিতা অডিও বা ভিডিও আকারে ধারণ করা হয়। ধারণকৃত সাক্ষাৎকার লিপ্যন্তরকরণ, সারাংশকরণ এবং বর্ণনাক্রমিক তালিকা প্রণয়নের পর সেটি গ্রন্থাগার বা মহাফেজখানায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সমস্ত সাক্ষাৎকার গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে অথবা ছাপানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা যেতে পারে; জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে; এগুলোর নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে বা অন্য কোনো উপায়ে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পারে। আবার ধারণকৃত এসব সাক্ষাৎসমূহ, এর লিপ্যন্তরিত রূপ, এ সম্বন্ধীয় কোনো কিছুর সুবিন্যস্ত তালিকা, আলোকচিত্র এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য দলিলাদি ইন্টারনেটে পোস্ট করা যেতে পারে। বাচনিক ইতিহাস এলামেলো বক্তব্য, যেমন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের আলাপচারিতা লুকিয়ে লুকিয়ে ধারণ করাকে অনুমোদন করে না। অন্যদিকে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা এবং সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়নি এমন পূর্বের ধারণকৃত বক্তব্য, টেলিফোনে আড়িপাতা বক্তব্য, টেপে ধারণকৃত ব্যক্তিগত বিবরণী অথবা অন্য কোনো শব্দগ্রহণ সাক্ষাৎকার হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।[১৯]

অস্ট্রেলিয়ার বাচনিক ইতিহাস সংস্থা The Oral History Association of Australia (বর্তমানে Oral History Australia) বাচনিক ইতিহাসকে দুটি অংশে বিভক্ত করে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে,

> অতীতের মৌখিক বিবরণী ধারণ, প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করার জন্য ইতিহাসে যে অনুশীলন বা গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাই হলো বাচনিক ইতিহাস। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সাক্ষাৎকারগ্রহীতার প্রস্তুতি ও আনুষঙ্গিক জ্ঞানের গুরুত্বকে সুপ্রত্যক্ষ করা হয়, অন্যদিকে সাক্ষাৎকারদাতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং আলোচ্য বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতাকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। আবার ঐতিহাসিকভাবে আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর আকারে সাক্ষাৎকারের বিষয়ে প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অক্ষুন্ন রেখে টেপ রেকর্ডারে ধারণ করার যে ব্যবস্থা করা হয় – তা ভবিষ্যতে অন্যান্য গবেষকের জন্য উপযুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা করার এ প্রক্রিয়াকেও বাচনিক ইতিহাস বলে।[২০]

---

[১৮] Hugo Slim and Paul Thompson, op. cit., p. 11.

[১৯] Donald A. Ritchie, op. cit., p. 19.

[২০] Beth M Robertson, *Oral History Handbook*, 3rd ed. (South Australian Branch: Oral History Association of Australia, 1996), p. 2. অনুবাদ গবেষকের।

তবে পল থমসন একটি ভিন্ন মাত্রার সংজ্ঞা দিয়েছেন,

বাচনিক ইতিহাস হলো ইতিহাস যা জনগণকে উপজীব্য করে রচিত হয়। এটি জনজীবনকে ইতিহাসের মধ্যে প্রোথিত করে দেয় এবং এর ক্ষেত্র প্রসারিত করে। এটি কেবল নেতাদের মধ্যকার বীরদেরকে নয় বরং অন্তরালে থেকে যাওয়া অগণিত জনতার মধ্যকার বীরগণের জন্য ইতিহাস নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে একসঙ্গে সহ-গবেষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি জনগোষ্ঠী নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং বাইরের ইতিহাসকে জনগোষ্ঠীর নিকট নিয়ে আসে। এটি কম সুবিধাভোগী বিশেষভাবে বয়স্কদেরকে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। এটি পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়, আর সেই কারণে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি এবং প্রজন্মের মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি ইতিহাসলেখক এবং অন্যান্যদের মধ্যে পাস্পারিক সংযোগের সুযোগ তৈরি করে যার ফলে অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্বের মধ্যদিয়ে কোনো কালিক এবং স্থানিক অর্জনকে তারা নিজেদের বলে গণ্য করতে উৎসাহবোধ করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি পরিপূর্ণ মানবজাতি তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আবার বাচনিক ইতিহাস, ইতিহাসে গৃহীত মিথ এবং কর্তৃত্বসূলভ দৃষ্টিতে গৃহীত অন্তঃস্থায়ী প্রথাকে সামাজিক অর্থে ইতিহাসের আমূল রূপান্তরের পন্থা হিসেবে কাজ করে।[২১]

বাচনিক ইতিহাস সংস্থা (Oral History Association) বাচনিক ইতিহাসের সংজ্ঞা হিসেবে যা গ্রহণ করেছে তা হলো:

> Oral history is a field of study and a method of gathering, preserving and interpreting the voices and memories of people, communities, and participants in past events. Oral history is both the oldest type of historical inquiry, predating the written word, and one of the most modern, initiated with tape recorders in the 1940s and now using 21st-century digital technologies.[২২]

আর মোঃ সেলিম লিখেছেন, দলিল দস্তাবেজ বা লিখিত উপাদানকে বিশেষ কাজে না লাগিয়ে কোনো বিশেষ ঘটনায় একজন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বহুজনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে ইতিহাস নির্মিত হয় তাকে আমরা Oral History বা মুখের কথায় ইতিহাস বা কথ্য ইতিহাস অভিহিত করতে পারি।[২৩]

তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাচনিক ইতিহাস একদিকে যেমন মৌখিক বিবরণ বা বিবৃতি ধারণ করা (টেপ, রেকর্ড ইত্যাদিতে) এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা বোঝায় তেমনি অন্যদিকে এই প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ফলাফলকে নির্দেশ করে। এটি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কর্তৃক বর্ণনাকারী বা সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যকার আলাপচারিতা অডিও অথবা ভিডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে শুরু হয় যেখানে দুজনই অতীত ঘটনা উদ্‌ঘাটন, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবনে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করে ইতিহাস রচনায় অবদান রাখেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৌখিক দলিল হিসেবে সৃষ্ট বাচনিক ইতিহাস

---

[২১] Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 23-24.

[২২] Oral History: Defined, http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history/, accessed on 10th March 2015.

[২৩] মোঃ সেলিম, "বাংলাদেশে ওরাল হিস্ট্রি চর্চা," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৭৯, পৃ. ৮৪।

বিভিন্ন রূপে ব্যবহারকারী, গবেষক এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জন্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে বাচনিক ইতিহাস ব্যবহার করার জন্য এতে সবিচার অনুধাবন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাচনিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যাবলি

বাচনিক ইতিহাসে অবহেলিত মানুষগুলোর জীবন্ত স্মৃতি এবং অনুভূতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যাতে অতীতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর অধিকতর সত্য অনুসন্ধান সম্ভব হয়। এতে যেকোনো উন্নয়ন ভাবনায় সমাজের বাদপড়া মানুষগুলোকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়, যাতে তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃহত্তর পরিসরে অনুধাবন করে তা কাজে লাগানো যায়। বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোতে যারা কথা বলার সুযোগ পান না বাচনিক ইতিহাস পদ্ধতি তাদেরকে কথা বলার সুযোগদানের মাধ্যমে ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।[২৪] এ প্রক্রিয়ায় কেবল তাদের বক্তব্যকে নেওয়া হয় না, বরঞ্চ তাদের জীবনের নানামাত্রিক অভিজ্ঞতা তারা বিনিময় করতে পারেন। এভাবে বাচনিক ইতিহাস কোনো বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন ধারা যুক্ত করতে ভূমিকা রাখে।

লিখিত দলিল এবং দাপ্তরিক নথিতে সবসময় রাজনৈতিকভাবে অভিজাতগণকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় আর রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের বাইরের মানুষগুলো এতে কোনো স্থান দখল করতে পারেন না। শ্রমিকদের তুলনায় জমিদার বা ভূমি মালিকরা এতে গুরুত্বলাভ করেন। নারীর তুলনায় পুরুষরা এতে অন্তর্ভুক্ত হন। নিরক্ষরদের তুলনায় শিক্ষিতরা এতে গুরুত্ব লাভ করেন এবং জনজীবনের ব্যক্তিগত স্তরের চিত্র প্রাধান্য না পেয়ে বরং সাধারণ চিত্র গুরুত্ব পায়।[২৫] এর ফলে তারা যে কেবল ইতিহাস রচনায় ভূমিকা রাখেন তা নয় বরং ঐতিহাসিক জ্ঞান সৃষ্টিতে তারা কার্যকর অবদান রাখার সুযোগ লাভ করেন।[২৬]

বাচনিক ইতিহাস মানুষকে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইস্যুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে। বিভিন্ন কর্মের ব্যাপৃতি (যেমন সামাজিক জীবন, কর্মজীবন) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে এবং কর্মজীবন ও অভ্যাস কীভাবে পারিবারিক জীবনপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট চিত্র উন্মোচন এবং এ দুইয়ের মাঝে একটি কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।[২৭]

বাচনিক ইতিহাস নতুন এবং পুরানো প্রজন্মের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ তৈরি করে দেয়। জীবিত ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং নির্দিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে তাদের মূল্যায়ন নতুন প্রজন্মের সদস্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ভাগাভাগি করতে পারেন। তবে অশিক্ষিত বা নিরক্ষর সমাজে এই কাজটি করেন একজন পেশাদার গল্প-কথক (ঐতিহাসিক)।[২৮]

---

[২৪] Sean Field, *Oral History Methodology*, SEPHIS Workshops in Vietnam and Philippines, Historical Studies Department, University of Cape Town, South Africa, 2007, http://iohanet.org/wp-content , accessed on 17th March 2015.

[২৫] Hugo Slim and Paul Thompson, op. cit. p. 14.

[২৬] John Tosh, *The Pursuit of History: Aims, methods and new directions in the study of modern history*, Revised Third Edition (London: Pearson Education Limited, 2002), p. 302.

[২৭] Hugo Slim and Paul Thompson, op. cit., p. 14.

[২৮] A F Salahuddin Ahmed, *A Handbook of Oral History: Abstracts of Interviews Taken*

ইতিহাস গবেষণায় প্রেক্ষাপট নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো স্থানে বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ঘটনার গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে কী, কেন, কোথায়, কীভাবে প্রভৃতি। আর ইতিহাসবেত্তাগণ আবশ্যিকভাবে কোনো ঘটনা কেন ঘটে এবং কীভাবে ঘটে এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেন। আর তাদের অন্তর্নিহিত অনুভবের এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদনে বাচনিক ইতিহাস সহায়তা করে থাকে।[২৯]

বিশ শতক পর্যন্ত ইতিহাসের প্রধান ফোকাস ছিল রাজনীতি যা মূলত ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো। এসব ইতিহাসে বিপ্লবের মত ব্যতিক্রম ঘটনা ব্যতীত সাধারণ মানুষের জীবন, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি গুরুত্ব পেতো না। ঐতিহাসিক সময় মূলত ব্যক্তির শাসনকাল এবং গোষ্ঠীশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এমনকি স্থানীয় ইতিহাসে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত না হয়ে স্থানীয় প্রশাসন গুরুত্ব পেতো। আর এর আংশিক কারণ ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ প্রধানত শাসকশ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন।[৩০] তাই ইতিহাস নির্মাণের প্রচলিত ধারায় সাধারণ মানুষের স্থান কম ছিল। কিন্তু অবহেলিত মানুষের জীবন ও কর্মপন্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে শক্তিশালী ইতিহাস রচনা কেবল বাচনিক ইতিহাস পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব হয়।

বাচনিক ইতিহাসে যেকোন ঘটনা বা কোনো অনুঘটকের রূপান্তর প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ চিত্র প্রতিফলিত হয়। কেননা, নিম্নশ্রেণির, সুবিধাবঞ্চিত এবং পরাজিত মানুষের দল একক বা সমাগ্রিকভাবে ইতিহাস নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। এর ফলে বাস্তবচিত্র সম্বলিত এবং পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। আর এটি করতে গিয়ে ইতিহাস নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে বাচনিক ইতিহাস বিস্তৃত পরিসরে ভূমিকা রাখে।[৩১]

বাচনিক ইতিহাসের ক্ষেত্র

বাচনিক ইতিহাস পদ্ধতির মাধ্যমে জীবন যাপনের প্রতিদিনের নানান দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন, প্রতিদিনের কাজের চিত্র, সময়প্রণালী ও এর খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক যা সচারাচর রেকর্ড করা হয় না, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রেক্ষাপট যেগুলোতে সাধারণ মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় না এবং লিখিত দলিলে যা পাওয়া যায় না।[৩২]

বাচনিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে পল থমসন বলেন, "বাচনিক ইতিহাস প্রকল্প কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত, হোক তা শিক্ষার্থীদের একক বা গ্রুপভিত্তিক উদ্যোগে। এটি স্কুল, কলেজ, বা বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা কিংবা কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে পরিচালিত হতে পারে। এটি যেকোন স্থানে পরিচালিত হতে পারে। দেশের যেকোনো স্থানেই হোক না কেন সবখানেই অনেক বিষয় আছে যা স্থানীয়ভাবে গবেষণা করা যেতে পারে। স্থানীয় শিল্প-কারখানার ইতিহাস, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ, সংস্কৃতি এবং উপভাষা বিষয়ক নানান বিষয়, কর্মস্থানে

---

by the Oral History Project (Dhaka: Bangladesh National Museum, 1992), p. v.

[২৯] Ibid., p. vi.

[৩০] Paul Thompson, op. cit., pp. 3-4.

[৩১] Ibid., p. 7.

[৩২] Judy Larmour, "How to Do Oral History," *Heritage Note No. 11: Planning for Heritage Resources Research and Documentation* (Edmonton: Alberta Community Development and the Alberta Historical Resources Foundation, 1994), p. 2.

কিংবা পরিবারে নারী-পুরুষের পরিবর্তিত ভূমিকা পালন, পরিবার ও সমাজে যুদ্ধ এবং অস্থিরতার প্রভাব প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে বাচনিক ইতিহাস প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে ভালোভাবে কাজ সম্পাদন সম্ভব হতে পারে। সমসাময়িক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হচ্ছে এমন বিষয়ে এই প্রকল্প যদি ঐতিহাসিকভাবে এর উৎস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয় তাহলে প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পাদিত হতে পারে এবং তাৎকালিক পরিস্থিতির সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।"[৩৩]

'ওরাল হিস্ট্রি' পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ

ইংরেজি Oral History এর বাংলা ভাষান্তর নিয়ে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশে এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম লেখেন অধ্যাপক এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহমদ। তিনি এর অনুবাদ করেছেন 'কথ্য ইতিহাস' নাম দিয়ে। আর এ সম্পর্কে লেখেন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য মৌখিক তথ্য সংগ্রহ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতি। ঐতিহাসিকরা যেসব উৎসের উপর নির্ভর করে থাকেন সেগুলি হল প্রধানত লিখিত দলিল, পুস্তক-পুস্তিকা, চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি। মৌখিক ইতিহাস এসব থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে, এটি মৌখিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে একজন ব্যক্তি স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তিনি যেসব মানুষকে জেনেছেন বা যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বা যে সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেসব বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন। তবে এ ধরনের মৌখিক তথ্য লিখিত দলিলের বিকল্প নয়, এগুলি হলো তার পরিপূরক।[৩৪]

আবার বরুণ দে এর বাংলা ভাষান্তর করেছেন 'মুখের কথার ভিত্তিতে ইতিহাস'। তিনি উল্লেখ করেছেন, মুখের কথা একটা দিক অর্থ্যাৎ কিনা যেটাকে 'ওরাল' বলছি আর ইতিহাস হলো এর অন্য দিক। ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি "The oral part is the subset and the history part is the broader set" এবং ঠিক একইভাবে "the archieves is the subset and the history part is the broader set".[৩৫] তবে সাম্প্রতিক কালে Oral History প্রত্যয়টির বাংলা ভাষান্তর করা হচ্ছে 'বাচনিক ইতিহাস' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। এ প্রবন্ধে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বাচনিক ইতিহাস শব্দমালাটি Oral History এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ প্রত্যয়টির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে মতপার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয় কেননা মূল প্রত্যয়টি (ইংরেজিতে যা ওরাল হিস্ট্রি) নিয়ে রয়েছে নানান অভিমত। অনেকেই এ প্রত্যয়টিকে শব্দের অপপ্রয়োগ (misnomer) বলতে চেয়েছেন।[৩৬] শুরুর দিকে আবার কেউ কেউ এটিকে 'ওরাল ডকুমেন্টেশন' বলে অভিহিত করে বলেন, এটি হলো টেপ রেকর্ডিং শব্দটির একটি অপপ্রয়োগ – এটি হলো মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য যাকে সত্য বর্ণনা এবং মতামত হিসেবে বিশ্বাস করা হয়

---

[৩৩] Paul Thompson, op. cit., p. 9-10.

[৩৪] এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *কথ্য ইতিহাসের রূপরেখা: কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের সাক্ষাৎকার বিবরণীসমূহের সার সংক্ষেপ* (ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ১৯৯১), পৃ. ৭, উদ্ধৃত, মোঃ সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫।

[৩৫] "কথ্য ইতিহাস প্রসঙ্গে কিছু কথা," *মুখের কথায় ইতিহাস*, সত্যজিৎ দাসগুপ্ত সম্পা. (কলিকাতা: ১৯৯৬), পৃ. ২৩, উদ্ধৃত, মোঃ সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

[৩৬] Judy Larmour, "How to Do Oral History," Heritage Note No. 11, *Planning for Heritage Resources Research and Documentation* (Edmonton: Alberta Community Development and the Alberta Historical Resources Foundation, 1994), p. 2.

অথবা বিশ্বাসের ভাণ করা হয়।[৩৭] আসলে প্রথম দিকের অর্ধ-শতক পর্যন্ত বাচনিক ইতিহাস নিয়ে এক ধরনের অস্পষ্টতা ছিল, যে কারণে অনেকেই এমন মন্তব্য করেছেন। তবে ইংরেজি Oral History প্রত্যয়টি নির্দেশ করতে গবেষকগণ আরো অনেক নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'Hisory by word of mouth'[৩৮] 'word of mouth'[৩৯] 'Talking History'[৪০] প্রভৃতি। কিন্তু এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল ধারণা ঠিক রেখে ঐতিহাসিকগণ একে সংজ্ঞায়িত করতে যেমন বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করেছেন তেমনি বিভিন্ন নামে একে অবহিত করেছেন। তাই Oral History-র এরূপ বিভিন্ন নামকে শব্দের অপপ্রয়োগ বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

বাচনিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাসের উৎস লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। বাচনিক ইতিহাসে মৌখিক উৎসের প্রাধান্য থাকলেও সেখানে লিখিত উপাদানকে অস্বীকার করা হয় না। বরঞ্চ লিখিত ও মৌখিক সূত্রে পাওয়া তথ্য একে অপরকে যাচাই করে নিতে পারে।[৪১] এর ফলে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিহাসে সংঘটিত কোনো বিষয়ের কতিপয় বিশেষ সমস্যাদি সম্বন্ধে এর উৎসসমূহের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিকরণ সম্ভব হয়।[৪২]

বাচনিক ইতিহাস অতীতের পরিপূর্ণ এবং সঠিক চিত্র তুলে ধরে যা সরকারি দলিল, পারিসাংখ্যিক তথ্যাবলি, আলোকচিত্র, মানচিত্র, চিঠিপত্র, দিনপঞ্জি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎস থেকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয়; দালিলিক ইতিহাসে যা অসম্পূর্ণ থাকে তাতে প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নানান দৃষ্টিতে নানান প্রেক্ষিতে নতুন তথ্য-উপাত্ত যোগ করতে পারেন; এর মাধ্যমে দালিলিক ইতিহাসের ভুলগুলো সংশোধন করা যায় এবং এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্যাবলি দূর করা সম্ভব হয়; দালিলিক ইতিহাসে স্থান পায়নি এমন বিষয়ে উত্তরদাতাগণ তথ্য সরবরাহ করে থাকেন, যা পূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি বা বলতে ভুলে গেছেন।[৪৩] একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজনের নিকট সাক্ষাৎকার প্রদান

---

[৩৭] Luther Evans, "In sum: Impressions of a Librarian and Memorist," *The Second National Colloquium on Oral History*, Louis M. Starr ed. (New York: Oral History Association, 1968), pp. 97, 103.

[৩৮] John Tosh, op. cit., p. 295. এখানে তিনি ওরাল হিস্ট্রির সংজ্ঞায় লিখেছেন: "The first and familiar category is oral reminiscence—the first-hand recollections of people interviewed by a historian, usually referred to as *oral history*."

[৩৯] "Oral History," Goethe Institut, http://www.goethe.de/ins/za/prj/ wom/orh/ enindex. htm, accessed on 11th February 2015. এখানে ওরাল হিস্ট্রির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: "Oral History" is a method within the History Studies in which face-to-face interviews are conducted with surviving witnesses or verbal sources are analysed and evaluated. It provides us with a different perspective of the past and gives people a voice who would otherwise not have been heard.

[৪০] Sharon Veale and Kathleen Schilling, *Talking History: Oral History Guidelines* (Hurstville: Department of Environment & Conservation, 2004), p. 2.

[৪১] সত্যজিৎ দাসগুপ্ত সম্পা. *মুখের কথায় ইতিহাস* (কলিকাতা: ১৯৯৬), পৃ. ১২, উদ্ধৃত, মোঃ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

[৪২] A F Salahuddin Ahmed, op. cit., p. vii.

[৪৩] *Introduction to Oral History* (Waco, Texas: Baylor Institute for Oral History, 2014),

করেন, তখন সেটা লিপ্যন্তর করলে তা লিখিত দলিলে পরিণত হয়। অতীতের সত্য জ্ঞান মিথ, অর্ধসত্য এবং ভুলভাবে উপস্থাপিত তথ্যাবলি খণ্ডন করতে সহায়তা করে। আর জীবন্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভিতর দিয়ে কোনো ঘটনার যথাযথ প্রেক্ষাপট নির্ণীত হতে পারে।[৪৪] এভাবে অনুসন্ধানের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে বাচনিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রচলিত ইতিহাস রচনায় যে আবশ্যিক শূন্যতা বিদ্যমান তা পূরণকরণ করা বাচনিক ইতিহাসের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪৫]

সব ধরনের ইতিহাস রচনার কোনো না কোনো সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্যগুলো কী কী, তা অনেক সময় অস্পষ্ট থেকে যায়, কেননা কোনো স্থানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ, বৈশিষ্ট্য, তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এ ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই কালিক ও স্থানিক প্রেক্ষাপটের নানা অসমতা ও বৈশিষ্ট্যজনিত অস্পষ্টতা দূর করতে বাচনিক ইতিহাস আবশ্যিক হয়ে ওঠে।[৪৬] কেননা, মৌখিক দলিল পদ্ধতিগত উপায়ে জীবিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়, যেখানে তারা তাদের স্মৃতি ব্যবহার করেন। এখানে জীবিত ব্যক্তি বলতে জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে নাগরিক সমাজকে বোঝানো হয়। আর বাচনিক ইতিহাসে নাগরিক কণ্ঠ ব্যবহার করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সহজতর হয় এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।[৪৭] তাই কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ে জীবন্ত স্মৃতি থেকে মৌখিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন অনুভূত হলে লিখিত দলিলকে সেখানে মরাচিঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪৮]

কখনো কখনো ইতিহাস রচনায় সামাজিক উদ্দেশ্যই প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা বিজয় অর্জন কেন প্রয়োজন তার ব্যাখ্যাকরণ, কোনো অঞ্চল অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব এর সঠিক চিত্র অঙ্কন এবং এক শ্রেণির মানুষ বা জাতির উপর অন্য শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুক্তিযুক্ততা নিরূপণের জন্য বাচনিক ইতিহাস চর্চা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।[৪৯] তাই বাচনিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে কোনো দেশে সংঘটিত নিকট অতীতের এসব বিষয়ে অনুভূত অস্পষ্টতা দূরীকরণ সম্ভব হতে পারে।[৫০]

ব্যক্তিগত পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অতীত কোনো ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ব্যক্তি পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত উত্তর কোনো স্থানিক কিংবা কালিক ঘটনা কীভাবে সংঘটিত হয় এবং তা ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীকে কীভাবে প্রভাবিত করে ও তার আচরণে পরিবর্তন আনে সে সম্পর্কে একটি

---

p. 2; Paul Thompson, op. cit., p. 7.

[৪৪] Valerie J. Janesick, *Oral History For The Qualitative Researcher: Choreographing the Story* (New York: The Guilford Press, 2010), p. 14.

[৪৫] A F Salahuddin Ahmed, op. cit., p. vii.

[৪৬] Paul Thompson, op. cit., p. 1.

[৪৭] Abby Mills, Stephen Schechter, Shannon Lederer and Robert Naeher "Global Stories of Citizenship: Oral History as Historical Inquiry and Civic Engagement," *The Oral History Review 2011*, Vol. 38, No. 1, p. 44.

[৪৮] Gary Y. Okihiro, "Oral History and the Writing of Ethnic History: A Reconnaissance into Method and Theory," *The Oral Hisrory Review* 9 (1981), p. 331.

[৪৯] Ibid.

[৫০] A F Salahuddin Ahmed, op. cit., p. vii.

আত্মনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি পেশ করে।[৫১] আর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সকল ক্ষেত্রে বাচনিক ইতিহাস এরূপ তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এভাবে কোনো দেশে সংঘটিত সদ্যাতীত বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম উদ্‌ঘাটিত বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ এবং উপস্থাপন করা সহজ হয়।[৫২] কেননা, জীবিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংঘটিত ঘটনার প্রত্যক্ষ ও তথ্যভিত্তিক বর্ণনা প্রদানে উৎসাহী এবং সক্ষম হন।

সময়ের বিবর্তনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের কোন বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলো দীর্ঘ সময়ব্যাপী অপরিবর্তিত রয়েছে বাচনিক ইতিহাসের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়। পরিবর্তন এমন যা স্পষ্টত সকলের চোখে দৃশ্যমান। এটি ব্যক্তিজীবনে যেমন ঘটে তেমনি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ক্রমাগত ঘটে চলেছে। এসব পরিবর্তনের কোনোটি সাময়িক আবার কোনোটি স্থায়ী। ইতিহাস রচনার প্রচলিত ধারায় এসব পরিবর্তন এবং রূপান্তরের ধারা প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। আর সে কারণে বাচনিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। যেমন ব্যক্তিজীবনে মানুষ কখন কাঠের চুলা থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করতে শুরু করল, ডায়াল ফোন থেকে মুঠেফোন ব্যবহার করল, গ্রামোফোন থেকে আইপড ব্যবহার বা আরো জটিল উপকরণ ব্যবহার করা আরম্ভ করল এসব নানান বিষয় ইতিহাস রচনার প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে অঙ্কিত করা সম্ভব তার চেয়ে অধিক গভীরভাবে এবং প্রেক্ষাপট বিচারে আরো নিবিড়ভাবে বাচনিক ইতিহাসে অনুসন্ধান সম্ভব।[৫৩] সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয়ে জীবন্ত ও বাস্তবনির্ভর অনুসন্ধান বাচনিক ইতিহাসে অতীবও গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের সময়ের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতায় বর্তমান প্রজন্মকে মূল্যায়ন করবে। স্বাভাবিক নিয়মে অতীতের ঘটনা নতুন নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে বারংবার পুনর্বিবেচিত হতে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে বাচনিক ইতিহাস মানবগোষ্ঠীকে তাদের জীবনের গল্প ও অভিজ্ঞতাকে নিজেদের ভাষায়, কণ্ঠে ও অভিব্যক্তিতে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করার সুযোগ তৈরি করে। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষত ঘটনা কেন এবং কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে নিজেদের উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন অন্যকে জানাতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় বাচনিক ইতিহাবেত্তাগণ ঘটনার সাধারণীকরণ না করে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট নির্ণয়পূর্বক এর পিছনের অনুঘটকগুলো উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন যা ভবিষ্যত ইতিহাসবেত্তাদের জন্য সঠিক ইতিহাস নির্মাণ ও বিনির্মাণ করতে পথ দেখাতে পারে।[৫৪]

তবে সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে এ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন পল থমসন,

> বাচনিক ইতিহাস আবশ্যিকভাবে পরিবর্তনের কোনো হাতিয়ার নয়। কোনো আদর্শ এবং চেতনা নিয়ে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে মূলত তার উপর এর প্রয়োগ অনেকখানি নির্ভর করে। তা সত্ত্বেও এটি নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য দুটোই রূপান্তরের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইতিহাসের নিজস্ব প্রবণতা পরিবর্তনে এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যকার, প্রজন্মসমূহের মধ্যকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাইরের জগতসমূহের মধ্যকার দেওয়াল ভাঙতে

---

[৫১] *Introduction to Oral History*, op. cit., p. 2.

[৫২] A F Salahuddin Ahmed, op. cit., p. vii.

[৫৩] *Introduction to Oral History*, op. cit., p. 2.

[৫৪] Ibid., p. 2.

পারে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থে, জাদুঘরে, রেডিও বা সিনেমা যেখানেই ইতিহাস নির্মিত হোক না কেন যারা ইতিহাস রচনা করেন বাচনিক ইতিহাসে তারা কেন্দ্রীয় স্থান লাভ করতে পারেন।[৫৫]

উপসংহার

ইতিহাসকে যদি চলমান অতীত জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তা রূপায়ণের জন্য বাচনিক ইতিহাস হলো যথাযথ পদ্ধতি। সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান শৃঙ্খলায় বাচনিক ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইতিহাস গবেষণায় এ প্রত্যয়টি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতীতের স্মৃতিকে ইতিহাসের নিরিখে জীবন্ত করে তুলে ধরার প্রয়াস থাকে এ ধরনের গবেষণায়। বিগত শতকের মধ্যভাগ থেকে ইতিহাসবিদগণ পুরানো ধাঁচের গবেষণার বাইরে এসে নতুন ধরনের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন যেখানে শাসকশ্রেণির ইতিহাস বা গোষ্ঠী ইতিহাস অনুসন্ধান না করে সমাজ ও সভ্যতার রূপান্তরে সাধারণ মানুষের অবদান চিত্রিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এমনই এক প্রেক্ষাপটে গবেষণা পদ্ধতি এবং ইতিহাস হিসেবে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটি নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়। প্রথমে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে এ ধরনের গবেষণার ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিশ শতকের শেষ প্রান্তিকে এর ছোঁয়া লাগে। অতীতকে বর্তমানের ধারায় সংযুক্তপূর্বক যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষকে সামগ্রিক উন্নয়নের ধারায় নিয়ে আসার জন্য গবেষকগণ এ ধরনের গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর সঙ্গত কারণেই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাচনিক ইতিহাস গবেষণা প্রসঙ্গিক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

---

[৫৫] Paul Thompson, op. cit., p. 3.

আইনসভার ভেতরে-বাইরে রাজনীতি ও চিত্তরঞ্জন দাশ

সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম*

Abstract: Chitta Ranjan Das (1870-1925 A.D.) is one of the politicians whose contribution is unforgettable in the 1st and 2nd decades of 20th century Bengal politics. In the early 20th century, Bengal politics was basically under the control of educated youth and middle class and Chitta Ranjan Das was on the top of them. A series of changes were seen after 'The Annulment of the Partition of Bengal' in 1911 A.D. The participation of educated youth in Bengal politics accelerated. Out of urge for autonomy this group tried to make a compromise between the Hindu-Muslim communities. They became successful in building up communal harmony through their unending trial and writings. As a result, The Lucknow Pact (1916 A.D.), The Khilafat-Non-cooperation Movement (1919-1024 A.D) and The Hindu-Muslim Treaty (1923A.D.) of Swaraj Party came to reality. Chitta Ranjan Das was remarkable in this respect. Besides general political movements, he participated in legislative election ignoring Gandhi's, the father of India, request in order to revive legislative politics.

বিশ শতকের প্রগতিশীল রাজনীতিকদের মধ্যে অন্যতম হল চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি সি.আর দাশ নামে সমধিক পরিচিত এবং সাধারণ্যে দেশবন্ধু নামে আখ্যায়িত।[১] তাঁর মতো মহান, উদারচেতা ও দূরদর্শী নেতা খুব কম দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথম দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সংসদকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের মূল দিকগুলো এই প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সমকালে আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০-১৯৩৫), এ. কে ফজলুল হক, (১৮৭৩-১৯৬২), ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলসহ (১৮৭২-১৯১৭) অন্যান্য মুসলিম নেতারা মুসলিম লীগের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ১৯১৫ সালে বাংলা মুসলিম লীগের অন্যতম প্রভাবশালী ব্রিটিশ অনুগত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম নেতা নবাব সলিমউল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) মৃত্যুবরণ করলে যুব নেতৃত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যায় এবং এ সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[২] এ সময়ে ভারতের কানপুরে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ একটি মসজিদের অংশ

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

[১] *বাংলাপিডিয়া* (২০০৩), ভুক্তি "চিত্তরঞ্জন দাশ"।

[২] *The Mussalman*, বিভিন্ন সংখ্যা, 1915-1916, *মোহাম্মদী*, বিভিন্ন সংখ্যা 1915-1916.

বিশেষ ধ্বংস করায় মুসলমানদের মনে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা প্রকট রূপ ধারণ করে। বাংলার কংগ্রেসী নেতৃত্ব কানপুর মসজিদের ঘটনার পর মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। ইতোমধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে পথ তৈরি করেন আব্দুর রসূল, ফজলুল হক ও অন্যান্য যুব মুসলিম নেতৃত্ব। এই পদক্ষেপকে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা স্বাগত জানায়। বৃহত্তর স্বার্থে কংগ্রেস ও লীগ এক সাথে কাজ করতে বদ্ধপরিকর হয়। ঐক্য প্রয়াসী বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের মতে বিশ্বাসী মুসলমান নেতৃত্বের সহযোগিতায় মুসলিম লীগ সংগঠনকে কংগ্রেসের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।[৩] এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ইস্যুতে কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্যে লীগ কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এই উদ্যোগ সফল হয় ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে।[৪] এই চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক মতপার্থক্য আপোস-সমাধানের পথপ্রদর্শক হিসেবে এটি বিবেচিত হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে উভয় সংগঠন এক সাথে আন্দোলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ চুক্তি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের একটি মিলিত পদক্ষপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয় তা পরবর্তীতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত অটুট থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন এবং ১৯২০ সালে গান্ধীজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২৪) উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমত, মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতের মর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা; দ্বিতীয়ত ভারতের স্বরাজ অর্জন। খিলাফত বিষয়টি একান্তভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাপ্রসূত। মুসলিম ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক ঐ আন্দোলনের সাথে ভারতের স্বাধিকার আন্দোলন যুক্ত হওয়ার পরই কেবল এটি উপমহাদেশের সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন ভারতের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২০ সালে বাংলার প্রথম আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন থেকে অসহযোগ ও খেলাফত যুগপৎ পরিচালনা ও আইনপরিষদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বাংলার কংগ্রেস নির্বাচনের পক্ষে থাকলেও গান্ধীজীর প্রতি সম্মান রেখে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বেঙ্গল খেলাফত কমিটিও বাংলায় মুসলমানদের প্রতি নির্বাচন বর্জনের আহবান জানায় এবং কংগ্রেস খেলাফত কমিটির নেতৃবৃন্দ একত্র হয়ে প্রদেশব্যাপী সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন তথা অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণা চালায়।[৫] ফলে ব্রিটিশ অনুগত বিত্তশালী এবং অসহযোগ আন্দোলন বিরোধীরাই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়।[৬] স্বরাজ আন্দোলনে লিপ্ত

---

[৩] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশনস, ২০০৪), পৃ. ৪৬।

[৪] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Abu Yousuf, *Muslims and Bengal Politics* (1912-1924) (Kolkata: Raktakarabi, 2006), pp. 184-200.

[৫] Ibid., pp.150-152.

[৬] Ibid, pp. 155-156.

সংগঠনের কোনো প্রতিনিধি আইনসভায় না থাকায় স্বরাজ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। শুরুটা হিন্দু-মুসলিম প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে হলেও পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ সহিংস পরিস্থিতির কারণে গান্ধীজী অসহযোগ প্রত্যাহারে বাধ্য হন। গান্ধী গ্রেফতার হন ১০ মার্চ ১৯২২ সালে। নেতৃত্বের অভাবে কয়েক মাসের মধ্যে খিলাফত আন্দোলনও ঝিমিয়ে পড়ে। স্বরাজ, খিলাফত, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ঈপ্সিত লক্ষ্যের কোনোটিই এতে অর্জিত হয়নি। তাই অসহযোগ আন্দোলনের অসফল সমাপ্তি এবং অধিকাংশ নেতা কারাবন্দী থাকার কারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়।[৭] গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুসারীদের ইচ্ছা গান্ধীর নির্ধারিত অসহযোগ বজায় রাখা এবং আপাতত গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করা অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবী সমর্থকদের মতে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার ফলে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় চিত্তরঞ্জন দাশ আন্দোলনের তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল-''যে স্বৈরাচারী সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছিল সে সরকার পদ্ধতি ধ্বংস করা। কিন্তু বিশাল আন্দোলন সংগঠিত করার পরও এই লক্ষ্য অর্জিত হয় নাই। ব্রিটিশ সরকার ধাক্কা খেয়েছে কিন্তু একে ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি।''[৮]

চিত্তরঞ্জন দাশ এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনে অসহযোগ কর্মসূচি সংশোধন করে কংগ্রেস সমর্থকদের আইনসভা সমূহ অধিকার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে আইনসভার অভ্যন্তরে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করা যায়।[৯] চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর যারা তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেন তাদেরকে প্রো-চ্যাঞ্জার (পরিবর্তনকামী) এবং যারা পরিবর্তনের বিপক্ষে অবস্থান নেন তাঁরা নো-চ্যাঞ্জার নামে ১৯২২-২৩ এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিচিতি হন।[১০] ইতোমধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হন। আইনসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেতৃত্ব যেমন মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খান, বি.জে প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তির সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন।[১১] কিন্তু কংগ্রেসে গান্ধী সমর্থক পরিবর্তন বিরোধী সদস্যের প্রাধান্য থাকায় ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাব (নির্বাচনে অংশগ্রহণ) প্রত্যাহার করা হয়।[১২] এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং মতিলাল নেহেরু, আজমল খান ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সহযোগিতায় ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ পার্টি গঠনের ঘোষণা প্রদান করে[১৩] এবং দ্বিতীয় বঙ্গীয় আইনপরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার সংস্কারকৃত কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণকে একটি মুখোশ উপহার দিয়েছেন।[১৪] ভারতীয়দের দায়িত্ব হচ্ছে এই মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা। আইনসভার বাইরে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ এই

---

[৭] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

[৮] ঐ।

[৯] S.C Bose, *The Indian Struggle* (1920-1942), Asia Publishing House, Bombay, 1964, pp.78-79.

[১০] *The Mussalman*, 5 Feb, 1923; S C Bose, pp. 78-79.

[১১] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

[১২] ঐ।

[১৩] Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India*, vol-IV (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, 1972), p. 4.

[১৪] C.R Das Menefesto, *The Mussalman*, 21 December 1923.

কাউন্সিলের তথাকথিত ক্ষমতা ও মর্যাদাকে ইতোমধ্যে উন্মোচন করেছেন এবং জনগণ উপলব্ধি করে যে, যারা এখন কাউন্সিলের অভ্যন্তরে মর্যাদায় আসীন তাঁরা কেউ জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নন। তা সত্ত্বেও তিনি উল্লেখ করেন যে, কাউন্সিল এখনও অস্থিতিশীল এবং কংগ্রেসের উচিত তাতে প্রবেশ করা এবং অভ্যন্তর থেকে একে ভেঙ্গে ফেলা। এই কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘটানো হবে একমাত্র কার্যকর বয়কট আন্দোলন।[১৫] স্বরাজ পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণের কর্মসূচি কংগ্রেসের প্রচুর সমর্থকের কাছে সাধারণ জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পুনঃসুযোগ সৃষ্টি হয়।[১৬] স্বরাজ পার্টি ঘোষিত আইনসভার অভ্যন্তরে অসহযোগ কর্মসূচি তাদের কাছে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ উপলব্ধি করেন, তাঁর ঘোষিত কর্মসূচি হিন্দু মুসলমান সমর্থন ছাড়া সফল করা সম্ভব নয়। তিনি এও উপলব্ধি করেন শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদনের মধ্যে স্বরাজ পার্টির কর্মসূচির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নাও পেতে পারেন। তাই তিনি সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও যৌক্তিক অধিকার বাস্তবায়নে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ১টি চুক্তিতে উপনীত হবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনকারী বঙ্গীয় মুসলমান-নেতৃত্ব দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উন্নয়ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশা এবং খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট হতাশার পরিস্থিতিকে তাদের পক্ষে নিয়ে আসার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁরা বুঝতে পারেন ব্রিটিশ অনুগত বিত্তশালী মুসলমান নেতৃত্বের পরিবর্তে আইনসভার অভ্যন্তরে তাঁরা যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে ভূমিকা রাখেন তাহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের আস্থা তাদের প্রতি ফিরে আসবে।[১৭] তাছাড়া হিন্দু মুসলমান বৈরীতার কারণ দূর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের আন্তরিক উদ্যোগও ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ অনুগত রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারবে।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি হিন্দু-মুসলিম চুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে তা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে নির্বাচনের (নভেম্বর-১৯২৩) জন্য ব্যাপক সাড়া মেলে। এটি প্রথমে ঘোষিত হয়েছিল যে, কাউন্সিল দখল করার জন্য প্রয়োজনে নির্ধারিত সকল আসনে স্বরাজ পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।[১৮] কিন্তু যখন স্বরাজ পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল যে স্বরাজ পার্টি মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা ৫৭জন, যার মধ্যে অমুসলিম আসনে ৩৪ এবং মুসলিম আসনে ২৩ জন প্রার্থী।[১৯] যে সব আসনে স্বরাজ পার্টি কোন প্রার্থী দাঁড় করাননি সে সব আসনের অনেকগুলোতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা স্বরাজ পার্টির সমর্থন লাভ করে। ১৯২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ফলাফল ঘোষণায় দেখা যায় ২৫ জন হিন্দু ও ২৩ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়। যদিও স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে বিপুলভাবে জনসমর্থন লাভ করে কিন্তু আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তা সত্ত্বেও বেশ কিছু স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থনের অঙ্গীকার পেয়ে আইন সভায় স্বরাজ পার্টি ঘোষিত কর্মসূচি "আইনসভার অভ্যন্তরে অসহযোগ" পালনের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠে।[২০]

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) কর্তৃক খিলাফত বিলুপ্তি ঘোষণা করা হলে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আরো জেঁকে বসে। কংগ্রেসে ওয়ার্কিং

---

[১৫] Abu Yousuf, *Muslims and Bengal Politics* (1912-1924), pp. 374-375.

[১৬] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

[১৭] ঐ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

[১৮] *Forward*, 25 October 1923.

[১৯] *Forward*, 9 November 1923.

[২০] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

কমিটি গো রক্ষাসহ গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচিকে কংগ্রেসের কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা উৎসাহিত হয়। কট্টরপন্থী হিন্দু নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার পুনর্গঠন, মূর্তি উপাসক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উদ্যোগে শুদ্ধি আন্দোলন,[২১] লালা লাজপত রায়ও হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগঠন[২২] নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের মুসলমানরা শুরু করে তাবলীগ (প্রচার)[২৩] ও তানযীম (সংগঠন)[২৪] আন্দোলন। ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটে। খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হবার পর হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অবনতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক বিভেদের পুরানো ও অবাস্তব বিষয়গুলো যেমন – হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, দূর্গাপূজা, মহরম উপলক্ষে ধর্মীয় শোভাযাত্রার মসজিদ, মন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান অতিক্রম, গরু জবাই করা, মসজিদের সামনে উচ্চশব্দে গান বাজানো ইত্যাদিতে চরম সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে সমঝোতায় পৌছান। চিত্তরঞ্জন দাশের দূরদর্শিতার দরুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এড়ানো সম্ভব হয়। বাংলা হিন্দু মুসলমান ঐক্য দৃঢ় করার লক্ষ্যে স্বরাজ পার্টি ১৯২৩ সালে ১৫ ডিসেম্বর হিন্দু- মুসলিম বঙ্গীয় চুক্তি সম্পাদন করে।[২৫]

চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় – স্বশাসন অর্জনের পর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব লাভ করবেন[২৬]। অন্যদিকে উর্দুভাষী ও শহরবাসী নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের গো-হত্যা ও মসজিদের সামনে বাদ্য-বাজনা সম্পর্কিত সংস্কারের পক্ষে চুক্তিতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সচেতন মুসলমানরা চিত্তরঞ্জন দাশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।[২৭] যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের কারণে স্বরাজ পার্টি কলকাতা

---

[২১] স্বামী শুদ্ধানন্দ ১৯০৯ সালে উত্তর ভারতের রাজপুত (দরিদ্র) ও মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার মানসে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন অতি দ্রুত আগ্রা, পাঞ্জাব, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম মাত্রায় তারা ২০,০০০ লোককে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করেন। Hussainur Rahman, *Hindu-Muslim Relations in* Bengal (1905-1949) (Bombay: Nachiketa Publications , 1974), pp. 46-50.

[২২] শুদ্ধি আন্দোলন অতি অল্প সময়ে সাংগঠনিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়, জুলাই ১৯২৩ সালে শুদ্ধি আন্দোলনকে হিন্দু মহাসভা অনুমোদন দেয়। Mushirul Hassan(ed), *National and Communal Politics in India* (New Delhi: Monohar, 1979), pp. 255-257.

[২৩] শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের বিপরীতে উত্তর ভারতে মুসলমানরা তাবলীগ (প্রচার) ও তানজীম (সংগঠন) আন্দোলন গড়ে তোলে। Mushirul Hassan, pp. 199, 251.

[২৪] Hussainur Rahman, pp. 47-52.

[২৫] *Forward*, 26 December, 1923.

[২৬] ক) প্রাদেশিক আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ করে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

খ) স্থানীয় সরকারসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ৬০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব এবং সংখ্যালঘুরা ৪০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব পাবে।

গ) সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের শতকরা ৫৫ ভাগ পদে নিয়োগ দান করা হবে।

ঘ) ধর্মীয় বিষয়ে কোনো আইন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ৭৫ ভাগ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া আইনসভায় উপস্থাপন করা যাবে না। আইন সভার বাইরে এই সব বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঙ) বাংলার প্রত্যেকটি সংস্থায় সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে। যার দায়িত্ব হবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করা। দ্রষ্টব্য, মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

[২৭] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, পৃ. ৮৩।

কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং অন্য দিকে যশোর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও নদীয়াসহ অন্যান্য মফস্বলের পৌরসভাতেও স্বরাজ পার্টির বিজয় লক্ষ্যণীয়।[২৮] ১৯২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি আইন পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে স্বরাজ পার্টি তাঁর মুসলমান সদস্যদের সহযোগে এবং স্বতন্ত্র হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের সহযোগিতায় দলের ঘোষিত কর্মসূচি "আইনসভার অভ্যন্তরে অসহযোগ" পালনে তৎপর হয়।

স্বরাজ পার্টি নিজেদের শক্তি সংহত করে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের সমর্থন নিয়ে আইনসভায় প্রবেশ করে। স্বরাজ পার্টির কাউন্সিল নেতৃত্ব তাদের অসহযোগ কর্মসূচি আইসভার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে কার্যকর করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন।[২৯] শুরুতেই স্বরাজ পার্টি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার জন্য গভর্নরের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন ফলে সরকার অনুগতদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগকে স্বরাজ পার্টি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। মন্ত্রীদের সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে স্বরাজ পার্টির একজন সদস্য মামলা দায়ের করলে তাঁর নির্বাচন বাতিল হয়ে যায় ফলে তাকে মন্ত্রীপদ থেকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়।[৩০] স্বরাজ পার্টির কর্মসূচি অনুযায়ী কাউন্সিলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং নির্যাতনমূলক আইন বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, এসব প্রস্তাবের প্রত্যেকটিতে সরকার পক্ষ পরাজিত হয় এবং গান্ধীর মুক্তিতে স্বরাজ পার্টির অবস্থান প্রশংসিত হয়। স্বরাজ পার্টি মনে করে যে, তাদের প্রভাবের কারণেই গান্ধীজী মুক্তি লাভ করে। স্বরাজ পার্টির কাউন্সিলে অসহযোগিতা নীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ করা হয় আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে, যখন সরকারের আর্থিক দাবির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালানো হয়। আইনপরিষদে স্বরাজ পার্টির মূল লক্ষ্য ছিল মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা অস্বীকার করে তাদের পদত্যাগে বাধ্য করা এবং তথাকথিত সংস্কার আইনকে (১৯১৯) অচল প্রতিপন্ন করা। দ্বৈতশাসন এবং মন্ত্রীদের বেতন-ভাতাসংক্রান্ত আইনসভায় উত্থাপিত বিল ভোটে দেওয়া হলে তা অধিকাংশ সদস্যের ভোটে নাকচ হয়।[৩১] ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় বঙ্গীয় আইনপরিষদের ২য় কাউন্সিলের পরবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা স্থগিত করতে।[৩২] মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা বিল নাকচ হওয়ার ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং আইন পরিষদে স্বরাজ পার্টির দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে সাফল্যের কারণে একদিকে সরকার বাধ্য হয় দ্বৈশাসনকে স্থগিত করতে, অন্যদিকে কংগ্রেস রাজনীতিতে স্বরাজ পার্টির "আইনসভার অভ্যন্তরে অসহযোগিতা" নীতির সফলতা প্রশংসিত হয়।[৩৩] গান্ধীজীর অনুরোধ উপেক্ষা করে সংসদের ভেতরে ও বাইরে আন্দোলন বা ভূমিকার মাধ্যমে স্বরাজ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসা ও অন্যান্য দাবি আদায়ের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ। জাতীয় কংগ্রেসের চুক্তির প্রতি সমর্থন না থাকা, ব্রিটিশ অনুগত বাংলার অভিজাত নেতৃত্বের অব্যাহত নেতিবাচক কার্যকলাপ ও প্রচারণা, উপরন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৬ জুন, ১৯২৫) এবং মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ায় বেঙ্গল প্যাক্ট এর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। এই চুক্তি ছিল উপরিকাঠামো ঐক্যের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঐক্য বজায় রাখার শেষ চেষ্টা।

---

[২৮] Abu Yousuf, *op.cit*, pp. 432-433.
[২৯] মোঃ সেকান্দার চৌধুরী, পৃ. ১৫৭।
[৩০] ঐ।
[৩১] *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, 23rd March, 1925, Vol- XVII, p. 223.
[৩২] *The Statesment*, 13 June, 1925.
[৩৩] মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, পৃ. ১৬৭।

বাংলাদেশের ত্রিপুরা : ধর্মাচার ও সংস্কৃতি

জি. এম. মনিরুজ্জামান*

Abstract: Tripuri (Tipra or Tipperah), an ethnic group belonged to Bodo branch of the Tibeto-Burman family of languages, lives in the hill tracts area of Bangladesh. The religious faith of Tripuri people is created through heredity of themselves. They remember their gods through their traditional songs and dances in the various religious rituals and festivals, thus, they keep a good relationship and strong bond among their family members, relatives and within the sub-groups. In these religious rituals and festivals, there is a reflection of their family and personal works. Tripuri people have various colourful festivals and rituals, which they celebrate according to the fixed auspicious moments or dates of their own year-calendar, named, Tripurabda.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমী, লুসাই প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী বাস করে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডের পরিসীমায় পাহাড়ি ও সমতল এলাকায় বসবাসকারী এ জাতীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি।[১] এদের মধ্যে অন্যতম একটি

---

* ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] বাংলাদেশের এথনিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা বিষয়ে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। যেমন, ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুসারে এর সংখ্যা ২৯টি। কিন্তু আদমশুমারির এই প্রতিবেদনের দুইটি স্থানে একই গোষ্ঠীকে দুইটি পৃথক এথনিক গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, টিপরা এবং ত্রিপুরা গোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে একই নৃগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এই গোষ্ঠীকে পৃথক দুইটি গোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঠিক একই ভাবে বংশী এবং রাজবংশী একই নৃগোষ্ঠীভুক্ত হলেও উক্ত প্রতিবেদনে পৃথকভাবে পাওয়া যায়। এসব বিষয়কে বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ২৭টি বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* (৩য় সং; ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ৪২৭। আবার, মঙ্গল কুমার চাকমা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ "বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সার্বিক অবস্থা"-তে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসীর সংখ্যা ৪৫টির অধিক উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি আদিবাসী জাতির অবস্থান রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০১০), পৃ. ২৫। মেসবাহ কামাল আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর এই সংখ্যা অধিকতর বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তা হিসেবে ৭৩টি গোষ্ঠীর তালিকা উল্লেখ করেছেন; যার প্রথমে 'অধিকারী' এবং শেষে 'হাজং' নৃগোষ্ঠীকে দেখানো হয়েছে।

ত্রিপুরা। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কয়েকটি জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় এই ত্রিপুরাদের বাস।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে ত্রিপুরা গোষ্ঠী বিভিন্ন কাজের তাগিদে ভিন্ন স্থান বা দেশ হতে এদেশে আসে। ধর্ম পরিচয়ের দিক দিয়ে ত্রিপুরা গোষ্ঠী নিজেদেরকে কখনো সনাতন, কখনো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করে। সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুরূপ হলেও এদের নিজস্ব কিছু ধর্মীয় ঐতিহ্য রয়েছে। এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তৈরি বিভিন্ন দেবদেবী পূজার পাশাপাশি এমন কিছু ধর্মানুষ্ঠান পালন করে যা প্রকৃতিপূজার পর্যায়ভুক্ত। ত্রিপুরাদের যে স্বতন্ত্র ধর্মসংস্কৃতি রয়েছে এ বৈশিষ্ট্য তার প্রমাণ। বর্তমান প্রবন্ধে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মাচার ও সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ত্রিপুরাদের ধর্মাচার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলার সদর থানার কর্ণফুলী নদীর উত্তরে গর্জনতলি নামক স্থান এবং বান্দরবন জেলার সদর থানার সাঙ্গু নদীর পূর্বে কালাঘাটা নামক পাড়াকে মনোনীত করা হয়েছে। এই স্থান দুইটি সম্পূর্ণ ত্রিপুরা অধ্যুষিত এবং এর মধ্যে ত্রিপুরা পরিবার যথাক্রমে ৬০টি এবং ৩৫টি। রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলি এবং বান্দরবন জেলার কালাঘাটা স্থানের ত্রিপুরা জনসংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৩৫০ জন এবং ১৮০ জন; সর্বমোট প্রায় ৫৩০। ত্রিপুরা অধ্যুষিত গর্জনতলি এবং কালাঘাটা পাড়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের তাবৎ ত্রিপুরা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, এই ধারণা থেকেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষণাটির মাঠপর্যায়ের ক্ষেত্র অনুসন্ধান তথ্য সংগ্রহের কাল রাঙ্গমাটি জেলায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জুন মাস এবং বান্দরবন জেলায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস হতে মার্চ মাস পর্যন্ত।

১.১ প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা ও লক্ষ্য

বাংলাদেশে ত্রিপুরাদের ধর্মাচার ও সংস্কৃতির প্রামাণিকতা কতোটা? বর্তমানে তাদের সমাজ বা গোত্রে তারা এসব কতটুকু ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে? এদের নিজেদের মধ্যে ধর্মসংস্কৃতির মিল কতোটা? যদি এ বিষয়ে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা মূল ধর্মীয় বিষয় ও বাস্তবতা থেকে কতোটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর মাত্রা কী? পালিত ধর্মাচার ও সংস্কৃতিতে এদের মানসিকতা ও মনোভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায়? বর্তমান গবেষণায় এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিম্নরূপ:

(ক) ত্রিপুরাদের প্রচলিত ধর্মাসংস্কৃতির অনুসন্ধান ও তার প্রকৃতি নির্ণয়;

(খ) এ সবের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্যিক ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ চিহ্নিত করা;

(গ) বর্তমানে পালিত ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলোর গ্রহণ-বর্জন, সংযোজন-বিয়োজন ইত্যাদির মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ধারণ;

(ঘ) এদের মনোলোকে যে প্রতিফলন ঘটে, তা উদ্ঘাটন করা।

মেসবাহ কামাল সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিক গবেষণা*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৩৬। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশের অধীনে এথনোগ্রাফিক সার্ভে বা নৃতাত্ত্বিক জরিপ প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে এবং তা হাল নাগাদ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর এই সংখ্যা সঠিক পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে, বর্তমান গবেষক কর্তৃক আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর এ জাতীয় আরো বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রাপ্তিসাপেক্ষে এর সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে। এমন ধারণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য সংখ্যা প্রায় ৪০টি। গবেষণা এলাকার শিক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীও এই সংখ্যা সম্পর্কে কমবেশি এমনটি ধারণা দিয়ে থাকে।

১.২ পদ্ধতি

মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এই গবেষণায় প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানকালের ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ধর্মাচার ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন বয়সের এবং পেশাজীবীর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার। এই গবেষণায় সহায়ক উপকরণের মধ্যে আছে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, অভিধান, সহায়ক প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা – যা যথেষ্ট নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হিসেবে স্বীকৃত।

২. ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে ত্রিপুরারা বাংলাদেশের আদি নর্ডিক এবং এদের মধ্যে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত আদিবাসীরা নিজেদের পরিচয় নিয়ে অসচেতন। ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলি পাড়ার ত্রিপুরা গোষ্ঠী নিজেদেরকে 'সনাতন' ধর্মাবলম্বী এবং বান্দরবন জেলার কালাঘাটা ত্রিপুরা গোষ্ঠী নিজেদেরকে 'খ্রিস্টান' ধর্মাবলম্বী বলে থাকে।[২] মাতৃতান্ত্রিক ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী নিজেদেরকে উপজাতি হিসেবে পরিচয় দিতে অনীহা প্রকাশ করে। তবে এরা নিজেদের নামের শেষে সাধারণত 'ত্রিপুরা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। অপরদিকে নিজেদেরকে কোথাও এরা 'ত্রিপুরা' আবার কোথাও 'টিপরা' বলে অভিহিত করে। এদের নিজস্ব একটি বর্ষপঞ্জি আছে, যার নাম ত্রিপুরাব্দ এবং ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ হতে এই বর্ষপঞ্জি শুরু হয়। নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে ভাষাগোষ্ঠীগত পরিচয়ে ত্রিপুরারা সিনো-টিবেটান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সিনো-টিবেটান ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আছে টিবেটোড-বার্মান, ব্রহ্মপুত্রী, বোডো-কোচ, বোডো-গারো, বোডো। এই বোডো থেকে 'কক্‌বরক' ভাষার উৎপত্তি; যা ত্রিপুরা উপজাতির ঐতিহ্যিক ভাষা বলে স্বীকৃত।[৩] 'কক্‌বরক' শব্দটিতে দুটি শব্দের সমন্বয় ঘটেছে, 'কক্' অর্থ ভাষা আর 'বরক' অর্থ হলো মানুষ। সুতরাং এই 'ককবরক' বলতে মানুষের ভাষা বোঝায়। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিরা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সময়ে এই ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

ত্রিপুরা ভাষাবিদ মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা 'ত্রিপুরা' শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে যেমনটা বলেন, ত্রিপুরা শব্দটি 'তৈ-পারা' থেকে এসেছে। 'তৈ' অর্থ হলো পানি বা জল, আর 'পারা' শব্দের অর্থ হলো পাড় অর্থাৎ নদীর পাড়। সুতরাং বলা যায়, যে উপজাতি নদীর পাড়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সামাজিক কার্যকলাপ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাস করে তাকে ত্রিপুরা আদিবাসী বা উপজাতি বলে।[৪]

---

[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ থানার এলাহীপুর ইউনিয়নের জামমুড়া পাড়ায় যে ১৭টি ত্রিপুরা পরিবার বসবাস করে, তাদেরকে 'সনাতন' এবং 'খ্রিস্টান' উভয় ধর্মই পালন করতে দেখা যায়। ধর্মের দিক দিয়ে তারা এক মিশ্র পরিচয় ধারণ করে।

[৩] কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী, *কক্‌বরক ভাষা শিক্ষার আসর* (ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ২০০৮), পৃ. ১২। এছাড়া, ২০১২ সালে এক সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরা ভাষাবিদ মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (জন্ম-১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, প্রয়াত ২০১৩ সাল) এই মতটি প্রদান করেন।

[৪] বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ নিজেদেরকে 'আদিবাসী' বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গবেষণা এলাকা দুইটিতেও তা অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। তবে, সরকারিভাবে এসব জাতিসমূকে 'উপজাতি'; কোনো কোনো আইনে 'আদি বাসিন্দা' বা 'আদিবাসী পাহাড়ি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৬ সালের ১৯ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দেওয়া সরকারি আদেশে এসব ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে সরকারি নথিপত্রে 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে 'উপজাতি' হিসেবে এদেরকে আখ্যায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত 'উপজাতি' শব্দটি উদ্ভব হয়েছে ইউরোপীয়

অপরদিকে 'কক্বরক' ভাষায় 'তোয়' শব্দের বাংলা অর্থ নদী বা জল। আর 'প্রা' বা 'বপ্রা' অর্থ নগর বা মোহনা। এজন্য 'তোয়প্রা' শব্দ থেকে ত্রিপুরা নামটির উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। ত্রিপুরাদের অধিকাংশ পূজা পালনের স্থানও নদীর তীরবর্তী এবং সে স্থানে তাদের ধর্ম-কর্ম সম্পন্ন করতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা এ তিন নদীর অববাহিকায় ত্রিপুরাদের তিনটি সমৃদ্ধ নগর বা পুর ছিলো। তাদের বিশ্বাস এই তিন পুরের বাসিন্দা হিসেবে ত্রিপুরা নামটি নামাঙ্কিত হয়েছে।[৫]

১৯৪৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয় এবং প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ঐ সময় পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান ভাষা ছিলো 'কক্বরক'। এই ভাষার নিজস্ব লিপি নেই।[৬] ৫৮৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এক হাজার তিনশত চৌষট্টি বছর ধরে ত্রিপুরা জাতির রাজন্যবর্গ ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করেন। ত্রিপুরা ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজমালা' থেকে জানা যায়, মহারাজা চন্দ্র থেকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য বাহাদুর পর্যন্ত ১৮৪ জন রাজা ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করেন। মহারাজা কৃষ্ণ কিশোরমাণিক্যের (১৮৩০-১৮৪৯) শাসনামলে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে এরও চারশত বছর পূর্ব থেকে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিলো। এই দীর্ঘ সময় বাংলা ভাষা ছিলো ত্রিপুরা রাজপরিবারের অনুবাদের মাধ্যম।[৭] খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে বোডো জনগোষ্ঠী চীনের মূল ভূখণ্ডের ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াংহু নদীর মধ্যবর্তী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে বলে জানা যায়।[৮] তারপরে জীবন-জীবিকার তাগিদে এরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেকালের ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে লালমাই ময়নামতি পাহাড় অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ১০ মাইল এবং পরিধি ২১ মাইল। এ পাহাড়ের আকৃতি ছোট এবং সমতল ভূমি হতে ৪০ ফুট উঁচু। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১০০ ফুট। বর্তমানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হলেও প্রাচীনকালে এ পর্বতে মানুষের বাস ছিলো। ১৮৭৫ সালে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ থানার কালীরবাজারে রাস্তা তৈরির সময় পাহাড়ের

ঔপনিবেশিকতার উত্থান এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতি-বর্ণ ভিত্তিক ভাবাদর্শ থেকে। ঔপনিবেশিকতাবাদের যখন খুব রমরমা অবস্থা, তখন কিছু জাতিগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। উপজাতি বলতে এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বিদ্বেষপ্রসূত; যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী*, পৃ. ২৬।

[৫] সুগত চাকমা সম্পা., *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় উৎসব ও বিবাহ* (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ২০০৭), পৃ. ৪৯।

[৬] শামসুজ্জামান খান, প্রধান সম্পা., *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৩২৫। 'ককবরক' ভাষা মৌখিকভাবে চালু থাকলেও এর কোনো নিজস্ব লিখিত রূপ নেই। যদিও পাহাড়ি আদিবাসী লেখক মহেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এক ধরনের ত্রিপুরা বর্ণ রচনা করলেও তাকে কোনো স্বভাষায় উচ্চারণ দিতে পারেননি।

[৭] শোভা ত্রিপুরা, *ত্রিপুরা জাতি* (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৭), পৃ. ১০১। ভারত ও বাংলাদেশে ২০০১ সাল ব্যুরো অনুযায়ী ত্রিপুরা ভাষায় কথা বলে ৯,৭০,০০০ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশে উক্ত ভাষায় কথা বলে ৭৮,০০০ জন। বাংলাদেশের কুমিল্লা দেশবিভাগের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পরবর্তীতে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অধীনে চলে যায়। ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ভাষাকে ভাষার মর্যাদা দেয়। তাছাড়াও ঐ রাজ্যের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ককবরক ভাষা বিভাগ প্রচলিত রয়েছে।

[৮] বরেন ত্রিপুরা ও সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, *ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ* (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫), পৃ. ৩৬।

উপরে একটি সুন্দর দুর্গ আবিষ্কার হয়। এটি ত্রিপুরার মহারাজ তাঁর স্বাধীন রাজ্যের একাংশ বলে মনে করতেন। প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলো। আধুনিক ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কিছু অংশ সেকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৯]

বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০,০০০ ত্রিপুরা বসবাস করে।[১০] ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মিজোরাম, মায়ানমার, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রিপুরাদের বসবাস লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সবচেয়ে বেশি ত্রিপুরা বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাছাড়া ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবনসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলে এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে দেখা যায়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসী লোকসংখ্যার মধ্যে ত্রিপুরাদের অবস্থান তৃতীয় এবং জনসংখ্যা ৫২,৯৪২ জন।[১১] ২০০৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। এছাড়াও চট্টগ্রাম, বৃহত্তর নোয়াখালি, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর সিলেট, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক ত্রিপুরা বাস করে।[১২] ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ধারণা এদের জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ লক্ষ।

৩. ত্রিপুরাদের গোত্র, খাদ্যাভাস ও সমাজ প্রধান

ইংরেজ শাসনামলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসক ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন তাঁর *Wild Races of South-Eastern India* (1870) গ্রন্থে ত্রিপুরা বা টিপরাদের চারটি দলে বিভক্ত (পুরান, নোয়াটিয়া, উসুই ও রিয়াং) করে দেখালেও প্রকৃতপক্ষে টিপরাগণ ভাষাগত ও আচার-আচরণগত বিভিন্নতার কারণে নিজেদেরকে ৩৬ গোত্র বা দলে বিভক্ত বলে থাকেন। এদের মধ্যে ১ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত গোত্র বা দল বাংলাদেশে বসবাস করে এবং অন্য গোত্রগুলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে। এই ৩৬টি দল যথাক্রমে (১) নাইতং, (২) ফাতুং, (৩) দেঁইদক, (৪) গাবিং, (৫) খালি, (৬) হারভাং, (৭) রিয়াং, (৮) উসুই, (৯) টংবাই, (১০) মংবাই, (১১) কেওয়া, (১২) কেমা, (১৩) আসলং, (১৪) আনক, (১৫) বেরী, (১৬) দাসপা, (১৭) রুক্কিনী, (১৮) জামাতিয়া, (১৯) নোয়াতিয়া, (২০) রাংখল, (২১) হাপাং, (২২) হালাম, (২৩) কলই, (২৪) মলসম্, (২৫) গর্জং, (২৬) গাইগ্রা, (২৭) মুইচিং, (২৮) খাকুলু, (২৯) গুরপাই, (৩০) চরই, (৩১) কৈরিং, (৩২) মুকচাক্, (৩৩) বং, (৩৪) বংচের, (৩৫) কাছার এবং (৩৬) কলি।

পাহাড়ি জাতিগুলোর মধ্যে ত্রিপুরারাই ছিলো সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং তারা অন্যান্য পাহাড়ি জাতিগুলোর উপর যুদ্ধে জয়ী হয়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী স্বীকার করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ প্রধানত শিকারজীবী ছিলো। পরে এরা পাহাড়ের ঢালে ক্রমান্বয়ে জুম পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে। বর্তমানে এদের প্রধান পেশা কৃষি। টিপরা পুরুষরা ধুতি ও ফতুয়া পরিধান করলেও বর্তমানে লুঙ্গি-শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে। ত্রিপুরা নারীরা নিম্নাঙ্গে পরে তাদের নিজস্ব তাঁতে বুনানো নকশা করা রিনাই এবং কোমরের উপরে বক্ষে পরিধান করে নকশা করা রিসাই বা রিয়া। আধুনিক ত্রিপুরা নারী-পুরুষরা বাঙালি ছেলেমেয়েদের মতোই কাপড় পরে। ত্রিপুরাদের খাদ্যাভাস মাটির হাঁড়ি বা বাঁশের চোঙায় রান্না

---

[৯] কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস* (আগরতলা: অক্ষর, ১৯৯৮), পৃ. ২১৪।

[১০] *তদেব*, পৃ. ৩৬।

[১১] *আদমশুমারি প্রতিবেদন ১৯৯১* (ঢাকা: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯২)।

[১২] সুগত চাকমা সম্পা., *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় উৎসব ও বিবাহ*, পৃ. ৪৯। এ গ্রন্থের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা জনসংখ্যা ৬১,১২৯।

ভাত, সেরজাক বা তেল দিয়ে রান্না মাছ, মাংস, সবজি; য়ক্জক বা বিভিন্ন প্রকারের সবজি ভাজি ও মাছ-মাংসের ভুনা-ভাজি। আর মাছ-মাংসে এরা লবণ-হলুদ মিশিয়ে আগুনের তাপে সেঁকে খায়, যাকে ত্রিপুরা ভাষায় হাংজাক বলে। মরিচ কম দিয়ে বিভিন্ন মসলা সহযোগে মাংস-মাছ-বিচির স্যুপ বা প্রেংজাক তারা পান করে। তাছাড়া কলাপাতায় মোচা বেঁধে পোড়ানো ভর্তা বা মৌকজাক; ক্ষার বা সোডা দিয়ে মুলা, বাঁশের কচি ডগা, কলাগাছ প্রভৃতির সাথে মাংস বা মাংসের চর্বি মিশিয়ে রান্না চাখৈ; কোনো টাটকা সবজি বা কুল সামান্য কাঁচা হলুদ দিয়ে রান্না রুজাক খেয়ে থাকে। এছাড়া বাঁশের কুরুলের সাথে হরিণ বা শূকরের মাংস বা মাছ পঁচিয়ে এরা মসলা দিয়ে কেসক খায়। এজাতীয় কুরুয়া, পাঁচন, লকবানা, খুঁইশানী, মাইবানা, মাইত্রাম প্রভৃতি তাদের নিজস্ব খাবার। এসব খাবার তারা আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি, প্রতিবেশী এবং মেহমানদের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করে খায়। এছাড়া নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি মদ বা চক বা চোয়ানি তাদের প্রধান খাদ্য। পূর্বে এদের জ্ঞাতি সম্পর্ক যেমন আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলো, বর্তমানেও তা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বিরল। পার্বত্য আদিবাসীদের সমাজ প্রধান হলেন চীফ অথবা হেডম্যান বা রোয়াজা বা দেওয়ান। তিনি গ্রামের বা নির্দিষ্ট একটি এলাকার বাসিন্দাদের দ্বারা মনোনীত হন। ত্রিপুরা সমাজপ্রধান চীফের পদমর্যাদা কোনো বড় ক্ষমতা বা সুবিধার প্রতীক নয়। তারা চীফকে কোনো রাজস্ব বা খাজনা দেয় না। তবে তিনি প্রত্যেক বাড়ি থেকে প্রতি বছর এক ঝুড়ি চাল এবং এক কলসি মদ পাওয়ার অধিকারী। পূর্বে যুদ্ধে অর্জিত মালামালের সর্ববৃহৎ অংশ ছিলো তাঁরই। এদের প্রত্যেকটি গ্রাম বা রাষ্ট্রের অধিবাসী নিজস্ব এই বিশেষ নেতা ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার করে না। চীফের ক্ষমতা তাদের নিজ গ্রামের আকারের উপর নির্ভরশীল।[১৩] চীফ বা হেডম্যান বংশ পরম্পরায় হয়ে থাকে। বর্তমানে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায় এবং হেডম্যানকে তার ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও দেখা যায়।[১৪] তবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের আলোকে দেখা যায়, ত্রিপুরা সমাজে বড়ো কোনো সমস্যা দেখা দিলে তারা রাষ্ট্রের সহযোগিতা গ্রহণ করে।

৪. ত্রিপুরাদের ধর্মসংস্কৃতি, ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মাচার

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, আদিবাসীরা জীবনাচরণে কিছুটা কল্পনাপ্রবণ ও শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির।[১৫] তাদের ধর্মাচরণ, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতির মধ্যে এ মন্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ত্রিপুরারা নিজেদের তৈরি বিশেষ প্রতীক, বিশেষ স্থান প্রভৃতির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করে; যা তাদের ধর্মপালনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইনের মতে, ত্রিপুরাদের ধর্ম সহজ এবং তা প্রকৃতির ধর্ম। তারা পার্থিব উপাদানসমূহকে পূজা করে। তাদের মধ্যে কোনো একটা সর্বগ্রাসী স্বর্গীয় শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট এবং অনির্ণীত ধারণা আছে।[১৬] বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলার ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী হলেও বান্দরবন জেলার উসুই ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুসারে ত্রিপুরারা হিন্দু নামে পরিচিত হলেও মূলত তারা

---

[১৩] ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন, *বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী*, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা অনূদিত (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮), পৃ. ১০৯।

[১৪] তৃষ্ণা ত্রিপুরা, পিতা-মৃত তপনকুমার ত্রিপুরা, চাকুরীজীবী, বয়স-৪৪ (অবিবাহিতা), গর্জনতলী, রাঙ্গামাটি।

[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৫৪।

[১৬] ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন, *বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী*, পৃ. ১০৮।

জড়বাদী বা প্রকৃতিপূজারী। সমভূমিতে হিন্দু ধর্মের অগ্রগামী ধর্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে এসে তারা হিন্দু ধর্মের প্রভাবাধীন হয়ে ওঠে। এই মঙ্গোলীয় টিবেটোবর্ম বোডো জনগোষ্ঠীর লোকায়ত বিশ্বাস অনুসারে এবং ভাষ্য অনুযায়ী এদের বিভিন্ন নামের নিজস্ব দেবদেবী আছে। তথাপি হিন্দুদের কর্তৃক পূজিত দেবদেবীর নাম, আচার-আচরণ ও কার্যাদির সাথে মাঝেমধ্যে ত্রিপুরাদের আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই লক্ষণীয় যে, ত্রিপুরাদের দ্বারা পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে চৌদ্দ জন দেবতার সাথে হিন্দুদের চৌদ্দজন দেবতার মিল পাওয়া যায়। ত্রিপুরারা হিন্দু বা চাকমাদের মতো ব্রাহ্মণ না ডেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এবং তান্ত্রিক আচারে নিজস্ব পুরোহিত বা চন্তাই বা দেওরাই বা অচাই দ্বারা পূজার কার্য সম্পন্ন করে। ত্রিপুরাদের পূজিত চৌদ্দ দেবতা ও বৈদিক বর্ণিত দেবদেবীর সাদৃশ্য নাম নিম্নরূপ :

ক. সিবরাই (শিব), খ. সংগ্রাংমা (কালী), গ. সুকুন্দ্রায় (কার্তিক), ঘ. মুকুন্দ্রায় (গণেশ), ঙ. হাচুকমা (বসুন্ধরা), চ. তোয়বুকমা (জলদেবী/গঙ্গা), ছ. মাইনুকমা (লক্ষ্মীদেবী), জ. ইক্ষিত্রা (অগ্নি বা সূর্যদেব), ঝ. বিক্ষিত্রা (পবন দেব), ঞ. কালাকতর (মহাকাল দেব), ট. কালাক্ষী (যমদেব), ঠ. রন্দকা (কামদেব), ড. দন্তকা (কুবের), ঢ. বরিক (অশ্বিনী কুমারদ্বয়)।[১৭] গবেষণা এলাকা রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলি পাড়ার সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কিছু অংশে এরূপ শ্রেণীকরণের মাত্রা লক্ষ করা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনে ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। এসব উৎসবকে (ক) ধর্মীয় উৎসব এবং (খ) সামাজিক উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান প্রধানত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ত্রিপুরাদের ধর্ম ও উৎসবগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের সামাজিক উৎসবগুলো যেমন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমনি ধর্মমাত্রই উৎসবের পর্যায়ভুক্ত। ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যিক ধর্মসংস্কৃতি বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। আধুনিককালে অর্থাৎ ইংরেজ শাসন আমল থেকে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রয়োজনে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে এদের মূল ধর্মানুষ্ঠান একেবারেই মুষ্টিমেয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে প্রধানত হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-আচরণ। বর্তমান নিবন্ধে ত্রিপুরাদের ধর্মীয় উৎসব বা ধর্মসংস্কৃতির মধ্য থেকে সেই সব উপাদান উপস্থাপন করা হবে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাদের নিজস্ব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে।

গবেষণার স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায়, ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী পূর্বে শিকারজীবী হওয়ায় তাদের আরাধ্য দেবতাদের বৈশিষ্ট্য হিন্দু দেবতাদের থেকে ভিন্নরূপ। ত্রিপুরাদের প্রধান দেবতা বোডো বা বোড়ো দেবতা। মাতৃতান্ত্রিক ত্রিপুরাদের বিশ্বাস এই দেবতার আদর্শেই পৃথিবীর সৃষ্টি। এছাড়া এরা সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, মাটি প্রভৃতির পূজা করে থাকে। নাচ-গান, পশু বলি, নিজস্ব তৈরি মদ (চেক বা চোয়ানি) গ্রহণের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। ত্রিপুরারা প্রকৃতপক্ষে শৈব বা শিবের পূজারী। তাই শিব বা মহাদেবের স্ত্রী, সন্তান, অনুচর-অনুচরীবৃন্দ সবাই ত্রিপুরাদের দ্বারা পূজিত হয়। যেমন, শিবের স্ত্রী কালী বা মাকালী, সন্তান কার্তিক ও গণেশ, অনুচর-অনুচরী, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি – যারা হিন্দুদেরও উপাস্য। ত্রিপুরাদেরকে হিন্দুধর্মের অনুসারী জনগোষ্ঠী প্রমাণের জন্য দৈত্যগুরু যযাতি রাজার বংশধর বলা হয়েছে। তথাপি এদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজস্ব নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে নিজস্ব ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিজেদের ওঝা বা অচাই দ্বারা

---

[১৭] প্রভাংশু ত্রিপুরা, *ত্রিপুরা জাতি ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: গাইড প্রসেস কেয়ার, ২০০২), পৃ. ৩৯।

এরা দেবদেবীর পূজার্চনা করে। হিন্দুদের দেবদেবীর সাথে ত্রিপুরাদের দেবদেবীর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হলেও হিন্দুদের মতো ত্রিপুরাদের দেবদেবীর কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা মূর্তি বা প্রতিমা নেই।[১৮] ত্রিপুরারা ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই হিন্দুভাবাপন্ন হয় বলে ধারণা করা যায়। আবার এই মুসলিম শাসন আমলেই ত্রিপুরারা সামাজিক মান ও প্রতিপত্তির জন্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলো কি না, সে বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।[১৯] মূলত ত্রিপুরাদের মহারাজা হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁর প্রজা-সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর তাঁর রাজধর্ম বা রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রভাব পড়ে। আবার ত্রিপুরারা পূর্ব থেকে যে ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং যে সকল দেবদেবীর পূজা করতো সেসব দেবদেবীর সাথে হিন্দুদের পূজিত দেবদেবীর সামঞ্জস্য থাকার কারণে তারা সহজে হিন্দু ধর্মের আওতায় আসে। উল্লেখ্য, মঙ্গোলীয় বোডোরা অনেকটা জড়বাদী প্রকৃতিপূজারী ছিলো। বৃহৎ পর্বত, গভীর নদী, বড় বৃক্ষ, অদ্ভুত আকৃতির পাথর, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতিকে জড়বাদী বা প্রকৃতি পূজারীরা যেমন পূজা করতো, হিন্দুরাও তাই করতো। এক্ষেত্রে যেমন, হিন্দুদের দেবী মালক্ষী ত্রিপুরাদের কাছে মাইলুংমা/মাঁইজুংমা; হিন্দুদের মা-গঙ্গা ত্রিপুরাদের তৈমা; হিন্দুদের হিমালয় ত্রিপুরাদের নিকট সুমগ্রাংমা বা সংগ্রংমা প্রভৃতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির মাধ্যমে যে স্ব স্ব পরিচয় প্রকাশ করে থাকে, তা সহজেই বোঝা যায়। এ অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি উৎসবে ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নৃত্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পৌষে জঙ্গল কাটা থেকে শুরু করে, চৈত্রে জুম পোড়ানো, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বীজ বোনা, আষাঢ়-শ্রাবণে নিড়ানি, ভাদ্র-আশ্বিনে ফসল সংগ্রহ, কার্তিক-অগ্রায়ণে তিল ও কার্পাস সংগ্রহের কাজে এদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয়।[২০] এ সময়ে ত্রিপুরারা যেমন জুম নৃত্য ও গান পরিবেশন করে, তেমনি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎসবেও নৃত্য অবধারিত থাকে। ত্রিপুরাগোষ্ঠী পুরাতন বর্ষকে বিদায় এবং নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বুইসুক উৎসব বা বৈসু উৎসব; চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন থেকে নববর্ষের ৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত বিরতীহীনভাবে গরাইয়া দেবতার পূজায় আকাশ দেবতা গরাইয়া শিবকে উপলক্ষ করে গরাইয়া বা করাইয়া পূজা পালন করে। পাশাপাশি এ সময় তারা উন্নত ভোজ, নৃত্য ও নিজেদের তৈরি মদ পান করে থাকে।

---

[১৮] সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, *ত্রিপুরা পূজা পার্বণ* (রাঙ্গামাটি; উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, সালবিহীন), পৃ. ১৩।

[১৯] ঐতিহাসিক ভাবে জানা যায়, আর্য হিন্দুগণ উত্তর-পূর্ব ভারতের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীকে 'কিরাত' বলে ঘৃণার চোখে দেখতো। পরবর্তীকালে ত্রিপুরাদের শক্তিমত্তার কথা ভেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এসব অরণ্য পর্বতবাসী মঙ্গোলীয় বোডো ও কুকী চীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষত্রীয় হিন্দুর মর্যাদা দিয়ে হিন্দুরা আর্যীকরণ করে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল অবলম্বন করে। আর্য হিন্দুদের অনবরত প্রচেষ্টার ফলে মঙ্গোলীয় বোডোগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে সনাতন হিন্দু কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে ত্রিপুরারা ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এলেও তারা আর ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়নি। তবে ত্রিপুরাদের মহারাজার বংশকে মহাভারতের চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির বংশধর বলে পরিচিত করার প্রচেষ্টা চালালেও হিন্দুগণ মঙ্গোলীয় বোডো বা বোড়ো জনগোষ্ঠীর সাধারণ ত্রিপুরাকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুতে পরিণত করতে পারেনি। উদ্ধৃত, *তদেব*, পৃ. ১২-১৩।

[২০] শুভ্র জ্যোতি চাকমা সম্পা., *পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গীত ও নৃত্য* (রাঙ্গামাটিঃ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ২০১১), পৃ. ১০।

প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠী ঝড়, বন্যা, খরা অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় বোধ করতো। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ তারা বুঝতে বা জানতে পারতো না। ধীরে ধীরে এসব গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হতে থাকে। প্রাকৃতিক যেসব বিষয়ের উপর এদের জীবন নির্ভর করে, সেগুলোর আত্মা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান হয়ে দেখা দেয়।[২১] ফলে দৃশ্য বা অদৃশ্য শক্তির প্রতি তারা দেবত্ব আরোপ করে ধর্মকর্ম করতে থাকে। ত্রিপুরারা বিভিন্ন অপদেবতার পূজা অনুষ্ঠানের জন্য হিন্দুদের মতো কোনো মূর্তি বা প্রতিমা তৈরি না করলেও এরা বিশেষ পদ্ধতিতে নিজেদের মতো করে দেবতার প্রতীক তৈরি করে থাকে। এরা কাঁচা বাঁশ কেটে টুকরা টুকরা করে। টুকরা বাঁশের বাইরের পাশের গায়ে আঁচড় দিয়ে সাজিয়ে দেবতার প্রতীক তৈরি করে। এই প্রতীকগুলোর নাম সাধারণত দীপ, মারাই, লাগিরী, চুফফুং ইত্যাদি। পাহাড়ে এবং সমতলে বসবাসকারী ত্রিপুরাদের পারিবারিক, ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজকর্মের প্রতিচ্ছবিও এসব ধর্মীয় উৎসবে প্রস্ফুটিত হয়। ত্রিপুরাদের রয়েছে বৈচিত্র্যমণ্ডিত নানা উৎসব ও পূজা-পার্বণ। তারা নিজস্ব বর্ষপঞ্জিকা "ত্রিপুরাব্দ" নির্দেশিত তিথি লগ্নানুসারে উৎসব ও পূজা-পার্বণের কার্যাদি সম্পাদন করে। এরা কুষ্ঠি দেখে জন্ম তারিখ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য, এদের ধর্ম ও ধর্মাচারগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং যেখানে তাদের নিজস্ব নৃত্য অবধারিত থাকে। নিম্নে ত্রিপুরাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান পূজা-পার্বণ ও এসময়ে পালিত আচারাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

৪.১ কাথাররক পূজা বা পবিত্র গৃহ দেবতার পূজা

ত্রিপুরাদের কাথাররক পূজার বাংলা অর্থ পবিত্র গৃহ দেবতার পূজা বা মাঙ্গলিক পূজা। মূলত কাথাররক পূজাটি উৎসবের পর্যায়ভুক্ত। পূজাটি প্রতি বছর ত্রিপুরাব্দের তালউয়াং (শকাব্দের কার্তিক) মাসের শুক্লা নবমীতে এবং তালবুং (শকাব্দের অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্লা চতুদর্শী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সমাজে পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি, মানসিক শান্তি, গৃহ শান্তি, দাম্পত্য শান্তি, ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, বিবাহের লগ্ন, বিবাহের সময় সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কাথাররক পূজা উৎসবটি পালন করা হয়। এ পূজায় যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তা "মাঙ্গলিক নৃত্য" নামে পরিচিত। বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলার ত্রিপুরা সমাজে যেমন, গর্জনতলি, কেইল্যারমুড়া, মাঝির বস্তি, রিজার্ভ বাজার, রিজার্ভ মুখ, রাজস্থলী এলাকাগুলোতে এ পূজাটি পালিত হয়। নৃত্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তারা পূজাটির নাম দিয়েছে 'বোতল নৃত্য' পূজা। এদের মতে, দেশের সামগ্রিক মঙ্গল কামনায় এই পূজা এবং নাচটি করা হয় এবং এটি তাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব পূজা ও নৃত্য।[২২] ত্রিপুরাদের মতে এই পূজা না দিয়ে বছরের অন্য কোনো পূজার ব্যবস্থা করা যায় না। এই পূজায় আরাধ্য দেবতাগণের মধ্যে অন্যতম দেবতা সুকুন্দ্রায়-বুকুন্দ্রায়। এছাড়াও এ পূজায় অন্যান্য দেবতাগণের মধ্যে আছে মা-গঙ্গী বা গঙ্গা, বসন্বতী বা বসুমতী, বিনাকী বা লক্ষ্মী ভাণ্ডারী, চণ্ডীমা বা কালী, কারায়া-গরয়া (শিবের দুইপুত্র), যমদুগা-দুদুগা, মাঁইজুংসা-খুঁইজুংসা। পূজা অনুষ্ঠানের উৎকৃষ্ট সময় কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাস। পূজার বেদী বা ত্রিপুরা ভাষায় 'ওয়াথপ্' একটি হলে একটি মোরগ ও একটি মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে সুকুন্দ্রায়-বুকুন্দ্রায় দেবতাকে উৎসর্গ করতে

---

[২১] উৎপল বিশ্বাস সম্পা., *গণমুক্তি*, বাংলার লোকধর্ম সংখ্যা (ঢাকা: গণমুক্তি সংস্কৃতি পরিষদ, ২০০৮), পৃ. ১৯১।

[২২] সাগরিকা রোয়াজা, বয়স-৫৮ (বিবাহিতা), নারীনেতৃত্ব, ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি। বাসস্থান-গর্জনতলী।

হয়। আবার পূজার বেদী যদি দুইটি হয় তবে ৮টি মোরগ ও মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। পূজার বেদীর প্রতীক বা ওয়াথপ্ বাঁশ দিয়ে সাজানো হয়। পূজাটি ত্রিপুরাদের ওঝা বা চোন্তাই বা অচাই বা পুরোহিতকে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

গৃহদেবতা বা সার্বিক কল্যাণের জন্য যেসব দেবতার পূজা দেওয়া হয় সে পূজাগুলো দেওয়ার জন্য পান-সুপারি ও মদের প্রয়োজন হয়। এসব দ্রব্যাদি নিয়ে গৃহকর্তা ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীরই ওঝা বা পুরোহিতের বাড়িতে গিয়ে পুরোহিতকে তা দেন। যে নির্দিষ্ট দিনে গৃহস্থের বাড়িতে যে নির্দিষ্ট পূজাটি পালিত হবে, তা পুরোহিতকে জানিয়ে দ্রব্যগুলো দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরোহিতকে যে আচার মেনে চলতে হয় তা হলো, উক্ত পূজা সমাপনের উদ্দেশ্যে রাতে পুরোহিতকে হাত-পা ধুয়ে পবিত্র হয়ে স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পৃথক বিছানায় ঘুমাতে হয়। তবে তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে সে ঘুমের মধ্যে কী স্বপ্ন দেখেছিলো। কারণ, ঐ স্বপ্নের দ্বারা বোঝা যায় গৃহস্থ যে পূজা অনুষ্ঠান করবেন তার দ্বারা নির্দিষ্ট সেই মঙ্গল হবে কি না। পূজা শেষে পুরোহিত বা ওঝা কী স্বপ্ন দেখেছিলো এবং এর মাহাত্মই বা কী তা পুরোহিত কর্তৃক গৃহস্থ এবং উপস্থিত সবাইকে জানাতে হয়। উল্লেখ্য, পূজা অনুষ্ঠানের জন্য ওঝা বা অচাইকে পূর্বের দিন আধা বোতল মদ বা বাঁশের এক চোঙা মদ দিয়ে নির্দিষ্ট দিনের পূজার কাজ সম্পন্ন করতে হয়।[২৩] তখন ওঝাপ্রাপ্ত মদ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে পূতপবিত্র হয়ে স্ত্রী-সন্তান থেকে পৃথক বিছানায় ঘুমান। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, পূজা সম্পাদনের পূর্ব রাতে ওঝা যদি স্বপ্নে নিম্নোক্ত বিষয়াদি দেখেন তবে লক্ষণ ভালো অর্থাৎ গৃহস্থের মঙ্গল হবে বলে মনে করা হয়। এসব যেমন, (১) স্বপ্নের মধ্যে স্নান করলে, (২) মাছ ধরতে পারলে, (৩) সাধু ব্যক্তিদের সাথে কথা বললে, (৪) ফলমূল পেলে, (৫) কাপড়-চোপড় বা ছাতা পেলে, এবং (৬) স্বপ্নে বন্দুক পেলে। অপরদিকে ওঝা বা পুরোহিত স্বপ্নে (ক) মেয়ে ঘরে এলে, (খ) আগুন বা মৃত পশু-পাখি দেখলে, (গ) কেউ ঋণের টাকা আদায় করতে এলে, এবং (ঘ) বিচারক বা পুলিশ স্বপ্নে জবরদস্তিমূলক কিছু করছে দেখলে গৃহস্থের অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক পূজা পালনে ওঝাকে নাচতে হয়। যেকোনো পূজা সমাপ্ত হলে ফল এবং মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়। দেবতার উদ্দ্যেশে উৎসর্গীকৃত বলির মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে তা প্রসাদ হিসেবে উপস্থিতদেরকে খাওয়ানো হয়।

কাথাররক পূজা গৃহের অভ্যন্তরে ঘরের উঠানে বা স্রোতবাহী জলের উৎসস্থলে অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজা অনুষ্ঠানের অধিদেবতার নাম কার্তিক-গণেশ। কার্তিক-গণেশ যুগলকে ত্রিপুরা ভাষায় কাথাররক বলে। এ পূজায় যেমন বলির রুধির জন্য ১ জোড়া অনুপক্ষী ও ১টি বাগবল বলি দিতে হয়, তেমনি অন্যান্য উপকরণাদির মধ্যে আছে তুলা দিয়ে তৈরি করা একটি ফুলের মালা, একটি বানা (পতাকা), ১ সের আতপ চাল, ১ সের ধান, খই, আগুনের বাষ্পে সিদ্ধ করা কলা পাতার পিঠা, ১ বোতল মদ, পাঁচ টুকরা কাঁচা হলুদ, দেবতার প্রতীক বা ওয়াথপ্, মারাই, দিক্, পিড়া, ১টি কাপড়। বিবাহ অনুষ্ঠানে হলে এই পূজা সমাপনান্তে কনে পক্ষের একজন ও বর পক্ষের একজন 'কেঞ্জু কেনা' নামে মাথায় রক্ষিত মদের বোতলের উপর দীপশিখা জ্বালিয়ে ঢোলের বোলে নৃত্য পরিবেশন করতে হয়, যাকে কাথাররক নৃত্য বলে। বর-কনে উভয়ের মঙ্গল কামনা করে কাথাররক নৃত্যটি করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বর-কনে

---

[২৩] আলোচালের ভাত রান্না করে পিষে ঠাণ্ডা করে পচানো হয়। এরপর গাছের রস বা বিভিন্ন লতা-পাতা দ্বারা গুলি বা বীজ বা বড়িয়া বানিয়ে পেষা ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে ৩/৪ দিন মাটির বা সিলভারের তৈরি হাঁড়িতে মজিয়ে রাখা হয়। পরে এর সঙ্গে পানি মিশিয়ে একদিন রেখে আগুনের তাপ দিয়ে বাঁশের চোঙার মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে পাতন প্রক্রিয়ায় উক্ত তরল অন্য একটি মাটির হাঁড়ি বা কলসিতে জমিয়ে রাখা হয় – এটিই ত্রিপুরাদের তৈরি নিজস্ব মদ।

উভয় পক্ষের মধ্যে বোতল মাথায় নিয়ে নৃত্য করতে হয়। নৃত্যরত অবস্থায় বর বা কনে পক্ষের কারো মাথা থেকে বোতলটি পড়ে গেলে বর অথবা কনেকে সারাজীবন পরাজিত পক্ষের অধীন হয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি বরকে ব্যক্তি কনের প্রতি অনুগত হয়ে থাকতে হবে, কিংবা ব্যক্তি কনেকে বরের প্রতি অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

পূর্বে ত্রিপুরা রাজারা যুদ্ধযাত্রার আগে যুদ্ধে ভালো ফলের জন্য 'ত্রিপুরেশ্বরী' মন্দিরে কাথাররক নৃত্যের আয়োজন করতেন। এমনকি ত্রিপুরারা বিভিন্ন সময়ে মামলা-মোকদ্দমা বা রাজভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেও এ নৃত্যের আয়োজন করতো। এ নৃত্যের উপকরণাদির অর্থবহ তাৎপর্য হলো যেমন, জলপূর্ণ কলসী যা কর্মের প্রতীক; মদের বোতল যা শক্তির প্রতীক; প্রদীপ শিখা যা জ্ঞানের প্রতীক; ফুলের মালা যা ভক্তি বা আত্মসমর্পণের প্রতীক।[২৪]

৪.২ কের পূজা

কের পূজাটি কোনো একটি গ্রাম বা ৫/১০টি গ্রামের লোক একত্রে সম্মিলিতভাবে পালন করে থাকে। মূলত ত্রিপুরারা বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ, মামলা-মোকদ্দমা থেকে রেহাই পেতে; অর্থাৎ গ্রামের সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি থেকে রক্ষা পেতে কের পূজাটি ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী পালন করে থাকে। প্রতি বছর ত্রিপুরাব্দ তালতুক বা শকাব্দে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম সংগ্র ও চরা বা শনি-মঙ্গল বারে কের পূজাটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি সর্বজনীন বারোয়ারি পূজা উৎসব।

কের পূজার দেবদেবী ৫২ জন। অর্থাৎ এ পূজাটি ৫২ জন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে করা যায়। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন সুকুন্দ্রায়-বুকুন্দ্রায়, বিধি আইসাংমা-নাইতং মাতাই, মা গঙ্গী, বসম্বতী, টং মাঙাই, টংখ্রু দেব, তৈবুকমা, লকতারায়, বর্মারাজা, বায়ুং রাজা, উড়িরাজা, সিজঁর রাজা, বিনাকী, চণ্ডীমা, নবাব রাজা, বাংলা রাজা, বরমালি, সংগ্রুমা প্রভৃতি। এই সকল দেবতাদের প্রত্যেকের প্রতীক হিসেবে একটি দীপ বা মারাই পূজার বেদীতে পুঁতে দিতে হয়। প্রত্যেক দেবতার জন্য পৃথক পৃথকভাবে একটি করে মোরগ বা মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে উৎসর্গ করতে হয়। কের পূজায় সাধারণত পূজার বেদী বা 'ওয়াথপ্' ছয়টির প্রয়োজন হয় যা ছয়জন দেবতার জন্য তৈরি হয়। এঁরা হলেন : কাথাররক, তৈবুকমা, বিনাকী-চণ্ডীমা, বুড়াসা-বরমালী, কারায়া-গরায়া এবং যমদুগা-দুদুগা। আর লাগিরী বা প্রতীক দেবতার প্রয়োজন হয় পাঁচটি। যেমন, বুড়াসার জন্য একটি; কারায়া-গরায়া বা কুসুমরক-এর জন্য দুইটি, যার একটির মধ্যে সাদা তুলা বাঁশের টুকরার তিন জায়গায় সাদা সুতা দিয়ে জড়ানো, আর অন্য তিন জায়গায় সাদা তুলার উপর কালো সুতা দিয়ে জড়ানো; যমদুগা-দুদুগার জন্য দুইটি যা বাঁশের টুকরার তিন জায়গায় সাদা তুলার উপর লাল সুতা দিয়ে জড়ানো বা পেঁচানো হয়।

বরমালী বুড়াসার জন্য একটি বড় শূকর বলি দিতে হয়, যা গ্রামবাসী চাঁদা উঠিয়ে ক্রয় করে থাকে। শূকরটি বলি দেওয়ার পর মানজা বা মাচাং তৈরি করে শূকরের মাথা, একটি রান, একটি পা ও লেজের গোড়া প্রদেশের মাংসের এক অংশ কেটে নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজন হয় একটি মুরগির বাচ্চা। এসব পশু-পাখির মাংস পূজা স্থানে রান্না করে সকলে মিলেমিশে খাওয়া হয় এবং সঙ্গে নিজস্ব নাচ ও মদ পান করা হয়। আবার মা গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ওয়াথপ্ পাঁচটিতে এবং লকতারার জন্য মুরগির বাচ্চা পুড়িয়ে উৎসর্গ করা হয়। এসব উৎসর্গের পরে অচাই বা ওঝাকে লাগিরী গরজা বা বড় লাগিরীটি হাতে নিয়ে পূজার বেদীর সামনে

---

[২৪] সুগত চাকমা সম্পা., *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় উৎসব ও বিবাহ*, পৃ. ৫৩।

নাচতে হয়। সাথে বলিদানকারী বা তানচরায় বা দামেরসাকে নকফাং বা পূজা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক মালিককেও নাচতে হয়। তাছাড়া নিজ গ্রাম বা অন্যান্য গ্রাম থেকে যারা চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে এই পূজায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে সর্দার পর্যায়ের গণ্যমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ এক জনকেসহ মোট পাঁচ জনকে পূজার বেদীর সম্মুখে নাচতে হয়। পূজার বলির মাংস উপস্থিত সকলেই কেরখায় বা পূজাস্থানে রান্না করে খায়। খাওয়া শেষে খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট থাকলে পূজায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে তা পাতায় বেঁধে এক মোচা করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

কের পূজায় আচরিত বিষয় হলো ওঝা বা অচাই, বলিদানকারী, আনুষ্ঠানিক পূজার মালিকের গুরুর প্রণাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত গ্রামে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। আবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র কোথাও কেউ যেতেও পারে না। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, এ সময়ে কেউ যদি ভুলেও এই গ্রামে প্রবেশ করে তবে পূজার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হয়। এই পূজা চলার সময়ে যদি গ্রামের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয় বা কোনো নবজাতকের জন্ম হয় তাহলেও পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পূজা সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণকে মদ ও পানি ঢেলে উৎসর্গ করে পূজাস্থলে হাজির হওয়ার জন্য দেবতাগণকে আহ্বান জানাতে হয়। আর পূর্বে উল্লিখিত কাথাররক পূজা পালনে ওঝাকে পূজা সম্পন্নের আগের রাতে যা যা মানতে হয়, এক্ষেত্রেও তাই করতে হয়। ত্রিপুরাদের বিভিন্ন দফাভেদে বা উপদল ভেদে পূজার রীতি-পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৪.৩ গরয়া দেবতার পূজা বা পরাকাইনাই পূজা বা শিব পূজা

ত্রিপুরা সমাজে অসুস্থ হয়ে কোনো ব্যক্তির যদি হাত-পা অবশ হয়ে যায়, হাত-পা ফুলে যায় বা হঠাৎ শরীর কমে যাওয়া ঘটে থাকে তাহলে গরয়া দেবতার বা পরাকাইনাই পূজা দিতে হয়। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস মতে গরয়া হলেন কর্ম ও প্রেমের দেবতা। ব্যবহারিক জীবনে কৃষিকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ত্রিপুরারা গরিয়া নৃত্যোৎসব পালন করে উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। সাধারণত বৈসু বা ত্রিপুরাদের প্রধান জাতীয় উৎসবের দিনে গরিয়া নৃত্য উৎসবটি পালন করা হয়।

গরয়া পূজার দেবতার নাম শ্রীকারায়, শ্রীগরয়া, গুরুসনমা। পূজার নিয়ম হলো, যে বাঁশের ছিদ্রের ভিতর একটি ডিম ঢুকানো যেতে পারে এমন একটি বড় বাঁশ সংগ্রহ করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে কেউ যদি প্রথম বার পূজাটি পালন করতে গিয়ে বাঁশের দৈর্ঘ্য আড়াই হাত নেন, তবে পরের বছরগুলোতে প্রতিবার পূজাটিতে বাঁশের দৈর্ঘ্য ১ হাত করে বৃদ্ধি করে নেওয়া হয় এবং উক্ত বাঁশটি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এছাড়া দুইটি চুবা অর্থাৎ গিরাযুক্ত বাঁশে এক চোঙা মদ জগরা বা বুতুক দেবতার প্রতীকের বাম পাশে রাখা হয় এবং ঠিক অনুরূপভাবে বুতুক দেবতার ডান পাশেও এক চোঙা মদ রাখা হয়। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, দেবীগণ দেবতাদের বামে ও মানুষের ডান পাশে বসে থাকেন। পূজার প্রথমে দেবতার ডানে একটি বাতা বা খাগড়াজাতীয় বাঁশ মাটিতে পুঁতে এর গোড়ায় খৈ ও চাল রেখে একটি মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়।

গরয়া পূজার সামগ্রী থাকে বিভিন্ন রকম। যেমন, তেলে ভাজা চালের ১৭টি পিঠা (আওয়ান) এবং পানিতে গুলানো ফিরনি জাতীয় চালের পিঠা (আওয়ানল্প)। এই ১৭টি পিঠার মধ্যে দেবতার ডানে ৫টি, বামে ৫টি এবং দেবীগণকে উদ্দেশ্য করে ৭টি দিতে হয়। আর ফিরনি জাতীয় মিষ্টি তিন ভাগ করে একভাগ গৃহস্থকে, এক ভাগ ওঝা বা পুরোহিতকে দিতে হয়। তৃতীয় ভাগটি উপস্থিতদেরকে খাওয়ানো হয়। দেবীগণকে বাঁশের তৈরি চাটাই বা ছিদ্রযুক্ত মাদুরে তৈরি আসন করে দিতে হয়। গুরুসনমা হলো দেবতা কারায়ার স্ত্রী, যাকে একটি মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে উৎসর্গ করতে হয়। দেবতার প্রতীক বাঁশের গোড়ায় কারায়ার জন্য একটি মোরগ বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া

দেবতা গরয়ার জন্য একটি মোরগ বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। এ পূজায় সর্বপ্রথমে গঙ্গীর পূজা দিতে হয়। দেব-দেবীর প্রতীক হিসেবে প্রত্যেক দেব-দেবীর জন্য একটি করে দীপ (দেবতার প্রতীকের নাম) বা মারাই তৈরি করতে হয়। যেদিন পূজা দেওয়া হয় সেদিন থেকে পরপর তিন দিন বাঁশের ডানে ও বামে দুটি থারুংমা বা প্রদীপ জ্বালাতে হয়। অতঃপর ডিমসহ বাঁশটি উপড়িয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রদীপ এবং মারাইটি বাড়িতে এনে উঠিয়ে রাখতে হয়। পূজা পালনের পূর্বে ওঝা বা পুরোহিতকে কাথাররক পূজায় উল্লেখিত গৃহস্থ কর্তৃকযেমনিভাবে পূজার বিষয়ে জানাতে হয় এবং ওঝাকে যে আচার মানতে হয়, এ পূজার ক্ষেত্রেও সেরূপ।

৪.৪ খোয়া সুমানি পূজা

ত্রিপুরা পরিবারের সকল সদস্যের আপদ-বিপদ, বালা-মসিবত দূর করে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য খোয়া সুমানি পূজাটি পালন করা হয়। পূজাটি সাধারণত বৈশাখ মাসে বা প্রয়োজনানুসারে পালিত হয়। খোয়া সুমানি পূজাটিতে দুই ধরনের পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন: (ক) খোয়া গরজা বা বড় খোয়া; এবং (খ) খোয়া গিরা বা ছোট খোয়া। এই দুই ধরনের পূজা পালনের পদ্ধতি ক্রমানুসারে নীচে বর্ণনা করা হলো :

(ক) খোয়া গরজা বা বড় খোয়া : খোয়া গরজা বা বড় খোয়া পূজানুষ্ঠানের জন্য নদীর তীরে ৭টি মুরগির বাচ্চা বলি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে রকম ভেদে আপদ-বালাই দূর করতে পূজানুষ্ঠানটি যদি বিকেলে সম্পন্ন করতে হয় সেক্ষেত্রে একটি মুরগির বাচ্চা; সকালে পূজানুষ্ঠান হলে নদীর তীরে একটি পাঁঠা বলি; এবং পূজানুষ্ঠান রাতে হলে নদীর তীরে একটি শূকর ওয়াথপ্ বা দেবতার প্রতীকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয়। বলির মাংসের তরকারি উপস্থিত সকলকে খাওয়াতে হয়। নদীর তীরে সাতটি দীপ ও সাতটি বাঁশের খাপ বা চোঙা পুঁতে সেখানে সাতটি মুরগির বাচ্চা বলি দিতে হয়। খোয়া গরজায় প্রতীক দেবতা ঈশ্বর মাধুরী, সুকুন্দ্রায়-বুকুন্দ্রায়, মা গঙ্গী, চণ্ডীমা, প্রমালী প্রসাধন সনাকুমরা, দারুখা, চৌদ্দ দেবতা, কারায়া-গরয়া, যমদুগা-দুদুগা এবং মইচ্যিয়া রাউখাল্যা।

পূজাটি পালনে শুকনা লাউয়ের খোল বা কোনো মাটির পাত্রে কুচাইপানি বা পবিত্র পানি, কড়ি, পয়সা ও এক টুকরা লৌহ দিতে হয়। পরিবারের সদস্যদের বসার জন্য নদীর তীরে বাঁশ বিছিয়ে বেঞ্চের মতো তৈরি করে (বাঁশ উল্টা করে আগাটি মাটির নীচে পুঁতে তিন স্তর বাঁশের উপর পাঁচ জোড়া বা সাত জোড়া বাঁশবেঁধে) সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে ক্রমান্বয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে নদীর ভাঁটার দিক থেকে জোয়ার বা উজানের দিকে বসতে হয়। পূজা শেষ হলে পুরুষ জাতীয় বৃক্ষের চত্রা পাতা (মাংজিংবা) এবং বলিকৃত মুরগির বাচ্চার মাথা ঘরের সিঁড়ির গোড়ায় পুঁতে দিতে হয়। উক্ত স্থানে বাঁশের চলা বা চেলা দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়, যাকে টিপরা ভাষায় 'খংলল' বলে।

অপরদিকে বিপদ-আপদ দূর করতে পাঁঠার বাচ্চা বলির প্রয়োজন হলে পাঁঠার বাচ্চাটিকে পরিবারের সকল সদস্যদের চারপাশে প্রদক্ষিণ শেষে নদীর ভাঁটার দিকের অবস্থানে রেখে আসতে হয়। পূজার দেবতার প্রতীকটি (বাঁশের তৈরি) মাটিতে পোঁতার সময় প্রতীকের পিঠটি গ্রামের দিকে রেখে পুঁততে হয়। পূজা শেষে একটি মুরগির বাচ্চা, এক বোতল মদ, একটি টাকা, তিনটি পিঠা ও অল্প পরিমাণ চাল ওঝার হাতে দিতে হয়। ওঝা বা অচাই গৃহস্থ বা পূজার মালিককে দীর্ঘায়ু (আয়ুক থায়ুক) হওয়ার বর বা আশীর্বাদ দিয়ে থাকে। আর অচাইকে দেওয়া চাল দশটি পূজার থালায় দশটি পাতার উপর রাখতে হয়। মুরগির বাচ্চাটির পা কেটে প্রত্যেক পূজার থালায় রক্ত দিতে হয়। বাচ্চাটির মাথার উপরের পালক উপড়িয়েও এসব থালায় রাখতে হয়। ওঝা ১০টি পূজার থালা দশ দেবতার নামে প্রস্তুত

করে চাল এবং তুলা দিয়ে বিপদ-আপদ দূর করতে গৃহস্থকে বর দেয়। এক্ষেত্রে ওঝা মন্ত্র পাঠ করেন ৫টি। এসব হলো বাংতুক বা প্রতীক তৈরিতে মন্ত্র, বিপদ দূরের মন্ত্র, প্রতীকটি মাটিতে পোঁতার মন্ত্র, মুরগির মাথা মাটিতে পুঁতে রাখার মন্ত্র (পূর্বে এ সময় মুরগির মাথায় বাঘের দাঁত ঢোকানো হত) এবং পরিবারের সকলকে ঐ মাটি পাড়িয়ে ঘরে ওঠার সময়কার মন্ত্র। ওঝা নদীর তীরে যাওয়ার আগে ঘরে রেখে যাওয়া চোঙায় কুচাইপানি বা পবিত্র পানি পরিবারের সবার শরীরে এবং ঘরের সর্বত্র ছিঁটিয়ে দেয়। সবশেষে ওঝা পরিবারের সকল সদস্যের মাথার উপর এবং নিজের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁশের চোঙাটি ফেলে দেয়।

(খ) খোয়া গিরা বা ছোট খোয়া : খোয়া গিরা বা ছোটো খোয়া পূজা পালনে নদীতে একটি খাগড়া (লবং) পুঁতে তাতে সুতা দিয়ে তুলা বেঁধে মালার মতো তৈরি করে বেঁধে দেওয়া হয়। খাগড়ার ফাঁকে কলাপাতার টুকরা গুঁজে সে পাতায় চাল বা খৈ দিতে হয়। এরপর মা গঙ্গীর উদ্দেশ্যে একটি মোরগ বলি উৎসর্গ করতে হয়। উল্লেখ্য, খোয়া গিরা পূজার দেবতা নয় জন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম চণ্ডীমা, প্রমালী সাধন সনাকুমরা (বুড়াসা), দারুখা, যমদুগা-দুদুগা ও মইচ্যিয়া রাউখাল্যা।

খোয়া গরজা বা বড় খোয়ার মতো নদীর তীরে পূজার নিয়মানুসারে পরিবারের সদস্যদের জন্য বাঁশ দ্বারা তৈরি বেঞ্চের আসন করতে হয়। নদীর তীরে মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে একটি দীপ এবং এর পাশে একটি মুরগির বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। এছাড়া প্রমালী সাধন-সনাকুমরার (বুড়াসা) জন্য একটি দীপ ও একটি চোঙা পুঁতে সেখানেও একটি মুরগির বাচ্চা বলি দিতে হয়। নদীর তীরে যেসব মুরগির বাচ্চা বলি দেওয়া হয়, এ পূজায় তা খাওয়া নিষেধ। তবে মোরগ বলি হলে তার মাংস এ পূজায় খাওয়া যেতে পারে। একটি ডিমের খোলসের উপর অঙ্গার বা কাঠকয়লা দিয়ে বাঘের ছবি এঁকে এর পিঠে বুড়াসার মূর্তি আঁকতে হয়। এরপর উক্ত ডিমের খোসাটি পরিবারের সদস্যদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়ে বিপদ দূর করা হয়। ডিমের খোসাটি নিয়ে ওঝাকে মন্ত্র পড়তে পড়তে নদীর ভাঁটার দিকে যেতে হয়। তবে পূজানুষ্ঠানে যারা থাকে তাদেরকে ভাঁটার দিকে না তাকিয়ে জোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ওঝা সকল সদস্যের চারপাশে ডিমের খোসাটি প্রদক্ষিণ করিয়ে পূজায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি করে কড়ি, ওঝার নিজের নামে একটি কড়ি ও এক আনা পয়সা বাংতুক বা দেবতার প্রতীকের ভিতরে প্রবেশ করান। গৃহস্থের ঘরসহ নিকটবর্তী ২টি ঘরের চালে পবিত্র পানি ছিঁটানো হয়। এরপর চাখানা বা এক জাতীয় ধাঁরালো পাতাযুক্ত উদ্ভিদের পাতা এবং খামখা বা ছোট জাতের ডুমুরের পাতা আল্লোয়া বা মাড়মুক্ত সুতা দিয়ে গুচ্ছাকারে বেঁধে বাংতুক পাত্রের মধ্যে এক গুচ্ছ এবং পবিত্র পানি ঢোকানো একটি চোঙায় অপর একটি গুচ্ছ রাখতে হয়।

নদীর তীরে যাওয়ার পূর্বে পূজার নিয়মানুসারে ঘরের মধ্যে চাখুই বা ক্ষার জাতীয় দ্রব্য, মুখুই বা টক জাতীয় দ্রব্য, মুইফ্রাই বা পুঁইশাক, শাকুমু বা শামুক রেখে যাওয়া যাবে না। এছাড়া পূজাস্থানে যাওয়ার আগে ঘরে কোনো জ্বলন্ত আগুন থাকলে তা নিভিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া ঘরের মাচানে ওঠার সিঁড়ি উল্টিয়ে রেখে যেতে হয়। ঘরের সিঁড়ির গোড়ায় এক টুকরা বাঁশের ফালির দুমাথা মাটিতে পুঁতে একটি ঘেরা তৈরি করে রেখে যেতে হয়, যাতে সেখানে কেউ না উঠতে পারে। ত্রিপুরা ভাষায় একে 'খংলল' বলে। পূজাস্থানে পরিবারের সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে এবং আধা বোতল মদ দিয়ে ওঝা প্রতীক দেবতা বা বাংতুককে মন্ত্রপূত করে থাকে। পূজাস্থানে উপস্থিত কেউ কাউকে এ সময়ে স্পর্শ করতে পারবে না। পূজা শেষে ওঝা চোঙায় বাংতুক-এর যে পানি রেখে গেছে তা ঘরে ছিঁটিয়ে দিতে হয়। উপস্থিত সবাইকে স্নান করে বাড়িতে ফিরে এসে এক ছিলিম পরিমাণ তামাকের মূল্য দিয়ে এবং গ্রামের অন্য কারোর ঘর থেকে আগুন ক্রয় করে আনতে হয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক পূজায় পালিত নৃত্যের মতো এক্ষেত্রেও নৃত্য পালিত হয়ে থাকে।

৪.৫ খাং দেবতার পূজা বা খাংমাতাই বমানি

ত্রিপুরা ভাষায় কুলুম বা লুম্মানি বা ভয় পেয়ে জ্বর এলে, শরীরে ব্যথা-বেদনা হলে, শূল বা বাত হলে, অচেতন, ঘুমের ঘোরে অবচেতনে কথা বললে এবং পা ব্যথা হলে ত্রিপুরা সমাজে কোনো অপদেবতার কুদৃষ্টি পড়েছে বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে তন্ত্রমন্ত্র ও কবচের ব্যবস্থা করতে খাং দেবতার পূজা করা হয়। এই পূজার দেব-দেবীর নাম মা গঙ্গী। মা-গঙ্গী দেবতার জন্য একটি ছাগল বা ছাগলের পরিবর্তে একটি মোরগ বলি দিতে হয়। নদীর তীরে যে সকল দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠান করা হয় যেমন বুড়াসা বরমালী বিখিত্রায় (ওয়াথপ্ বা দীপ লাগে একটি), সংগ্রংমা বা সুমগ্রাংমা (ওয়াথপ্ লাগে একটি), কারায়া-গরয়া (ওয়াথপ্ লাগে একটি), যমদুগা-দুদুগা (ওয়াথপ্ লাগে একটি)। এঁরা নদীর দেবতা বিধায় এসব পূজা নদীতে পালন করতে হয়। আইসাংখ্যাং নাইরাং দেবতার জন্য একটি থালা ও একটি টেরা বা জগরা জাতীয় ডাঁটাযুক্ত ঝুড়ির প্রয়োজন হয়। রূপচান মাঝির (দেবতা) জন্য তিন টুকরা বাঁশের তৈরি ভেলা এবং একটি ডিম দিতে হয়। বুড়াসা দেবতার পূজার জন্য একটি শূকর ও একটি মুরগির বাচ্চা বলির প্রয়োজন হয়। সংগ্রংমার জন্য একটি মুরগির বাচ্চা এবং কলা গাছের বাকল দিয়ে প্রস্তুত করা চাখুই মুইক্র বা ক্ষার জাতীয় তরকারি রান্না করে চৌদ্দটি থালায় বা পাতায় দিতে হয়। কারায়া-গরয়ার জন্য দুইটি, যমদুগা-দুদুগার জন্য দুইটি করে মুরগির বাচ্চা বলি দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

খাং দেবতার পূজায় পাঁচটি লাগিরী বা প্রতীক দেবতার দরকার হয়। রান্না করা পাত্রের নীচের অংশের কালি একটি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় নিয়ে বুড়াসার মূর্তি এঁকে লাগিরীতে ঝুলিয়ে দিতে হয়। এতেও যদি কোনো ব্যক্তির জ্বর বা অসুখ ভালো না হয়, তবে সেক্ষেত্রে 'তৈ সাকাল' বা 'ডাইনী গঙ্গী'র পূজা দিতে হয়।

পূজা পালন পদ্ধতিটি এরূপ, নদীর তীরে একটি বাঁশের টুকরাকে চার ভাগ করে চিরে চেলাগুলো উল্টা করে কাঁদায় পোঁতা হয়। এটি দেখতে অনেকটা লাউয়ের ফুলের মতো দেখায়। এর সামনে ডুমুর গাছের ডাল বা তিন ফালি বাঁশ দিয়ে ছোট মাচান ঘর তৈরি করে সেখানে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা একটি ঝুড়ি বসাতে হয়। ঝুড়িটির পাশে একটি খাগড়া বা লবং মাটিতে পুঁতে সেখানে সুতায় বাঁধা একটি তুলার মালা বা 'খুতুলুং' বেঁধে দিতে হয়। নদীর তীরে একটি দীপ পুঁতে দিতে হয়। দীপের সামনে একটি মোরগ বলি দিয়ে দেবতার নামে উৎসর্গ করতে হয়। যদি অসুস্থ ব্যক্তির অসুখ দিনের বেলা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই পূজানুষ্ঠান করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে একটি বড় মোরগ বলি দিয়ে মোরগটি অসুস্থ ব্যক্তির মাথার উপর দিয়ে মাথা স্পর্শ না করিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হয়। এক্ষেত্রে শুধু ঝুড়িটি মাথায় স্পর্শ করালে চলে। মোরগ বলি দিয়ে ঘরে এনে রান্না করে সকলে মিলে খেতে হয়। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তির অসুখ রাতে বৃদ্ধি পায় বা অসুখটি প্রথম হয়ে থাকে তবে ছোট আকারের মুরগির বাচ্চা বলি দিলে চলে। এক্ষেত্রে ঝুড়িতে মুরগির বাচ্চাটি রেখে অসুস্থ ব্যক্তির মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাথা স্পর্শ করে পূজাস্থানে নিতে হয়। মুরগির বাচ্চাটি বলি দিয়ে আগুনে ছোঁয়ায়ে আবার তা ঝুড়িতে রাখা হয়।

পূজায় উৎসর্গ করা বলি দেওয়া মুরগি বা মোরগের অন্ত্র পরীক্ষা করে পূজার শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। উৎসর্গকৃত মোরগ বা মুরগির গুহ্যদ্বারের নিকটে কেটে পেটের ভিতর থেকে সযত্নে অতি সাবধানে অন্ত্রটি বের করে এনে ত্রিপুরাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়। অন্ত্রটি যদি রক্তযুক্ত হয়, কালো বা শক্ত বা নরম হয় তবে অসুস্থ ব্যক্তির অসুখ ভালো হওয়ার জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হয়। আর যদি অন্ত্রটিতে রক্তের ফোঁটাযুক্ত দাগ দেখা যায় তবে বর্তমান পূজায় উৎসর্গ করা প্রাণীর চেয়ে আরো বড় কোনো প্রাণী উৎসর্গ করে বলি দিতে হবে বলে মনে করা হয়। আবার অন্ত্রটি

যদি শক্ত ও সাদা রং-এর এবং পরিপূর্ণ ও পুষ্ট হয় তবে ভালো বা মঙ্গল লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে ওঝার ডানের অন্ত্র দুটির সংযোগকারী ঝিল্লি বা পর্দা যদি ছেঁড়া দেখা যায় তবে অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতাকে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। আর যদি ওঝার বাম দিকের অন্ত্র ছেঁড়া হয়, তাহলে দেবতার আরো বেশি কিছু দাবি আছে বলে মনে করা হয়। এসব পালিত আচার এবং বিশ্বাস ত্রিপুরাদের একান্তই নিজস্ব। এ পূজা পালন শেষেও নৃত্য উৎসব হয়ে থাকে।

৪.৬ মুলি রমানি পূজা

ত্রিপুরাদের মুলি রমানি পূজাটি মূলত 'মুলি' দেবতার পূজা। মুলি রমানি পূজাটি শিশুদের শৈশবকালীন অসুখ, জ্বর, থেকে থেকে গায়ের রং বদলানো (কখনো লাল, কখনো কালো, কখনো সবুজ) এবং এসব থেকে পরিত্রাণ পেতে মুলি রমানি পূজাটি পালন করা হয়। এ সময় যেসব দেবতার পূজা দিতে হয় তাঁরা হলেন মা-গঙ্গী, মা বসম্বতি বা বসুমতী, বরমালি, মোআনি, কারায়া-গরয়া, যমদুগা-দুদুগা, রিখিদাই পাখিদাই, চণ্ডী-ঠাগুরাই, দারুখা। বরমালি দেবতার জন্য একটি ছাগল বলি দিতে হয়। অবশিষ্ট সকল দেবতার জন্য একটি করে মোরগ বা মুরগির বাচ্চা বলি দিতে হয়। এ পূজা পালনে প্রথমে নদীর তীরে একটি মোরগ বলি দিতে হয়। কাছাকাছি যদি নদী না থাকে, তবে একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে পানি দিয়ে গর্তের পাশে একটি খাগড়া পুঁতে একটি খুতুলুং বা তুলার মালা বেঁধে মোরগটি বলি দিতে হয়। এরপর বসম্বতির নামে একটি দীপ পুঁতে সেখানে একটি মুরগির বাচ্চা বলি দিতে হয়। এর পাশে বরমালির জন্য একটি 'ওয়াথপ্' বসিয়ে সেখানে একটি ছাগল বলি দিতে হয়। অতঃপর উল্লিখিত প্রত্যেক দেবতার জন্য একটি করে দীপ বা প্রতীক পুঁতে প্রত্যেক স্থানে একটি করে মুরগি বলি দিতে হয়। পূজা শুরুর পূর্বে গোলাকৃতি একটি মাটির পাত্রে পাঁচটি কড়ি ও এক টুকরা লোহার প্রয়োজন পড়ে। আর সাথে থাকে আধা বোতল মদ।

গোলাকৃতির মাটির পাত্রের গলায় মাড় ছাড়া সাদা সুতা পেঁচিয়ে সেখানে ঐ পাঁচটি কড়ি ও লোহার টুকরা রাখা হয়। সন্তান প্রসব শেষ হয়ে গেছে এমন একজন মহিলার সাহায্যে এক দিনের ভিতর তাঁতে একটি ছোট কাপড়ের টুকরা বুনিয়ে নিতে হয়। পাত্রটি মুখবন্ধ করার জন্য সাত টুকরা পাতা (লাইস্রাব) ও সাতটি বাঁশের বেত দিয়ে বাঁধতে হয়। নতুন কাপড়ের টুকরাটি না কেটে সম্পূর্ণটি দিয়ে লোহার টুকরাটি গাছে ঝুলিয়ে দিতে হয়। এরপর এক টুকরা কাপড়ে কয়লা দিয়ে বুড়াসা দেবতার মূর্তি (মারাঙ্গা) এঁকে কাপড়টি একটি লাগিরীতে (দেবতার প্রতীক, যা তুলা জড়ানো-সুতা পেঁচানো বাঁশের টুকরা) ঝুলিয়ে দিতে হয়। যে মহিলা নতুন কাপড়টি বুনেছে তাকে দিয়ে কবচ তৈরি করার জন্য পূর্বেই প্রয়োজনীয় সুতাও কেটে নিতে হয়। পূজা শেষ হলে ছাগল ও মুরগির বাচ্চাটি পুড়িয়ে পুরাটাই দেবতার পাতে দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। ছাগলটির পায়ের অগ্রভাগ ও মাথাটি একটি মান্জা বা মাচানের মতো তৈরি করা জায়গায় দেবতাকে দিতে হয়। এভাবে পাতে দেওয়ার পর পানি দিয়ে উৎসর্গ করতে হয়। এরপর 'চুবা' উৎসর্গ করা হয়। রান্না করা ভাতের সাথে মদ মিশিয়ে এই চুবা তৈরি করা হয়। অতঃপর বর বা আশীর্বাদ নেওয়া হয়। একটি পাতায় অল্প পরিমাণ ভাত ও মুরগি বা ছাগলের মাংসের কিছু অংশ নিয়ে ভাতের থালা বা মাইখালায় তৈরি করে একটি খাপ বা চোঙায় মদ দিয়ে 'আসি কারর' বা আশীর্বাদ করতে হয়।

মুলি রমানি পূজায় পাত্রে রাখা কড়িগুলো নিয়ে প্রথমে ওঝা বা অচাইকে খেলতে হয়। ক্রমান্বয়ে যার নামে পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে তাকে খেলতে হয়। অসুস্থ সন্তানের মাকেও খেলতে হয়। খেলার সময়ে সেই পাঁচটি কড়ির মধ্যে যদি সবগুলো চিত হয়ে পড়ে অথবা সবগুলোই উপুড় হয়ে পড়ে, তবে লক্ষণ ভালো মনে করা হয়। আর যদি এই দুইটির কোনোটির ব্যতিক্রম ঘটে তবে খারাপ

লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই যে ব্যক্তি কড়ি খেলবে তাকে যতক্ষণ ভালো লক্ষণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলতে হয়। খেলা শেষ হলে কড়িগুলো নিয়ে একটি ছোট পাত্রে রেখে সেখানে পানি ঢেলে লাইস্রাব বা সাতটি পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে বাঁশের বেত দিয়ে সাতবার বেঁধে দেবতার বেদীর সম্মুখে খোঁড়া গর্তে পুঁতে ফেলতে হয়। এরপর সেখানে ভাত-তরকারি রেঁধে সকলে খেয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এক্ষেত্রে ফেরার সময় সবাইকে আগে পাঠিয়ে সন্তানটির মা-বাবা ও ওঝাকে শেষে আসতে হয়।

তকসা মাইখালাই দেওয়ার সময়ে গৃহস্থকে পূর্বে বর্ণিত জিনিসগুলো ওঝাকে দিতে হয়। ওঝাকে একটি পাতা নিয়ে সেখানে চাল দিয়ে দশটি পূজার থালা তৈরি করতে হয়। এই দশটি দেবতার পূজার মধ্যে মুলি দেবতা নয় জন এবং একজন ঈশ্বর মাধুরী। সেখানে মুরগির বাচ্চার রক্ত, মুরগির বাচ্চার মাথার পালক, পানি ও মদ সহযোগে দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয়। এরপর কার্পাস তুলা, চাল আর পানি নিয়ে নির্দিষ্ট অসুস্থ ব্যক্তিটির মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়। অতঃপর বর বা আশীর্বাদ উঠিয়ে দেওয়া হয়। টাকা আর আসনের কাপড় ওঝার হাতে নিতে হয়। ভাতের থালা আর মুরগির বাচ্চাটি গৃহস্থকে আয়ুকথায়ুক বা আয়ু হিসেবে গছিয়ে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরাদের তৈইয় ওয়াক খকগৈ রমানি পূজাটি মুলি রমানি পূজা পালনের লক্ষ্য ও রীতিপদ্ধতির সঙ্গে অনেকাংশেই মিল রাখে। সেক্ষেত্রে খকগৈ রমানি পূজায় একটি শূকর ও একটি মুরগির বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। জঙ্গলে পূজানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর একটি পাতা দিয়ে কৌটার ন্যায় তৈরি করে সেখানে অল্প ভাত, খৈ, চাল আর শূকরের মাথার কিছু চামড়া দিয়ে নদীর উজান বা জোয়ারের দিকে মুখ করে ভাঁটার দিকে পেছন ফিরে সেটি ভাসিয়ে দিতে হয়। আর অল্প পরিমাণ ভাত ও শূকরের মাংসের কিছু অংশ দিয়ে আসি কারর বা আশীর্বাদ করতে হয়। আশীর্বাদ করার পর শূকরটি ঘরে এনে রান্না করে সকলে মিলে মদসহ খেয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রেও সকল পূজার ন্যায় ত্রিপুরারা নৃত্য করে থাকে।

৪.৭ বড়দালী পূজা

ত্রিপুরা সমাজে বড়দালী পূজাটিও পরিবারের কেউ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে, কথাবার্তা না বলতে পারলে, বেহুঁশের ন্যায় পড়ে থাকলে 'দারি কাবাংমা মাতাই' বা বড়দালী দেবতার পূজা পালন করতে হয়। এই পূজার দেব-দেবীর নাম বরমালী, বিখিত্রায়, মোআনি, রোখাজয়। পূজাটি পালনে বরমালী দেবতার জন্য একটি ছাগল বলি দিতে হয়। বিখিত্রা দেবতার জন্য একটি মুরগি, মোআনি দেবতার জন্য একটি শূকর এবং রোখাজয় দেবতার জন্য একটি কুকুর বলির প্রয়োজন হয়। বরদালী পূজায় প্রয়োজন একটি ওয়াথপ্ বা বেদী; সিজিখক দুইটি যার একটি বসানো যায় এবং অন্যটি শোয়ানোর ব্যবস্থাযুক্ত থাকে। নবার নক ৩০টি এবং বাংফাই ৩০টি প্রয়োজন হয়। এছাড়া ধানের খড় দিয়ে তৈরি দুইটি মূর্তি (যদিও ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির ন্যায় নিজেরা কোনো মূর্তি তৈরি করে না) বানানো হয়। রান্না করা পাত্রের তলার কালি মাখিয়ে তা সিজিখকের মধ্যে রাখতে হয়। এ সময়ে যে কোনো ঘাস দিয়ে পাঁচ বা সাত প্রকার শাক-তরকারি রান্না করা হয়। এই শাক-তরকারির সাথে ভাঙা ডিমের খোসা এবং ভাত মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। এই মিশ্রিত দ্রব্য রান্না শেষ হলে সাতটি শাখাযুক্ত একটি দীপ এবং থান্বা বা পাঁচ শাখাযুক্ত একটি দীপ মাটিতে পুঁততে হয়। এছাড়াও আরো পাঁচ শাখাযুক্ত দীপ মাটিতে গেড়ে সেখানে একটি ছোট ছিদ্রযুক্ত ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিতে হয়। এরপর আরো পাঁচটি শাখাযুক্ত দীপ মাটিতে পুঁতে এ প্রান্তে একটি এবং অপর প্রান্তে একটি সিজিখক রেখে মিশ্রিত রান্না দ্রব্যাদি চার ভাগ করে চারটি থালায় রেখে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এর সাথে

খৈ, চালও উৎসর্গ করতে হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রথমে ছাগল, মুরগি, শূকর ও কুকুর পূজানুষ্ঠানের সম্মুখে রাখতে হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে ত্রিপুরাদেরকে কুকুর খেতে দেখা যায় না।

বড়দালী পূজায় ওঝাকে দিয়ে পূজানুষ্ঠান সাজিয়ে শশার বীজ, চাল, কাঁচা হলুদের টুকরা (পবিত্র হিসেবে গণ্য), তালুক মাইসি বা রাইজাতীয় শস্যের বীজ, যব ও সরিষা একসাথে মিশিয়ে মন্ত্রপূত করা হয়। এরপর একটি সিজিখক দীপ, দুটি বরমালী বিখিত্রায়-র দীপ নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে শেষে মাথায় স্পর্শ করা হয়। আবার সিজিখক দীপ ও কুকুরটি নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মাথার ঘুরিয়ে শেষে মাথায় স্পর্শ করা হয়। সব শেষে এসব দ্রব্যাদি এক সাথে বেঁধে ওঝাকে দেওয়া হয়। এসময় ওঝাকে খাইবাক বেঁধে অর্থাৎ একটি গামছা একদিকের কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে অপর বাহুর বগলের নিচ থেকে আড়াআড়িভাবে বেঁধে ঝুলিয়ে নিতে হয়। অতঃপর মন্ত্রপূত শশার বীজ নিয়ে তিনবার সজোরে মাটিতে লাথি মেরে অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে তা ছিঁটিয়ে দিতে হয়। এ পূজায় সবাইকে পূজাস্থানে আগে যেতে দিয়ে সবার শেষে অচাইবা ওঝাকে যেতে হয়। ঘর থেকে নেমে যাওয়ার সময়ে মন্ত্র জপার পর তিনবার ঘরে লাথি মেরে দেবতাকে ডেকে নিয়ে যেতে হয়। প্রতিবার মন্ত্র পড়ার পর মাটিতে লাথি মেরে বীজগুলো অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে ছিঁটিয়ে দিতে হয়। অতঃপর জঙ্গলে গিয়ে একটি ওয়াথপ্ বসিয়ে সেখানে একটি সিজিখক দীপ দিতে হয়। প্রথমে বরমালী বিখিত্রায়কে একটি ছাগল ও একটি মুরগি বলি উৎসর্গ করতে হয়। ওঝার বাম পাশের চারটি বাঁশের চেলা নিয়ে মাচান তৈরি করে সেখানে একটি ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি ঝুড়ি দিয়ে দীপ গেড়ে রাখতে হয়। রোখাজয় দেবতার জন্য সাথে নিয়ে আসা কুকুরটির মাথায় মুগুর দিয়ে সজোরে আঘাতের মাধ্যমে বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। পূজা শেষে আসনের যে কাপড়টি গাছের উপর রাখা হয় তা নিয়ে ওঝা পেছন থেকে মন্ত্র পড়ে মন্ত্রপূত শশার বীজ সাথে নিয়ে আসে। গ্রামের উপকণ্ঠে এসে ওঝাকে রেখে যাওয়া শশার বীজ সবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকটি শব্দ বা কথা বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। পূজা শেষে ওঝা ঘরে ফিরে আসলে সেই রান্না করা শাক-তরকারির ঝোলের মধ্যে (দাল বুতুইয়) একটি জ্বলন্ত অঙ্গার বা কাঠকয়লা ডুবিয়ে আগুন নিভিয়ে ওঝার হাতে দিতে হয়, যা ওঝা দাসহ একটি মন্ত্র পড়ে তা সবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে উঠে আসে। যে কাপড় বা আসন দিয়ে পূজার দেবতা বেঁধে নেওয়া হয়েছিলো সেটিসহ একটি টাকা গুরুদক্ষিণা হিসেবে ওঝা পেয়ে থাকে।

পূজায় যে ছাগল, মুরগি, শূকর ও কুকুর বলি দেওয়া হয় বা উৎসর্গ করা হয় তার কয়টাই সম্পূর্ণ অবস্থায় উৎসর্গ করে দিয়ে আসতে হয়। মুগুর দিয়ে আঘাত করে কুকুরটিকে বলি দিয়ে এর কলিজার পিত্তথলি ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। পিত্তটি যদি সাদা, সোজা, পরিপূর্ণ ও পুষ্ট অবস্থায় থাকে তাহলে সেমা বা লক্ষণ ভালো বলে মনে করা হয়। আর যদি পিত্তটি কালো অথবা বাঁকা হয়, তবে অন্য কোনো পূজা দিতে হবে মনে করা হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে লক্ষণ ভালো না হলে তৈয় ওয়াক খকগৈ দেবতার পূজা দিতে হয়।

৫. ত্রিপুরাদের জীবনযাত্রায় ধর্মসংস্কৃতির প্রভাব

আলোচ্য পূজাগুলোর বাইরে ত্রিপুরা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের দেবতার পূজা পালন করে থাকে। যেমন শরীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হলে 'হাপলক্নি মাতায়' পূজা, মাঙ্গলিক কারণে 'তৈইয় পুন্ তানমানি' বা গঙ্গী পূজা, বোবা থেকে মুক্তি থেকে 'নখৈলা আচকনায়' পূজা, শরীর শীর্ণ ও টিউমার হলে 'ওঁয়াইসানি মাতাই' পূজা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি কামনায় 'সাল্নি বিরকনি সামুং' পূজা, পেটের সাংঘাতিক পীড়া হতে মুক্তি পেতে 'হরনি নিরকবি সামুং' পূজা, চোখে কম দেখলে 'কুসুমব্ক' পূজা, সময়-অসময়ের জ্বর থেকে মুক্তি পেতে 'তৈ সাকাল মাতাই' পূজা, মূর্ছা বা অজ্ঞান হওয়া থেকে মুক্তি

প্রত্যাশায় 'বলংগ ওয়াক খকগৈ রনায় মাতাই' পূজা, বাঘে কামড়ালে বা অপঘাতে কারো মৃত্যু হলে বংশের সবাই রক্ষা পেতে 'রাজ খোয়া মাতাই' পূজা, শরীর ঠাণ্ডা হতে মুক্তি পেতে 'নাইরাং' পূজা, রাতকানা হতে মুক্তি কামনায় 'লামগ্রা মাতাই' পূজা, অন্ধ হতে মুক্তি পেতে 'বালাই কতন' পূজা, পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পেতে 'খুঁই সপ্লেজাকনাই' পূজা, পেটের পীড়া ও মাটির হাঁড়ি ভাঙা টুকরা খেতে ইচ্ছা করলে 'তলা মান্‌জা' পূজা, মদ তৈরি ভালো এবং স্বাদযুক্ত হতে 'সাচুক্‌নি মাতাই' পূজা, সৃষ্টিকর্তার প্রীতি ধর্মকর্ম ঐশ্বর্যবৃদ্ধি সিদ্ধি ও মোক্ষ লাভে 'শিবরাই' পূজা, রাজ্যের মঙ্গল কামনায় 'খার্জি' প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রয়োজন কালে ত্রিপুরারা পালন করে থাকে। আর 'খার্জি' পূজাটি ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পূজা হিসেবে পালিত হয়। রাতে তান্ত্রিক আচারে 'খার্জি' পূজার নৃত্যের নাম হজাগিরি বা ভয়ঙ্কর রাত্রি; এ পূজাগুলোর মধ্যে কয়েকটি সনাতন হিন্দু এবং চাকমা, মারমা বা মগ নৃগোষ্ঠীর পূজাপদ্ধতির অনুরূপ। ত্রিপুরাদের সামাজিক উৎসবগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে বিবাহ সংক্রান্ত উৎসব, বৈসু সংক্রান্ত উৎসব, হাবা সংক্রান্ত উৎসব, রাজপূণ্যাহ সংক্রান্ত উৎসব, জন্ম সংক্রান্ত উৎসব, শিশুর নামকরণ উৎসব, মৃত্যু সংক্রান্ত উৎসব প্রভৃতি। উৎসবগুলোতে জড়িয়ে থাকে ত্রিপুরা গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিচিতি, নিজস্ব ধর্মসংস্কৃতি, নিজস্ব নৃত্যসংস্কৃতি ও তন্ত্রমন্ত্র। মূলত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের আদর্শ নিয়েই এগুলো পালিত হয়। এসব পালনে তারা বেশ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে যা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে।

ত্রিপুরাদের ধর্মবিশ্বাস বংশপরম্পরায় নিজেদেরই তৈরি। প্রাচীন কাল থেকে এরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজস্ব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এসকল ধর্মকর্ম পালন করে আসছে। জীবনযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো একটি বিষয় থেকে মুক্তি পেতে এরা নিজেদের মতো করে এক একটি শক্তি তৈরি করে তার নিকটে আরাধনা করে চলেছে। বিভিন্ন অপদেবতা থেকে মুক্তিই এর মূল লক্ষ্য। এতোকাল পরেও বংশপরম্পরায় তা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। এদের সমাজ কাঠামোও নিজেদের ধর্মের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। বিভিন্ন ধর্মকর্ম এবং উৎসবাদি পালনে নৃত্য ও গানের মাধ্যমে দেবতাকে স্মরণ করে এরা নিজেদের মধ্যে পরিবারে, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক ও দৃঢ় বন্ধন অটুট রেখেছে।

ধর্ম থেকেই ত্রিপুরাদের নানা রকম বিশ্বাসের সৃষ্টি। যেমন, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজস্ব নিয়মকানুনের মাধ্যমে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেবতার শরণাপন্ন হয়ে নিজেদের ওঝা বা অচাই দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়ে নিয়েছে। ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী বিপদ-আপদে যেমন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে, তেমিন কোনো বিপদে পড়লে পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সাহায্যে ডাকে। এ সময়ে তারা অর্থনৈতিক, মানসিক প্রভৃতিভাবে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে এদের অনেকেই হিন্দুদের মতোই পূজার্চনা করে এবং মন্দিরে যায়। যেমন, ত্রিপুরারা সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুল দিয়ে মা লক্ষ্মীর পূজা করে; সকালে পূজা দিতে ভুলে গেলে দুপুরে তা পালন করে। তাছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে পূজায় লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে। বর্তমানে সপ্তাহের শুক্রবারে ত্রিপুরারা সম্মিলিতভাবে মন্দিরে যায় এবং হরিয়মের বিগ্রহে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রার্থনা করে। মন্দিরে পরিচ্ছন্ন পোশাকে নারী-পুরুষ যাতায়াত করে। সেখানে শিক্ষার্থীরাও যায়। ত্রিপুরা পূজারী প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা পালন করে থাকে। তারা পূজায় বিভিন্ন প্রকার প্রসাদ গ্রহণ করে। তবে অঞ্চল ভেদে হিন্দুদের সঙ্গে ওঠা-বসায় ত্রিপুরাদের তারতম্য লক্ষ করা যায়।[২৫] যেমন ত্রিপুরা নারী মুসলমানের খাবার খায়

---

[২৫] অরুণেন্দু ত্রিপুরা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বয়স-৪৭ (বিবাহিত), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

না। বিশেষ করে প্রাচীন ব্যক্তিবর্গ শহরে বা অন্যত্র বাঙালি হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় না খেয়ে হিন্দু হোটেল-রেস্তোরাঁতে খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জীবিকা নির্বাহে ত্রিপুরা দরিদ্র নারী-পুরুষ উভয়েই মুসলমানের বাড়িতে বা অফিসে কাজকর্ম করতে দেখা যায়। পূর্বে ত্রিপুরা সমাজে কেউ ধর্মান্তর হলে তাকে সে সমাজ বা গোষ্ঠী হতে বহিষ্কার করা হতো। বর্তমানে ত্রিপুরাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে তা তারা মেনে নিচ্ছে।

৬. উপসংহার

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী নিজেদেরকে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবেই পরিচয় দেয়। সনাতন ধর্মের অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করলেও এরা মূলত প্রকৃতিপূজারী। ত্রিপুরারা যেভাবে প্রধানত কাথাররক পূজা, কের পূজা, গরয়া পূজা, খোয়া সুমানি পূজা, খাং মাতাই বমানি পূজা, নাইরাং পূজা, বড়দালী পূজা, তৈয় ওয়াক খগই পূজা, মুলি রমানি পূজা প্রভৃতি পালন করে সেখানে জীবজন্তু, বৃক্ষ, নদী, নৃত্য প্রভৃতি নিয়ে প্রকৃতিই সেখানে প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পালিত হলেও প্রকৃতিই সেখানে উপস্থিত। প্রকৃতিই এদের দেবতা। প্রাচীন কালে যে এরা মূর্তি তৈরি করে পূজা পালন করতো না, তা এদের পালিত বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণ বৈশিষ্ট্য থেকে উপলব্ধি করা যায়। প্রতিটি পূজা এবং উৎসবে ত্রিপুরাদের নিজস্ব নৃত্য ও গান রয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু কিছু সংস্কৃতি ও রীতিকে আত্তীকরণ করলেও ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মাচার ও ধর্মসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

চিত্র ১

ত্রিপুরাদের গরয়া পূজার নৃত্য

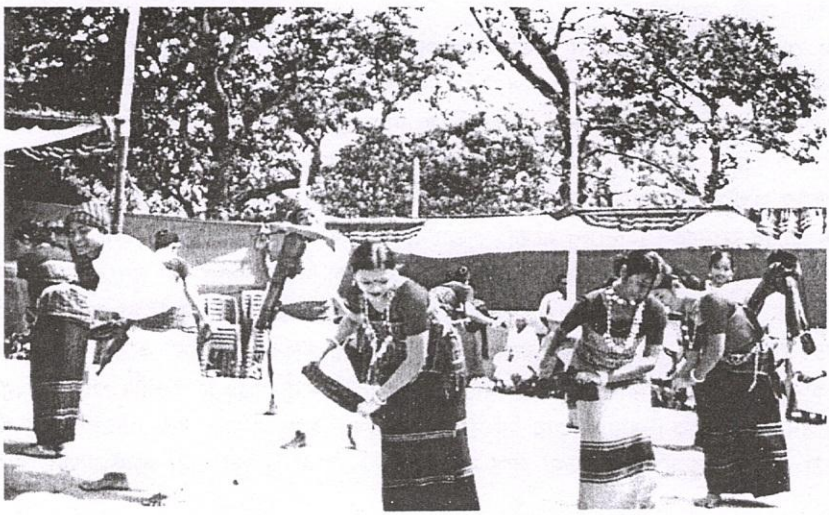

ফররুখ আহমদ-এর কাহিনীকাব্য হাতেমতা'য়ী : একটি পর্যালোচনা

মোঃ আবদুল মজিদ*

Abstract: The 'Hatem Tayee' of Farrukh Ahmed is a narrative poem centered on a story of troubled love. It touches upon humanism in Muslim life, human relation, experience, religion and social recognition. Romance, Melancholy and reminiscences of painful past on his part constitute the basis of 'Hatem Tayee'. In order to build the theme and setting of 'Hatem Tayee', the poet, in the appearance of a distant traveller, has resorted to chance. Following this poetic trend, he presents us with his diverse feelings and new success stories as if he were 'Sindbaad of good luck' or messenger of beatitube. Besides, adequate love for homeland nature and agony of the then society has received some focus in this poem.

ভূমিকা

বিশের দশকের প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬); তিরিশের দশকের প্রধান কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬); আর চল্লিশের দশকের প্রধান কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)। বাংলার রেনেসাঁসে বাঙালি মুসলমানদের যোগসূত্র রচনায় এই তিনজন কবিরই বিশাল ভূমিকা আছে। এদের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে ঠিকই, কিন্তু গভীর বৈসাদৃশ্যও আছে। দেখা যায়, ইসলামত্ব সত্ত্বেও, নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান মিলনেরই পুরোধা পুরুষ; জসীমউদ্‌দীন গ্রামীণ কাহিনীর ভিতরে হিন্দু-মুসলমান নায়ক-নায়িকার মিলনবাণীই গেয়েছেন; কিন্তু ফররুখ সারা জীবনব্যাপী কেবল ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বজাবাহী। নজরুল ও জসীমউদ্‌দীনের মতোই ফররুখও মূলত মানবতাবাদী, মানবপ্রেমিক। কিন্তু মানবতাকে সরাসরি স্পর্শ করেছেন তিনি ইসলামের মধ্য দিয়ে। ইসলামের বহিরাচার বা আধ্যাত্মিকতা ফররুখকে তত আকর্ষণ করে না, যত করে তার সাম্যবাদী ও মানবতা উদ্বোধক ভূমিকা। ইসলামের পুনরুজ্জীবনকামী এই ভূমিকার জন্য তিনি পাঠ নিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও টি. এস. এলিয়ট – দুই শতাব্দীর দুই দেশি-বিদেশি কবির কাছ থেকে। মাইকেল হিন্দুপুরাণের পুনর্জন্ম দান করেছিলেন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। ইসলামি পুরাণ অনচ্ছ বলে ফররুখ নির্ভর করলেন আরব্যোপন্যাসে। 'মাইকেলের নায়ক বারণের মধ্য দিয়ে মাইকেল ট্র্যাজিক বীরের প্রতিষ্ঠা করেছেন; নজরুলের নায়ক শিবের মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর পুরাতনের ধ্বংস ও নতুনের নির্মাণের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ফররুখ আহমদের নায়ক সিন্দাবাদ ও হাতেমতায়ী অভিযাত্রিক।'[১] এই অভিযাত্রিকতা রাবণ ও শিব থেকে স্বতন্ত্র করেছে সিন্দবাদ ও হাতেমতায়ীকে এবং তাঁর নবমূল্যে উত্তরণকারী রচয়িতাকে। আর ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কবি ফররুখ আহমদ এই অভিযাত্রিকতাকেই সব সময় কাজে লাগিয়েছেন।

---

* ড. মোঃ আবদুল মজিদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

[১] আবদুল মান্নান সৈয়দ, "ভূমিকা," *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৭।

এক. ফররুখ পরিচিতি ও কবিসত্তা

কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ সালের ১০ জুন, যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে। খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে প্রবেশিকা এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আইএ পাশ করেন। এরপর প্রথমে স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স এবং পরে সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স অধ্যয়ন করেন। কলেজজীবনে বামপন্থি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, এবং এ সময়ে র‍্যাডিকেল হিউম্যানিজম আন্দোলনের নেতা এম. এন. রায়ের অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে আই. জি. (প্রিজন) অফিসে, ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপস্লাই অফিসে, ১৯৪৫-১৯৪৭-এ জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে ও 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এবং ১৯৪৭-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' পদে চাকুরি-জীবন অতিবাহিত করেন। কর্মজীবনে বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সেই সাথে ইসলামের মৌল আদর্শকে গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়কাঠামো ও আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে কাব্য সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাব। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স', ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থের জন্য 'আদমজী' পুরস্কার এবং এই একই সালে 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য 'ইউনেস্কো' পুরস্কার লাভ করেন। মরণোত্তরকালে 'একুশের পদক'-এ ভূষিত হন। ফররুখ আহমদ মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী কবি। পাকিস্তানবাদ, ইসলামিক আদর্শ এবং আরব-ইরানের কবি ও কাব্যিক ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।[২]

বাংলা কাব্যের ত্রিশোত্তর ধারায় জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অজিত দত্ত (১৯০৮-১৯৭৯) প্রমুখ কবি অতি আধুনিক নামে সুখ্যাত; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) পরে বাংলা কাব্যে এঁরা এই আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটান। এই আধুনিকতার পথ ধরে চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যের পরিবৃত্ত প্রশস্ত হয়। মুসলিম কবিরা এ সময় মুক্তজীবনবোধ ও বহুমাত্রিক ভাবতরঙ্গ নিয়ে কাব্যসাধনায় ব্রতী হন। চল্লিশের দশকে এহেন কাব্যচর্চায় অগ্রণী ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আবুল হোসেন (১৯২২), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০৪) প্রমুখ। এই কবিকুলের মধ্যে ফররুখ আহমদ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কারণ আহসান হাবীবের ভাষাসৌকর্য উৎকৃষ্ট মানসবৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। ফররুখ আহমদের ভাষাও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং সৌন্দর্যবোধ ও ভাবস্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। ফররুখ আহমদের প্রথম সমালোচক আবু রুশদ ১৯৪১ সালে উপর্যুক্ত কয়েকজন আধুনিক মুসলমান কবির সমালোচনায় অন্তত ফররুখের কবিতায় একটি দূরপ্রসারী সম্ভাবনা লক্ষ করেছিলেন। তিনি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক বাস্তববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের জয়গান অকুণ্ঠ, সুদূরের প্রতি আকর্ষণও তাঁর কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবুও তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাঁর একটি বলিষ্ঠ সজাগ তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মন আছে যা সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করবার সাহস রাখে, কিন্তু রোমান্টিসিজমের বিপদ সম্বন্ধে যা সর্বদা সচেতন।[৩]

---

[২] সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ২৩৮।

[৩] আবু রুশদ, *আধুনিক কবিতা ও মুসলিমগণ* (ঢাকা: সওগাত, ১৯৪১)।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুভূতিতে প্রগাঢ় বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহমদ। হাজার শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যেতে হয় কবির বিচিত্র পথের অনুসন্ধানে। ইতিহাস থেকে শক্তি আহরণ করে পথ চলতে হয় শিল্পীকে। কারণ ঐতিহ্য হচ্ছে আধুনিক শিল্পের অন্যতম প্রাণসম্পদ। আধুনিক শিল্পের ঐতিহ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে মননের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন টি.এস.এলিয়ট। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inferited, and it you want if you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense, which we may call nearly in dispersable to anyone who would continue to be a poet beyond his twenty fifth year and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence.[৪]

জীবন ও সমাজের সাথে নিবিড় একাত্মতাবোধের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। একটি আদর্শবাদী রাজনৈতিক চেতনা তাঁর ছিল, যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্পন্দমান জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার অঙ্গীকারে উজ্জ্বল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার কবিতার পটভূমি বিস্তৃত হতে-হতে স্বদেশ, সমাজ, ব্যক্তি প্রত্যাশার টানাপোড়েন প্রভৃতি আত্মস্থ বা অতিক্রম করে একটি চিরায়তিক উপলব্ধির মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে।

কবি ফররুখের জীবনের উৎসারণ আর কবিতার উৎসারণ একইখাতে প্রবাহিত। রূপকল্পের পরীক্ষা ও ছন্দের নিরীক্ষার জন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয়। প্রথাগত রূপকল্প ও ছন্দের মধ্যের আশ্চর্য অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন কবি বিচিত্র মননের উৎকৃষ্ট পরিচর্যায়। কোনো কিছুতে আবদ্ধ থাকার মানুষ নন কবি ফরুরুখ আহমদ। শব্দের নতুন-নতুন জানালা খুলে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, বাঁধা পড়ার, ধরা দেয়ার মানুষ তিনি নন। তিনি বরং সৃষ্টি করলেন বাংলা কবিতার নতুন পথ। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন : "বাংলার চল্লিশের দশকের কবিতার যে শিথিলতা, তাঁর বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছিলেন ফররুখ আহমদ, বাংলা কবিতার ধ্রুপদী ধারাবাহন এভাবেই ফরুরুখের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে।"[৫] ফলে বিষয়বস্তুর আঙ্গিক ও ধারায় ফররুখ আহমদ সবদিক থেকেই সংগ্রামী চৈতন্যসম্পন্ন। চল্লিশের সময় ও চেতনা, সামাজিকতা, নিঃসঙ্গতা, জীবনজিজ্ঞাসা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি প্রকাশের সাথে-সাথে তাঁর সংগ্রামী বাণীই উচ্চারিত হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে।

ফররুখ আহমদ নিজে রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী হয়েও একই সঙ্গে মানবতাবাদী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের সফল রূপকার হিসেবে নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। একই সঙ্গে তিনি সবার ঐতিহ্যবাদীও। নিজস্ব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। ফররুখ তাই উচ্চারণ করেন :

আমি চাই
সব মানুষের সাথে পরিপূর্ণ শান্তি পৃথিবীতে।
লোভ-লালসার পঙ্কে ডুবে চলে যে ভ্রষ্ট পিশাচ
সে শুধু ছড়িয়ে চলে আবর্জনা ক্লেদে। কিম্বা যারা

---

[৪] T.S. Eliot, "Tradition and The Individual Talent" *Sclected Essays* (Reprint; London: Faber and Faber Limited, 1951), p. 14.

[৫] আবদুল মান্নান সৈয়দ, "দরিয়ার শেষ রাত্রি: প্রতিভূ কবিতা", *ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি*, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পা. (৩য় সং; ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ. ৪৭২।

মেনে নেয় নত শিরে দূনীর্তির জিঞ্জির জীবনে,
অন্যায় অসত্য-পাপে শৃঙ্খলিত মরে অন্ধকূপে,
ঈমান ইজ্জত ভুলে করে ভীরু করে আত্মসমর্পণ
অত্যাচারী পিশাচের পদপ্রান্তে, জানি দুনীর্তির
বাহন তারাই- ক্লীব; শত্রু তারা সমাজ সত্তার।[৬]

কবিতায় ফররুখ আহমদ সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার জন্য। আর ঐতিহ্যের নবরূপায়ণও ঘটিয়েছিলেন বক্তব্যের দৃঢ়তা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য:

> ফররুখ আহমদের পরে আমরা দেখলাম, যাঁরা ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন তাঁরা সকলেই ফররুখ আহমদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু, ফররুখ আহমদের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের যে একটা সচলতা ছিল, কবিতার ধ্বনি এবং ছন্দ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকার দরুণ, সে জিনিসটা ফররুখ আহমদের অনুসারী যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলনা। ফলে তাদের কাব্য অনুকরণের রূঢ়তা এসেছে, কিন্তু কবিতা কোন প্রকার প্রাণ-চাঞ্চল্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠেনি।[৭]

ফররুখ আহমদ সমুদ্রমন্থনের কবি। তাঁর কাব্যে আছে সমুদ্রের বিশালতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা। প্রসারিত কল্পনার জন্যে, নিজের কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রতি অবিচল বিশ্বাসের জন্যে ফররুখ আহমদের কবিতা পাঠকের গভীর অভিনিবেশ দাবি রাখে। মুসলিম রেনেসাঁকে নতুন মূল্যায়ন করে এই সাধক কবি যে প্রতিভার উন্মোচন করেছেন সে প্রতিভা ক্ষণিকের ডামাডোল নয়, নয় একটি সীমিত সময়ের দায়। ত্রিশের দশকের কবিদের চেয়ে তাঁর সমাজচেতনা ও কবিচেতনা অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। মুষ্টিমেয় পাঠক, সমালোচকের কোপানলে পড়ে ফররুখ আহমদ যদিও কখনো-কখনো বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন, তবুও আমরা জানি যে, ফররুখ আহমদের কাব্যপ্রতিভা জ্বলন্তপ্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। এক হিরণ্ময় কাব্য অভিব্যক্তি তাঁকে কালের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। ত্রিশের দশকে আমাদের কবিতার যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেই বিস্ফোরণের অন্যতম শক্তি ফররুখ আহমদ, যদিও তাঁর অধিকাংশ কবিতা চল্লিশের দশকে সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতার ভাব ও বিষয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে ত্রিশের দশকের অনেক কবি থেকে শক্তিশালী কবি হওয়া সত্ত্বেও কিছু মুখচেনা কাব্যপাঠক ও সমালোচকের কাছে নিন্দিত। যদিও তিনি তথাকথিত শক্তিশালী কবিদের অনেকের চেয়ে শক্তিশালী, গতিশীল ও অনুভূতিময়।

দুই. হাতেমতা'য়ী কাব্যের কাহিনী

'হাতেমতা'য়ী' কাব্য ফররুখ আহমদের এক অমূল্য সম্পদ। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের সাপ্তাহিক 'পাকিস্তানি খবর'-এ কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মাসিক 'পূবালী' এবং লেখকের 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। ওই বছরেই কবি এ কাব্যের জন্য 'আদমজী' পুরস্কার পেলেন।[৮] কবি আরো কিছু সারা জাগানো কবিতা এ বছরেই লিখেছিলেন। যেমন 'বৈশাখ', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি। দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব একই বছরে প্রত্যাখ্যান করলেন।[৯] কাজেই এই ১৯৬৬ সালটি কবির জীবনে অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতিবহনের এক

---

[৬] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

[৭] সৈয়দ আলী আহসান, "ফররুখ আহমদ", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৩২১।

[৮] শাহাবুদ্দীন আহমদ, "ফররুখ আহমদের জীবন-পঞ্জি", *ফররুখ আহমদঃ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৫৬৫।

[৯] তদেব।

নিরীক্ষিত সময়। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য :

> 'হাতেমতা'য়ী' সম্ভবত কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল। একটি আদর্শ জীবনে কল্পনা এবং পূর্ণ ইসলামি মূল্যাবোধের জাগরণের স্বপ্ন এই কাব্য রচনার প্রেরণামূল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রেরণামূল থেকে ফরুরুখ আহমদের সকল কাজ প্রয়াসের উন্মীলন।[১০]

ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রবেশের আগে এ গ্রন্থের কাহিনী সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো : 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যটি নিঃসন্দেহে একটি কাহিনীধর্মী বা আখ্যায়িকা জাতীয় কাব্য। এই আখ্যায়িকাধর্মী কাব্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করলে যেটি পাওয়া যায় সেটি হলো কাব্যটির আখ্যায়িকা পল্লবিত হয়ে উঠেছে মূলত একটি বিড়ম্বিত প্রেমেরই সূত্র অবলম্বন করে। কাহিনীর সূত্র এরূপ: ইয়েমনের বনপ্রান্তে খরজমের বাদশাজাদা ও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মুনীর শামীর সাথে হাতেমতা'য়ীর সাক্ষাৎ ঘটে এক আশ্চর্য পরিস্থিতির মধ্যে। মুনীর শামীর তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেওয়ানার হালে। হাতেমতা'য়ীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে তিনি তাঁর সংসার ত্যাগের কারণ বর্ণনা করে যে কাহিনী বললেন তা হলো – খোরাসান দেশের এক সওদাগরজাদী পরমা সুন্দরী হুসনাবানু জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মানুষের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। জীবনে সম্ভাব্য বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় বিচক্ষণা ধাত্রীর পরামর্শে হুসনাবানু প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁর প্রদত্ত সাতটি সওয়ালের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শাদীর পয়গাম মঞ্জুর করবেন না। এ প্রসঙ্গে হুসনাবানুর প্রতি বৃদ্ধাধাত্রীর পরামর্শমূলক উক্তি :

> সঙ্কট মুহূর্তে আমি দিয়ে যাই সঞ্চয় আমার
> –এ সাত সওয়াল, আর জানাই এ কথা সঙ্গোপনে,
> যে দেবে উত্তর এনে নির্দেশ ভুলো না তুমি তার
> হয়ো তার অনুবর্তী দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠিত মনে।
> সত্যসন্ধ প্রাণ যার, ভোলে না যে মিথ্যার গহনে
> সেই দুর্গমের যাত্রী দেবে এনে জওয়াব তোমার।[১১]

একমাত্র সেই পুরুষকেই তিনি পতিরূপে গ্রহণ করবেন যিনি এ সাত সওয়ালের জবাব এনে দিতে পারবেন। বোখারা, সমরকন্দ, বাদাকশান, গজনী, খোরাসান সব জায়গা থেকে অনেক শাহজাদা তাঁর অশেষ সম্পদ ও সৌন্দর্যের কথা শুনে এলেন হুসনাবানুর পাণিপ্রার্থী হয়ে। কিন্তু সওদাগরজাদীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসে সবাই ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেন। খরজমের শাহজাদা মুনীর শামীর একজন চিত্রশিল্পীর কাছে হুসনাবানুর তসবির দেখে রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রাণিপ্রার্থী হন; কিন্তু হুসনাবানুর পহেলা সওয়ালেরও জবাব তিনি দিতে পারলেন না। মনের দুঃখে তাই রাজতখত ছেড়ে অরণ্যে প্রস্থান করলেন। আর সেখানেই মহাপ্রাণ 'হাতেমতা'য়ীর' সাথে তাঁর দেখা হয় ও প্রথম পরিচয় ঘটে। মুনীর শামীর দুরবস্থা দেখে সৃষ্টির সেবায় উৎসর্গীকৃত হাতেমের প্রাণ কেঁদে ওঠে এবং তিনি তাঁকে সাত সওয়ালের জবাব এনে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাই হাতেমতা'য়ী বলে ওঠেন :

> হুসনাবানুর কঠিন সওয়াল এবার জানতে চাই।
> খোদার রহমে যদি সে জওয়াব খুঁজে পাই দশদিকে
> আশিক মুনীর! তবে নিশ্চয় পাবে তুমি সে নারীকে।[১২]

এখানেই প্রকৃতপক্ষে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের অপরূপ কাহিনীর সূত্রপাত হলো।

---

[১০] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "বিষয় ও ছন্দ সমীক্ষায় হাতেমতা'য়ী", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৪৪৬।

[১১] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৪।

[১২] তদেব।

'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে হুসনাবানুর সাতটি সওয়ালের মধ্যে পহেলা সওয়াল ছিল – "একবার যাকে দেখেছি, আর একবার তাকে দেখে যেতে চাই" – এ কথা কে বলে এবং কেন বলে? এ সওয়ালের জবাব সংগ্রহ করার অভিযানে হাতেম এক প্রান্তরে উপস্থিত হন। সেখানে নিজের শরীরের মাংস কেটে দিয়ে তিনি এক বাঘের কবল থেকে এক হরিণীকে উদ্ধার করেন। হাতেমের আত্মত্যাগে মুগ্ধ বাঘের কাছ থেকে হাতেম জানতে পারেন যে, হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদায় তাঁর সওয়ালের জবাব মিলতে পারে। তারপর বহু মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে হাতেমতা'য়ী একটি সুন্দর বাগিচায় প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি একজন প্রবীণ জ্ঞানীর নিকট দশতে হাবেদায় প্রবেশরহস্য অবগত হন। প্রবীণ জ্ঞানী 'পীরমর্দ' তাকে জানালেন যে, জুলমাতের এলাকায় পৌঁছিলেই মায়াময়ী নারী এসে তাঁকে হাত ধরে পাতালে নিয়ে যাবে। সেখানে তিনি অনেক আশ্চর্য দৃশ্য ও অনেক তন্বী সুন্দরী দেখতে পাবেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীর হাত ধরলেই তিনি এক অদৃশ্য আঘাতে দশতে হাবেদায় নির্বাসিত হবেন। দশতে হাবেদায় প্রবেশের ওটাই সহজপথ। পীরের পরামর্শ অনুযায়ী হাতেমতা'য়ী দশতে হাবেদায় প্রবেশ করে পূর্বোক্ত সওয়ালের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন। পহেলা সওয়ালের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে 'হাতেমতা'য়ী' এই মর্ম উদঘাটন করেন :

যে আলেয়া দিক ভ্রান্ত করে সে নয় সত্যের শিখা,–
জনশূন্য নির্জন প্রান্তরে যে চায় মুক্তিরপথ সে আলোকে,
হয় সে শিকার মৃত্যুর; মিথ্যার।[১৩]

হুসনাবানুর দ্বিতীয় সওয়াল ছিল, "দৌলৎ পানিতে ফেলে নেকি করো"- এ কথার কি রহস্য? এই সওয়ালের পথে হাতেমতা'য়ীকে পথে অনেক অচিন্তনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সফরের পথে প্রথমে তাকে 'হলুকা' নামক রাক্ষসের সম্মুখীন হতে হয়। কৌশলে তাকে হত্যা করে তিনি উৎপীড়িত জনপদ বাসিন্দাদের রক্ষা করেন। তারপর খরজমের গোরস্থানে তিনি শহিদ ও বখিলের আত্মা দর্শন করেন। দুর্গত 'বখিলে'র আত্মার অনুরোধে হাতেম এক নতুন সফরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রার্থিত মতে সম্পত্তি বণ্টন শেষ হলে বখিলের আত্মা 'গোরাজাব' থেকে মুক্তি লাভ করে। অতঃপর হাতেমতা'য়ী নতুন করে সফর শুরু করেন। সফরের পথে 'বেদাদ' শহরে উপস্থিত হলে জ্বিনের প্রভাবাবিষ্ট শাহজাদি তাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এ তিনটি প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ :

১. বল তুমি রাহাগি, সেই কাতরা কোন দরিয়ার সকল ওজুদ পয়দা হ'ল যাতে আলমে আল্লার।[১৪]
২. নর-নারী, জীব-জন্তু ফেরে কোন মেওয়ার সন্ধানে, সে ফল হারায় যদি কেন মরে আশাহত প্রাণে?[১৫]
৩. কি আছে এমন, যাকে মখলুকাত পারে না ছাড়াতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধরা দিতে হয় যার হাতে?[১৬]

উপর্যুক্ত তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হাতেম সক্ষম হন এবং ইবলিসের অনুচর জিনটিও তাঁর অস্ত্রে নিহত হয়। এ ঘটনার পরে হাতেম যখন বেদাদ শহর ছেড়ে অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হন, তখন কুলজুম নদীর কিনারায় হাসনা পরী হাতেমের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। আদম সন্তানের প্রতি আসক্তির অপরাধে পরীরানী হাসনাকে কারারুদ্ধ করেন এবং হাতেমকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পরীরানীর একমাত্র পুত্রের

---

[১৩] তদেব, পৃ. ২৭২।
[১৪] তদেব, পৃ. ২৯১।
[১৫] তদেব।
[১৬] তদেব।

চিকিৎসার জন্য দৈত্যের দেশ থেকে এক দুর্লভ ঔষধি সংগ্রহ করার আবশ্যকতা নির্দেশ করলে, হাসনা পরী নিজের প্রাণ বিপন্ন করে দৈত্য মুলুক থেকে নূররেজ গাছের ফুল নিয়ে আসেন। এভাবে পরীরানীকে খুশি করে হাসনা নিজেকে এবং হাতেমতা'য়ীকে মুক্ত করেন।

হুসনাবানুর তৃতীয় সওয়াল ছিল, – "বদ কাজে বদি ফলে" এ কথা কে বলে, কেন বলে? এই সওয়ালের পথে পরীরানী আলগুনের প্রেমাসক্ত এক বিরহী সওদাগরের সাথে হাতেমের সাক্ষাৎ হয়। হাতেমের অনুরোধে কোহে আলকাবাসিনী আলগুনপরী বিরহী প্রেমিকের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আলগুনপরীর কাছেই হাতেমতা'য়ী জানতে পারেন যে, দুর্গম হামির ময়দানে এক পিঞ্জরাবদ্ধ অন্ধ কয়েদি সওয়ালের কথাগুলো দীর্ঘকাল ধরে আবৃত্তি করছে। অন্ধ কয়েদির এ সওয়ালের বর্ণনা ছিল এরূপ:

তাই আমি ক্রমাগত বলে যাই কাহিনী আমার,
কোরো না অন্যের ক্ষতি, কোরো না অন্যায়। পৃথিবীতে
যে করে অন্যের ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজে, আর
বদ কাজে বদী ফলে; মন্দ কাজ দেয় না সুফল
কোনদিন।[১৭]

আলগুনপরীর সহযোগিতায় হাতেম সেই প্রান্তরে উপনীত হন এবং পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদির মুখে সওয়ালের জবাব শুনতে পান। তারপর বহুকষ্টে নজ্জুমবর্ণিত নূররেজ ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে কয়েদিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে হাতেম শাহাবাদে ফিরে আসেন।

হাতেমতা'য়ী কাব্যে হুসনাবানুর চতুর্থ সওয়াল ছিল, – "সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব কিভাবে জানা যায়? সত্য কথার অর্থ কি? লাভ কোথায়?- 'যে সত্য কথা বলে সে কোনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না,'- এ কথা কেন একজন মানুষ নিজের দরজায় লিখে রেখেছে?" এ সওয়ালের পথে বেড়িয়ে হাতেম এক নির্জন নহরে রক্তস্রোত দেখে বিস্মিত হন। সে রক্তস্রোত অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে জনশূন্য বিয়াবনে এক বিরাট গাছের ডালে অসংখ্য নারীমুণ্ড ঝুলে আছে। সদ্যকর্তিত সে সব মুণ্ডের রক্তেই নহরের স্রোত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। ঐ সব ছিন্নমুণ্ডের মাঝখানে পূর্ণিমার মতো দীপ্তিময়ী এক নারীমুখ হাতেমকে বিহ্বল করে তোলে। এই ভয়াবহ কাণ্ডের মূলকারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। সেখানে সবুজ খেলকা পরিহিত এক দরবেশের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, কুখ্যাত যাদুকর কামলাকের শাগরিদ শাম আহমরের কারসাজিতে তার দুহিতা জরিনপোষ জীবন্মৃত অবস্থায় সহস্র সঙ্গিনীসহ বিয়াবনে দিন গুজরান করছে। হৃদয়হীন পিতার যাদুর প্রভাবেই তাদের ছিন্নশির সারাদিন গাছের ডালে ঝুলে থাকে। এ প্রসঙ্গে কবির ভাষ্য :

হাজার সখীর সঙ্গে দোলে
সারাটা দিন ছিন্ন শির,
দিন ফুরালে সাঁঝের ছায়ায়
দীঘির বুকে পায় শরীর।[১৮]

হাতেম দরবেশের কাছ থেকে মিথ্যা যাদুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঠিক পন্থা জেনে নেন এবং কঠিন সংগ্রামে যাদুকর কামলাক ও শাম আহমরকে পরাস্ত করে জরিনপোষের সাথে মিলিত হন। এরপর কোররম নামে এক শহরে গিয়ে এক প্রবীণবৃদ্ধের নিকট চতুর্থ সওয়ালের জবাব সংগ্রহ করে শাহাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। চতুর্থ সওয়ালের মূলমন্ত্র কবি চমৎকারভাবে নির্দেশ করেছেন :

যা পরম সত্য গোপন রহস্য তার জানে শুধু নবী ও সিদ্দিক

---

[১৭] তদেব, পৃ. ৩২৫।
[১৮] তদেব, পৃ. ৩৪২।

আত্মার আলোকে। সমাচ্ছন্ন প্রবৃত্তির অন্ধকারে
পাইনি সত্যের রশ্মি, কালো হয়ে আছে জিন্দেগানি
মিথ্যা-অসত্যের দ্বন্দ্বে।[১৯]

ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে হুসনাবানুর পঞ্চম সওয়াল ছিল, "কোহে-নেদা কোন পাহাড়ের নাম? কি তার রহস্য? কেন সে মানুষের নাম ধরে ডাক দেয়?" এই সওয়ালের পথে হাতেম অনেক দেশ সফর করেন। নানান জাতির অনেক সভ্যতা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হন। সফরের পথে হাতেমতা'য়ীকে অরণ্যের বিভীষিকা সঙ্গসার ধাউলের সম্মুখীন হতে হয়। হিংস্রদানবকে হত্যা করে তিনি অরণ্যের সব প্রাণীকে নিঃশঙ্ক করেন। তারপর এক বিরান শহর অতিক্রম করে পৃথিবীর সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে ঘেরা এক জনপদে উপস্থিত হন। হাতেমের উপস্থিতির ফলে সেই বিচ্ছিন্ন দেশের সঙ্গে আবার বৃহত্তর জগৎ ও মানবতার সংযোগ সাধিত হয়। সেখানেই তিনি কোহেনেদা বা আহ্বানকারী পাহাড়ের সন্ধান পান। কোহেনেদা বা আহ্বানকারী পাহাড়ের বর্ণনায় কবি বলেন :

অন্তহীন আকাশের ডাকে
যেমন হাউই ওঠে শূন্যতার নিরুদ্দেশ পথে
দুরন্ত বালক তারে ছুঁড়ে দেয় উল্লাসে যখন,
দূর পাহাড়ের যাত্রী সেই মত চলে উর্ধ্বশ্বাসে
সম্পূর্ণ অচেনা এক অন্ধকারে। সঙ্গী যারা
দেখে নির্নিমেষ চোখে যতক্ষণ পড়ে সে নজরে
অসহায় ! তারপর ফিরে যায় যে যার কুটিরে।
অজানা পথের যাত্রী যে হারায় ঘন অন্ধকারে
ফেরে না কখনো আর পরিচিত পৃথিবীর বুকে।
অশেষ রহস্যে ঘেরা শিলাতল এ কোহে-নিদার।[২০]

একদা এক জনপদবাসীর নিকট তিনি এ কথা জানতে পারেন যে, কোহেনেদার ডাক মানুষের অন্তিম আহ্বান। যার নামে এ ডাক আসে সে আর স্থির থাকতে পারে না। উন্মাদের মত ছুটে পাহাড়ে মিশে যায়। এ রকম এক মৃত্যুপথযাত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে হাতেমতা'য়ী একদিন কোহেনেদার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কোহেনেদায় মানুষের রহস্যময় মৃত্যু দেখে হাতেম জীবনের মূল্য ও মৃত্যুর শাশ্বতরূপ সম্পর্কে সচেতন হন। মৃত্যু জিজ্ঞাসায় তিনি বুঝতে পারেন যে, এক অনতিক্রমণীয় পাহাড়ের মতো মৃত্যুকে অতিক্রম করে কেউ আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না। আর মৃত্যুর পূর্বেই যে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করে যেতে না পারে, সে হতভাগ্য। তার মৃত্যু আত্মহত্যা বা অপমৃত্যুর নামান্তর মাত্র। তাই কবি এ মর্মে প্রকাশ করেন :

আনে না যা সত্যের নিবিড়
সান্নিধ্যে, অথবা সেই অন্ধছায়া যে শুধু দোলায়
সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে, কল্যাণের খোলে না দুয়ার
মহত্তর জিন্দেগীর পথে, কূলহারা সে ব্যর্থতা
সমুদ্র যাত্রীর মনে আনে বয়ে হতাশা কেবল
বর্ণহীন। সেই মৃত্যু আত্মহত্যা শুধু। চাই নাই
সেই অপমৃত্যু, ব্যর্থ সে আত্মবিলোপ, নবতর

---

[১৯] তদেব, পৃ. ৩৬০।

[২০] তদেব, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

দীপশিখা না জ্বালায়ে নিভে যাওয়া চিরাগের মত।[২১]

কোহেনেদায় জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অপূর্ব জ্ঞান লাভ করে অনেক আশ্চর্য সমুদ্র, পাহাড় ও দেশ অতিক্রম করে তারপর হাতেম শাহাবাদে হুসনাবানুর কাছে ফিরে আসেন।

জীবনাভিজ্ঞতায় স্নাত ধীশক্তির অধিকারী কবি ফররুখ আহমদ 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে কোহেনেদার রহস্য ও সফরকাহিনী শোনার পর হুসনাবানু হাতেমতা'য়ীকে ষষ্ঠ সওয়ালে বলেন- "সারসের ডিমের সমান বৃহদায়তন একটি অমূল্য মোতি আছে তার জোড়া এনে দিতে হবে।" এত বড় মোতি চোখে দেখা তো দূরের কথা, হাতেম কোনদিন তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেননি। তবু তিনি মোতির নমুনা নিয়ে অনিশ্চিত, অজানা পথে আবার অগ্রসর হলেন। একরাতে এক বিজন অরণ্যে তিনি নাতেকা পাখির কাছে জানতে পারেন যে পরীর দ্বীপে বাদশা মাহেয়ারের কাছে এই মোতির জোড়া আছে। মোতির সঠিক ইতিহাস তাঁকে বলতে পারলে তিনি তাঁর মোতি ও একমাত্র কন্যাকে বর্ণনাকারীর নিকট সমর্পণ করবেন। নাতেকা পাখি এ প্রসঙ্গে মোতির ইতিহাস বর্ণনা করে পরীর দ্বীপ বর্জখে যাওয়ার পথ বলে দেয়। যাত্রাপথে হাতেম একটি সর্পাকৃতি জিনকে অভিশাপ মুক্ত করেন। এরপর তিনি জিন ও দৈত্যের দেশ অতিক্রম করে কোকাফ সীমান্তে বাদশা মাহেয়ারের কন্যার পাণিপ্রার্থী জিনের ভ্রাম্যমাণ শাহজাদা মেহেরওয়ারের সাক্ষাৎ পান। মোতির ইতিহাস বর্ণনা করতে না পারায় শাহজাদা মেহেরওয়ার বাদশা মাহেয়ার কর্তৃক বিতাড়িত হন। হাতেমতা'য়ী এই ভ্রাম্যমাণ জিন শাহজাদার সহায়তায় পরেন্দা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মাহেয়ারের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং মোতির ইতিহাস বর্ণনা করে হুমনাবানুর মোতির জোড়া সংগ্রহ করেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন :

পেয়েছি মতির জোড়া শশম সওয়ালে, মখলুকের
আশ্চর্য সুন্দর আর মুগ্ধরূপ দেখি আমি চেয়ে;
আল্লাহর কুদরত দেখি শান্তিময় দুই যুক্ত প্রাণে।[২২]

অবশেষে হাতেমতা'য়ীর ঐকান্তিক আগ্রহে শাহজাদা মেহেরওয়ারের সঙ্গে মাহেয়ার নন্দিনীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। তারপর হাতেমতা'য়ী অমূল্য মোতির জোড়া নিয়ে শাহাবাদে ফিরে আসেন।

ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় বিমুগ্ধ কবি ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে হুসনাবানুর সপ্তম ও শেষ সওয়াল ছিল,—"পৃথিবীর অজানা প্রান্তে অবস্থিত ঘূর্ণ্যমান বাদগর্দ হাম্মামের কি রহস্য?"

এই সওয়ালের পথে হাতেমতা'য়ী পরীর রূপে সম্মোহিত এক শাহজাদাকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর এক প্রবীণ ব্যক্তির কাছে জানতে পারেন যে, কাতান দেশের বাদশা হারেস শাহার রাজ্যসীমানায় বাদগর্দ হাম্মামের এলাকা। হাম্মামের পথে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দুশ্চরিত্র জ্বিনের কবল থেকে তিনি একটি জনপদ রক্ষা করেন। হাম্মামের পথে দুশ্চরিত্র জ্বিনের সাথে যখন হাতেমতা'য়ীর সংঘাত ও যুদ্ধ বাধে তার চিত্র ছিল এরূপ :

এবার আগুন জ্বালো, ক্লীবত্বের
শঙ্কা ভুলে আনো শুষ্ক অরণ্যানী, পৃথিবীতে জ্বালো
অগ্নিশিখা লেলিহান, পুড়ে যাক প্রচণ্ড আগুনে
শয়তানের শেষ চিহ্ন, মিটে যাক নাম ও নিশানা
অত্যাচারী জালিমের পাপ-মুক্ত পৃথ্বিতল থেকে।[২৩]

তারপর বহুকষ্টে যাদুতেলেসমাতে ঘেরা বাদগর্দ হাম্মামের রহস্য অবগত হয়ে, যাদুর প্রভাবে আচ্ছন্ন ও প্রস্তরীভূত অনেক মুমূর্ষু মানুষকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করে শাহাবাদে ফিরে আসেন। সপ্তম সওয়ালের

---

[২১] তদেব, পৃ. ৩৮২।
[২২] তদেব, পৃ. ৪৬১।
[২৩] তদেব, পৃ. ৪৩৭।

মধ্যে কবির সত্য পরিচর্যার এক নিগূঢ় সম্বন্ধ ও গূঢ়রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যা মানবজাতির জীবনশৃঙ্খলার জন্য অতি সুদৃঢ় একটি স্বব্যাখ্যাত রূপ। এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে কবি বলেন :

সত্যের ঐশ্বর্য পাই বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে
সপ্তম সওয়ালে।[২৪]

সপ্তম ও শেষ সওয়ালের জবাব পাওয়ার পর হুসনাবানু জ্ঞানদীপ্ত মানসের অধিকারিণী হন। সংশয়ের যে তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব একদিন তাঁকে পৃথিবীর প্রতি বিমুখ করে রেখেছিল, সে সংশয় এবার অপসৃত হয়। হাতেমের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি তারপর মুনীর শামীরকে পতিরূপে বরণ করলেন। হুসনাবানুর সাথে আকাঙ্ক্ষিত মিলনের পর প্রেমিক মুনীর তাঁর পিতা, মাতা ও দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং হাতেমের অনুমতিক্রমে হুসনাবানুকে নিয়ে জন্মভূমি খরজমের পথে রওনা হন। আর স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হাতেম আবার নবোদ্যমে কুলমখলুকের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আর এখানেই 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিন. ইসলামি রেনেসাঁস ও ঐতিহ্যের জয়গান

ফররুখ আহমদ মূলত মানবতার কবি। তাঁর কবিতায় মানবিক মূল্যবোধ মাথা তুলে দাঁড়ায়। জয়ী হয় মনুষ্যত্বের জয়গান। ইসলামি সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়ে মানবচিত্তের মুক্তির নেশায় মুসলিম ঐতিহ্যের নব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাঁর কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী'-তে ইসলামি ঐতিহ্যের একটি সমন্বিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ও ঐতিহ্যের ধারা একটি সমন্বিত রূপের মধ্য দিয়ে ফররুখমানসে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ফলে তাঁর 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে মুসলিম পাঠক কেবল আত্মার প্রতিধ্বনিই খুঁজে পায়নি, বস্তুতপক্ষে তার অস্তিত্বের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসকেও আবিষ্কার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যে প্রকাশ :

হৃদয়ের প্রতি প্রান্তে তা'য়ী পুত্র অনুভব করিল তেমনি
আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ তীব্র--- তীব্রতর।
মিথ্যাময় মনে হল সামান্য স্বার্থের রং মহল
(সংকীর্ণ পিঞ্জর যেন);- আভিজাত্য কৃত্রিম জীবনে
মিথ্যা মনে হল তার। সঁপিল সে এলাহির নামে
নিজের সম্পূর্ণ সত্তা, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
নিল খুঁজে ইনসানের খিদমতের রাহা।[২৫]

ইসলামি ঐতিহ্য ব্যবহারের সময় ফররুখ আহমদ সব সময়ই মনে রেখেছেন যে, ঐতিহ্য মূলত উত্তরাধিকার। আর এই উত্তরাধিকারের সম্পদকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি কবিতার সম্পদ সমৃদ্ধির পথ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন ঐতিহ্য ভুঁইফোড় একটা কিছু নয়, তার মূল গভীরে নিহিত। সে কারণেই মূলের যে সব উপাদান সে সব উপাদান রস সিঞ্চন করে ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যকে প্রাণবন্ত সজীব রাখার প্রয়াস চালিয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্যকবিতায় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। পাশাপাশি ফররুখের মানবসত্তা তাঁর অন্তর্গূঢ় মর্মমূলে স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, ধর্ম ও সমাজ পরিস্রুত অভিজ্ঞান বহন করে। তিনি তাঁর কবিতায় মানবীয় আদর্শের উচ্চারণে ধর্মীয় প্রেরণার কথা স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। যেখানে প্রত্যক্ষ ধর্মীয় বা ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণার কথা ঘোষণা করেননি; সেখানেও তাঁর অধিমানসিক চেতনার সে ঐতিহ্যবোধ ঠিকই কাজ করে গিয়েছে।

---

[২৪] তদেব, পৃ. ৪৬১।
[২৫] তদেব, পৃ. ২৩৬।

স্বাভাবিকভাবেই ফররুখ আহমদ হতে পেরেছেন মানবীয় আদর্শের রূপকার। এ প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান বলেন :

> ফররুখ আহমদ ইসলামের ও ইসলামপূর্বকালের গৌরবময় ইতিহাস থেকে শক্তিদীপ্ত অসংখ্য প্রতীক, নাম বা প্রসঙ্গকে গ্রহণ করেছেন। সেখানে ইতিহাস আছে, রূপকথার অনাবিল ঐশ্বর্য আছে, আছে প্রাচ্য-মহাকাব্যের উত্তরাধিকারলালিত বর্তমানের মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়া, যে বর্তমান চিরকালীন জাগতিক বাস্তবতারই অনিবার্য প্রতিরূপ।[২৬]

আত্মবিশ্বাসী ফররুখ আহমদ আমাদের কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালন করেছিলেন। স্বপ্নচৈতন্য ও আদর্শে তিনি এক এবং একক। ইসলামি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে তিনি তাঁর কবিতায় রক্তের অনুপ্রেরণায় ধারণ করেছিলেন। শিল্পের উৎসারণ বলেই ফররুখ আহমদ এটি জানতেন। কিন্তু ছিলো না কোনো দৃষ্টিভ্রম। তিনি তাই আস্বাদন করতে পেরেছিলেন অনন্তলোকের আস্বাদন। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধারায় প্রবাহিত শুদ্ধ মানুষ ও শুদ্ধ কবি। তাঁর কবিতার এষণার সঙ্গে মিলে যায় এষণার, আনন্দের সঙ্গে বেদনার, স্থিরতার সঙ্গে অস্থিরতার। কিন্তু দ্রোহের সঙ্গে মিলে না কিছুই। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের কথা স্মরণ করা যেতে পারে :

> The possible interests of a poet are Unlimited; the more intelligent he is the better; the more intelligent he is more likely that he will have interests: our only condition is that he turn them into poetry, and not merely meditate on them poetically.[27]

জীবন জিজ্ঞাসার জোরালো তাগিদে পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন ফররুখ আহমদ। এজন্য তিনি ছিলেন সত্যিই ঐতিহ্যনিবিড়, বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। ইসলামের তওহিদবাদে তিনি জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন। এই তওহিদবাদকে ফররুখ আহমদ জীবনীশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই তওহিদবাদের মধ্য দিয়েই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। ফররুখ আহমদের কবিতায় তওহিদবাদ তাই জোরালো হয়ে উঠেছে। জীবনের সবক্ষেত্রেই তিনি একই আদর্শ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই কবির ভাষ্যে পাওয়া যায় :

> কুদরত খোদার
> যা এনেছে পৃথিবীতে অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে
> অস্তিত্বেও পরিপূর্ণ আলোকে, স্বাক্ষর আছে যার
> প্রতি ধূলি-কণা থেকে অন্তহীন সম্ভাবনাময়
> নীহারিকা-লোকে, সামান্য ভূণের চোখে এনে দেয়
> যে সহজে চেনার আলোক, খোলে পূর্ণতার পথ
> একদা সে প্রজ্ঞার আলোকে;—চিনি নাই সেই শক্তি
> পাপীর আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে।[২৮]

ফররুখমানস জীবনঘনিষ্ঠ মানবতাবাদী দর্শনের দীক্ষিত। তাঁর মৌলিক সুর মানুষ ও তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবন। এ জীবনের হিসেব-নিকেশ একেবারে সহজ কাজ নয়। বরং, অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়ে দাঁড়ায় জটিলতার গ্রন্থিমোচন। জীবনের ভেতরের জীবনকে, ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় বর্ণবৈচিত্র্যে ধারণ

---

[২৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর* (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ৮৭।

[২৭] T. S. Eliot, "The Mataphysical Poets," *Selected Essays*, p. 288.

[২৮] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২২।

করেছেন। একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেটি হলো, অনেক ক্ষেত্রেই ফররুখ আহমদের কবিতার গতিময়তা, সংগীতধর্মিতা ও চিত্রলতার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। কবিতায় প্রায়শই মানবচিত্তের ঘোষণা লক্ষ করা যায়। এ মানবচিত্ত সচেতন আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত। ফররুখ তাই তাঁর কবিতায় বলেন :

এই আমীরানা ঠোঁট হতে পারে লোভনীয়, তবু
অন্তরের দীনতা সে ঢাকে না কখনো। শুধু জানি
সত্যের কর্ণিকা তাকে তুলে নিতে পারে উর্ধ্ব স্তরে;
মুছে দিতে পারে তার গ্লানিমা সে আলোর প্রচ্ছদে।[২৯]

ফররুখ আহমদের কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী'-তে কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছিল। কারণ, একজন কবিকে বেঁচে থাকতে হলে এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হয়। মুনির শামীর ও হুসনাবানুর যে প্রেম 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে লক্ষ করা যায়, সেই প্রেমে কোন আত্মজিজ্ঞাসা নেই, নেই কোন মহান সত্যের ইঙ্গিত। তবুও সীমাবদ্ধ একমুখিতা কাব্যের মুক্তি আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক জেনেও ইসলাম, মানবতা, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যচেতনা সর্বোপরি শিল্পিত জীবনভাষ্যের মাধ্যমে জীবনের মুক্তি খুঁজেছেন তিনি। তাই তাঁর কাব্যে তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। ফররুখ আহমদ কোন অবস্থাতেই কাব্যভাবনাকে স্থবির, প্রবাহচ্যুত কিংবা আত্মসর্বস্ব করে তোলেননি। এক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন ইয়েটস্-এর মতবাদে বিশ্বাসী। 'Mande Gonne' এর উগ্র বিপ্লবী আদর্শ এবং O' leary-এর দেশপ্রেম ইয়েটস্কে ধরে রাখতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটে। কবি ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। প্রথম জীবনে তিনি মার্কসবাদী চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি ইসলামি রেনেসাঁর কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এখানে তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। জীবন ও পরিপার্শ্বের মধ্যে তিনি সত্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কবি ফররুখ আহমদের কাহিনীকাব্যে তাই সচলতা, অগ্রসরপ্রবণতা, প্রসারতা ও বিস্তৃতি আছে। তাই নতুনতর সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাওয়াই ছিল ফররুখ আহমদের কাব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চার. মানবতাবাদী চেতনার ধারাভাষ্য

ফররুখ আহমদের কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী'তে ঐতিহ্য ও মানবপ্রেমের এক মহামিলন লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে ফররুখ আহমদ ছিলেন মর্যাদাবোধের কবি। তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গির এক মহান ব্যক্তিত্ব। কালের বহমান ধারায় রক্ষিত ইসলামিক আদর্শকে তিনি তাঁর জীবনের পাথেয় হিসেবে ভেবেছেন। অন্য সব শিল্পীর মতই ফররুখ আহমদের সৃষ্টির মূল উৎস ছিল তাঁর ব্যথিত ও যন্ত্রণাদায়ক হৃদয়স্মৃতির অবগাহন। কখনো তিনি আনন্দের আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো আবার নিমজ্জিত হয়েছেন বেদনায়। সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে জীবনে, এগিয়ে যেতে হবে সামনের পানে। সমুদ্রের ঢেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জাহাজ ভাসিয়ে পৌঁছিয়ে নিতে হবে মঞ্জিলে মকসুদে। আলবুরজের চূড়ায় সব ঢেউকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হবে। তাকে হতে হবে বীর, অসম সাহসী। হতে হবে তাকে মরদের মতো। তাই 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে কবি বলেন :

অন্তহীন বেদনায় সে তখন আল্লাহর দরবারে
জানালো প্রার্থনা তার, "ক্ষমা করো সব অপরাধ"
মানুষের, শান্তি দাও শান্তিহারা প্রাণে; আলো দাও

---

[২৯] তদেব, পৃ. ৩৫৮।

দৃষ্টিহারা চোখে। শক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি খোদা
কুঅত, হিম্মৎ, দাও যেতে পারি যেন দূর পথে
ইনসানের খিদমতে সবচেয়ে দুর্গম প্রান্তরে।[৩০]

জীবনের রুক্ষতা, হতাশা, প্রাণহীনতার প্রতীকায়ন করেছেন ফররুখ আহমদ। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবেগরহিত হয়েছেন, ব্যবহার করেছেন লাবণ্যরহিত অনুভূতির এক সমুজ্জ্বল ধারা। তাই বিষয় ও পরিবেশ রচনার প্রয়োজনেই তিনি তাঁর কাব্যে 'হাতেমতা'য়ী'তে দূর অভিযাত্রীর বেশে আকস্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফররুখ আহমদের চেতনার অনুসারী হয়ে কল্যাণের সিন্দাবাদ আমাদের শুনিয়ে যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুভূতি, তার নতুন-নতুন সাফল্যের কাহিনী। ফররুখ আহমদ আলেফ-লায়লার সিন্দাবাদের তাৎপর্যময় ভাব ও ছায়াকে অবলম্বন করে কাব্য লিখেছেন। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, সমুদ্র, মরুভূমির বিশাল ও বিচিত্র পরিবেশের পশ্চাৎভূমির উপর এক গতিময় বিচরণশীল আত্মপ্রত্যয় জীবনের ঋংকৃতরূপ স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি, তাঁর অবচেতন মন কথা বলে উঠেছে বার-বার। এক্ষেত্রে ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার কথা মনে পড়ে যায় :

The Shorn and Parcell'd Oxus strains along
Through beds of stand and matted rushy isles-
Oxus forgetting the bright speed he had
In his high mountain cradle in pamere,
A foil'd circuitous wanderer: —till at last
The long'd—for dash of waves in heard, and wide
His luminous home of waters opens, bright
And tranquil, from whose floor the new-bathed stors.
Emerge, and shine upon the Aral sea.[৩১]

পুঁথিসাহিত্যের খুশবুঢালা আমেজ ফররুখ আহমদের চিত্তকে তন্ময় করে তুলেছিল। ফররুখ আহমদ ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের ভক্ত। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফররুখ আহমদ ২৩ জুলাই ১৯৫২ তারিখে অনুজ কবি আবদুর রশীদ খানকে একটি পত্রে লিখেছেন:

> আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথিসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে।[৩২]

অসাম্প্রদায়িক ফররুখ আহমদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি ছিল ইতিবাচক অর্থেই। তাঁর মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। ধর্ম ফররুখ আহমদের কাছে অন্ধ শক্তি নয়; বরং উন্মুক্ত ও উদার চেতনার এক ব্যঞ্জনাধর্মী সত্যের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাছে ধর্ম বা ইসলাম অবধারিত হলেও আয়ত্ত-বহির্ভূত নয়। তিনি কাব্যে সম্ভাবনাময় মানুষ প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে সেটিই দেখাতে চেয়েছেন। জাতীয় জীবনের যাবতীয় বিষয় একটি নতুন সুরে ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের ঐশ্বর্য ও যশ তাঁর ব্যক্তিক অভিব্যক্তির সুদূরপ্রসারী যোজনায় তুলে ধরেছেন, যা আমাদের ক্লাসিক সাহিত্যের অঙ্গনে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। কেননা এই কাহিনীকাব্যের মধ্যে ফররুখ

---

[৩০] তদেব, পৃ. ৪৫।

[৩১] Mathew arnold, "Shorab and Rustom An Episode", *A Book of English Poetry*, George Beaumont (ed) (London: T.C. & E.C. Jack Ltd.,1917), p. 466.

[৩২] ফররুখ আহমদ, 'পত্রাবলী', ১০ সংখ্যক পত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ফররুখ আহমদঃ জীবন ও সাহিত্য' (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১২১।

আহমদ সুস্থ, আশাবাদী, মানুষকে দেখেছেন। কেবল ক্ষয়গ্রস্ত মানুষকে দেখেননি, মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখেছেন, শ্যামল ছায়া দেখেছেন। ফলে এই কাব্যে মানুষ ও জনগোষ্ঠীর তথা স্বজাতির বিকাশ উচ্চতর হতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে সম্পাদক তৈয়েবুর রহমান লিখেছেন :

> সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফররুখ বলতেন, "হিন্দুরা তাদের সাহিত্যের সোর্স পেয়েছে 'রামায়ন', 'মহাভারত' থেকে। বাঙালী মুসলমানকেও সাহিত্যের উৎস খুঁজে নিতে হবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে।" নিজের প্রসঙ্গ টেনে একদিন বললেন, "আমি অবশ্য 'হাতেমতা'য়ীকে কেন্দ্র করে লেখা শুরু করেছি"। কখনো কখনো আরো বলতেন, "দেখুন, গ্রামে-গঞ্জে যে 'কাসাসুল আম্বিয়া' পড়া হয় তাকে কেন্দ্র করেই অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।"[৩৩]

তাই দেশ, জাতি, ও সমাজজীবনের কঠোরতা কখনোই ফররুখ আহমদকে আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কঠিন পথে অকুতোভয়ে চলেছেন কবি। সৃষ্টি করেছেন কাব্যসৌন্দর্য। যেমনটি 'The song of the sel'-এর মাধ্যমে হুইটম্যান করেছেন, 'Le Voyage'-এর মাধ্যমে করেছেন বোদলেয়ার, 'বিদ্রোহীর' মাধ্যমে করেছেন, নজরুল ইসলাম।

পাঁচ. সমাজসচেতন ও অভিযাত্রিক

'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে একজন সম্পূর্ণ কবিমানসের অধিকারী ফররুখ আহমদ তাঁর মানবকেন্দ্রিক ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাব্যে তিনি একটি ভিন্ন কৌতূহল-উদ্দীপক জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। মানবিক সমস্যা ও সংকটের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যহারা মুসলমানদের মধ্যে যে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল, ক্রমশ তাঁরা স্বতন্ত্র সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ফলত সাহিত্য ক্ষেত্রে নবতর ঐতিহ্য সৃজনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁদের উদ্দীপ্ত করেছিল একথা নিঃসন্দেহে অনুমেয়। 'বিশেষত দার্শনিক মনীষী ইকবাল মুসলমানদের সামনে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমি গঠনের যে আদর্শ এবং দার্শনিক ভিত্তির চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকই তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। ফররুখ আহমদ এদেরই একজন।'[৩৪] তাই তাঁর কাব্যে যে সমাজসচেতনতা লক্ষ করা যায়, তা মূলত ইতিহাসমনস্কতা দ্বারা প্রভাবিত। এদিক থেকে তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে যেমন অতীত ও বর্তমানকে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাঁর কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। এরই সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন সমাজ, দেশ ও চেতনার সুতীব্র আবেগ ও উদ্দীপনা। ফলে উভয়েরই সংমিশ্রণে এক নবতর কাব্যপথ নির্মাণ করলেন ফররুখ আহমদ। 'মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশল রাজনৈতিক ব্যগ্রতা। আত্মসম্বিত ফিরে পাবার জন্য আগ্রহ হলো তাঁদের প্রবল। সে প্রাণশক্তিতে ইসলাম একদা জয় করেছিল এদেশ, জয় করেছিল বহুদেশ।[৩৫] এ প্রসঙ্গে আমরা ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে এর সুদূরপ্রসারী অতীত ঐতিহ্যের স্বরূপ খুঁজে পাই।

> দুই আঁধারের মোহানায়
> এ জীবন, যেন এক দীপ-শিখা দীপ্ত শামাদানে
> জানে না জ্বলার আগে কি ছিল পশ্চাতে; জানে না সে

---

[৩৩] তৈয়েবুর রহমান, "অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৯৯।

[৩৪] মাহবুবা সিদ্দিকী, *আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ২৫৩।

[৩৫] তদেব।

কি আছে সম্মুখে। জ্বলে যায় নির্ধারিত ক্ষণটুকু
সম্পূর্ণ অজানা এক আঁধারের তরঙ্গে হারাতে।
তুষার কুয়াশাচ্ছন্ন মেরু ছেড়ে পাখীরা যেমন
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে খেলা করে অচেনা বিদেশে,
দিন শেষে উড়ে যায় আরো দূর সুদুর্গম দ্বীপে
তেমনি আমি হব যাত্রী সুদূরের।[৩৬]

ফররুখ আহমদ সমাজসচেতন অভিযাত্রিক কবি। তাঁর এ অভিযাত্রা দেশ ও কল্যাণমুখী এবং নির্যাতিত মানুষের জন্য স্বপ্নপূরণের এক মহান উদ্যোগ। অচেতন জাতিকে জাগিয়ে তোলার মহানমন্ত্রে উজ্জীবিত এই কবি। সমুদ্রের চারিদিক জলের মতই শত্রুবেষ্টিত। লড়াকু হয়ে এই অপশক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে। এ জন্যে চাই দৃঢ়সংকল্প, আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি সর্বোপরি দুর্জয় প্রাণশক্তি। জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ ফররুখ আহমদ খুব ভালো করেই জানতেন জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবন চলার পথে-পথে নানা রকম বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতাকে জয় করেই এগিয়ে যেতে হবে সামনের পানে। এই ঘুণেধরা সমাজের বাধাবিপত্তিকে দলিত-মথিত করে, মরণযন্ত্রণাকে দাবিয়ে রেখে শুচি করতে হবে এগিয়ে চলার পথ। তাই অভিযাত্রিক হাতেম রাষ্ট্রনায়কের, দেশনায়কের প্রতীক যা সিন্দাবাদের মতই ক্রমাগত বয়ে বেড়াচ্ছে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে। অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে তায়ীপুত্র হাতেম। সমাজ থেকে দূর করবে সব অনিয়ম ও যন্ত্রণার বিচিত্ররূপ। তাই ফররুখ আহমদের কাহিনীকাব্য 'হাতেমতা'য়ী'-তে এর উল্লেখ পাই এভাবে :

বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফেরায়ে আবার,
দাও ইনসানের হক। যে দৌলৎ আছে সঙ্গোপন,
পাবে যা সামান্য শ্রমে;— মনে রেখ একমাত্র তুমি
তার অধিকারী নও। নিল যারা স্বেদ ও শোনিত,
যাদের রক্তের মূল্যে বেবাহা দৌলৎ, সম্পদের
অধিকারী তারা, তারাই ঐশ্বর্য পাবে— জিন্দেগীতে
পেল যারা ক্রমাগত বঞ্চনা; অথচ শ্রমশীল
প্রবঞ্চিত সেই সব বান্দা এলাহির।[৩৭]

ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্বদেশ মন্থনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। স্বদেশের শ্যামল নিসর্গ, পরিবেশ, প্রতিবেশ তাঁর কাব্যে জায়গা করে নিয়েছে। জন্মভূমির প্রভাব থেকে কবির স্বপ্ন কখনোই নিযুক্ত কিংবা বিমুক্ত হয়নি। সমকালের পরিবেশগত অসহায়তার কথাও এসেছে তাঁর কবিতায়। তবু সমকালকে ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন কবি। তিনি বুঝেছিলেন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই জীবনের জন্য শ্রেয়তর। কঠিন সংকটের কালে সরব হয়ে কবি তাই উচ্চারণ করেন:

এ দুর্গম শিলারণ্যে চলে গেছে অগ্রগামী যারা
(সংখ্যাহীন নারী-নর) পদচিহ্ন রাখে নাই কেউ,
পানির রেখার মত মুছে গেছে স্মৃতির রেখারা
সময়ের খরস্রোতে, পথ-চিহ্ন পায় তবু খুঁজে
অত্যন্ত সহজে যাত্রা নবাগত যারা এ সড়কে
(দুনিয়ার দুঃখ-সুখ, কৌতূহল, আনন্দ পারেনি
ফেরাতে যাদের টেনে, পারে নাই কোন স্বপ্ন, আর

---

[৩৬] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ৩৫৫-৫৬।

[৩৭] তদেব, পৃ. ২৮৬-৮৭।

যাদের ফেরাতে পৃথিবীর আকর্ষণ পারে নাই
চলে গেছে তারা আগে, চলে যাত্রী অসংখ্য অশেষ
এখনো পাহাড় পথে দুর্নিবার সেই আকর্ষণে)।[৩৮]

ফররুখ আহমদের আদর্শ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়ে দেবে। কারণ ফররুখ আহমদ তাঁর জীবৎকালে ইসলামকে নিয়ে কাপুরুষদের সুবিধা লোটার কাড়াকাড়ি দেখলেও আজ বিশ্বব্যাপী আত্মদানকারী তরুণ-তরুণীরা নিজের রক্তের বিনিময়ে তা কিনে নিয়েছেন। কিনে নিচ্ছেন ইরানে, মিশরে, সিরিয়ায়, লেবাননে তথা সারা মধ্যপ্রাচ্যে। যেখানে রক্তদান ও ত্যাগ নেই, সেখানে ইসলাম আসে না। ফররুখ আহমদ তাই 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে বলেন :

সেরা ত্যাগ বীর, দাতা ও দিলীর থামে না অলীক যাদুর ফাঁদে,
সত্যের শিখা হয় না বন্দী কখনো অন্ধ রাতের বাঁধে,
সংঘাতে আর সংগ্রামে তার পূর্ণ প্রকাশ-অকুতোভয়;
পায় কামিয়াবি, সফলতা খুঁজে সত্যের পথে যে দুর্জয়।[৩৯]

ফররুখ আহমদের বড়গুণ হলো 'তাঁর মহতী আদর্শের, তাঁর সমকালের কোন প্রতিফলন না দেখে তাঁর নিঃসঙ্গ মনোনিবাসে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কোন কিছুর বিনিময়ে তাঁর এই নৈঃসঙ্গকে তিনি বিসর্জন দিতে রাজি হননি। এ জন্য দেখা যায়, তাঁর বন্ধু-বান্ধবের চেয়ে তাঁর বিপরীতপন্থিরাও তাঁর অস্তগমনে ব্যথিত হয়েছেন আন্তরিকভাবে।'[৪০]

বাংলাদেশের কিছু সমালোচক ফররুখ আহমদকে সম্প্রদায়বিশেষের কবি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যদি তার অন্তরে কোনো আদর্শের আদল থাকেও, তা সাহিত্যিকরূপেই প্রকাশিত হয়েছে এবং সে জন্যেই বিশেষবাদের কবি বলে সীমাবদ্ধের শিকার হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা অন্যায় হবে। ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী'র দোসরা সওয়ালের সফরের পরে পরিচ্ছেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যায় যে, কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কবির কলমে এই ধরনের উক্তির উদ্ভব হয় না:

আদমের আউলাদ,-এক খান্দানের গোত্রভুক্ত
নারী-নর, দেশে দেশে দূরান্তরে রয়েছে ছড়িয়ে
বহু বর্ণ অসংখ্য জবান কিন্তু রক্তধারা এক
এক অনুভূতি হৃদয়ের। হাসি ও কান্নার অশ্রু
বয়ে যায় এক ভাবে নীড়-বাঁধা জীবনে, অথবা
মরুচারী বেদুইন যাযাবর জীবনের স্রোতে।[৪১]

যে অনুভূতি ও উপলব্ধি উপর্যুক্ত আর্তকণ্ঠের জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলতে হয় ফররুখ আহমদের গোটা 'হাতেমতা'য়ী' কাব্য প্রেম ও মানবতাধর্মী রসে নিমজ্জিত। তাঁর মানবতার রূপ, আদর্শ ও প্রেমের স্বরূপ দেখার জন্য এই একটি কাব্যই যথেষ্ট।

আমাদের জিজ্ঞাসা হাতেমের পূর্ণসাফল্য ও বিজয়ের মৌল রহস্য কি? সে হলো আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর মানুষের প্রতি অবিমিশ্র প্রেম এবং তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ প্রেম। এই প্রেম মানুষের জন্য সর্বত্যাগীর, সর্বস্বত্যাগীর। দুসরা সওয়াল এর পরীর প্রেম পরিচ্ছেদে কবি প্রেমের শক্তির সেই ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন:

---

[৩৮] তদেব, পৃ. ৩৭৯।

[৩৯] তদেব, পৃ. ৩৪৭।

[৪০] আল মাহমুদ, "ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৪৪৫।

[৪১] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ২৮৫।

পারেনি যেখানে যেতে কোন প্রাণী শক্তিমান
কি করে সেখানে যাবে ঐ পরী নাজুক-প্রাণ !
প্রেমের শক্তি কাটবে কি তবে এ শর্বরী?
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী,
... ...
পারেনি কখনো থামাতে সে গতি গিরি ও দরি,
হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।[৪২]

এই মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ হাতেমতা'য়ীতে পরিশুদ্ধ পরিণতিতে পৌঁছেছিল। ফররুখ সচেতনভাবে ইসলামি জীবনাদর্শের পথ মানবমুক্তির সমাধান বলে ভেবেছিলেন। তাঁর পৌরুষময় ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ জীবনবাদীচেতনা এবং একই সঙ্গে আস্তিক্যবাদী বিশ্বাসীচিত্ত অন্য কোন ধর্ম অথবা অন্যবাদে আকর্ষণবোধ করেননি।

বিভাগপূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীতে একদিন ফররুখ আহমদের যে চেতনার উদ্ভব হয়েছিল; সেই চেতনা তাঁর বিভাগোত্তরকালে স্তিমিত হয়নি। ফররুখ আহমদ যে মানবতাধর্মী পাকিস্তান চেয়েছিলেন তিনি সেই পাকিস্তানিজীবন কোথাও পেলেন না। শোষকদের স্বরূপকে তিনি আরও প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি করলেন, দেখলেন মানুষের চিরকালের ইতিহাসের কারণ, নমরুদ ও ফেরাউনেরা, পাকিস্তানে নতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তবু তিনি নৈরাশ্যের চাপে নিভলেন না বরং তাঁর মুজাহিদ আত্মা আরও জোরদার হয়ে উঠল। কারণ, তিনি জানতেন মানুষের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস এবং মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সংগ্রামের পথেই। পাপ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবে না কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীর কাজ হবে মানুষকে পাপ ও পুণ্যের সুস্পষ্ট পথে চিনিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। যেমন হাতেম যখন হুসনাবানুর সাত সওয়ালের জবাব এনে দেয়, তখন হুসনাবানু জীবনের জন্য এক নতুন জগৎ অনুভব করে এবং হাতেমকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন:

আমার জীবন ছিল অজ্ঞতার
আঁধার জিন্দানে বন্দী, অকারণ ভ্রান্তি, অবিশ্বাস
তুলেছিল শুধু এক সংশয়ের প্রাচীর কঠিন
মানুষের মাঝখানে। কেটে গেছে সেই অন্ধকার,
সংশয়-বন্ধনমুক্ত আজ আমি এই পৃথিবীতে;
কৃতজ্ঞতা জানানোর তবু ভাষা নাই।[৪৩]

সুতরাং ফররুখ আহমদ তাঁর প্রেমবিশ্বাস, রীতি-নীতি, ও আদর্শিক ভাবধারাকে 'হাতেমতা'য়ী'তে মানবতাবাদী ধর্মের সেই মনীষাদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণীকে উৎকৃষ্ট কাব্য-পঙ্‌ক্তিতে বেঁধে রেখেছেন।

ছয়. ত্রিশোত্তর চেতনায় প্রেম ও রোমান্টিকতা

ফররুখ আহমদ রোমান্টিক ও সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় নিমজ্জিত নির্মোহ অভিযাত্রিক চেতনার কবি। ইকবাল ও ফররুখ আহমদের কাব্যিক চিন্তাধারার সাযুজ্য লক্ষণীয়। উর্দু ও ফারসি সাহিত্যের দিকপাল কবি ও দার্শনিক ইকবালের প্রভাব ফররুখ আহমদের জীবনে কেমন করে এত ব্যাপক তাৎপর্য লাভ করেছিল, সে সম্পর্কে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা কাজ করে।

ইকবাল আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বকে দার্শনিকের তত্ত্বভাবনার পথ ধরে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শ জীবনপন্থা অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানবজন্মে সার্থকতা

---

[৪২] তদেব, পৃ. ২৯৮।
[৪৩] তদেব, পৃ. ৪৫৪-৫৫।

অনুসন্ধানের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন। ফররুখ আহমদও রোমান্টিক, অতীতচারী; ঐতিহ্যের স্মৃতিলোক বিহারে তাঁর পরিতৃপ্তি সর্বাধিক। এ ঐতিহ্য চেতনার পেছনে ইতিহাসের বাস্তবসত্যের সমর্থনও কিছুটা আছে। এ প্রসঙ্গে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায় :

খোদার রহমে দেখি আমি উঠে নাই দরিয়ার রাগ,
কিশ্‌তী ভিড়েছে কিনারায় এসে সামনে সব্‌জা রাগ,
মধুর হাওয়ায় ফসলের শীষ দুলে যেন কথা কয়;
পরিচিত দেশ চিনেছি যখন কেটে গেছে দ্বিধা ভয়।
'য়েমনের লোভ ছেড়ে আমি সোজা এসেছি এ শাহাবাদে,
শুক্লা রাতের চাঁদ ডুবে গেছে তখন ভোরের ফাঁদে।[৪৪]

কিন্তু মন তাঁর প্রশ্নের জটিল অরণ্যে প্রবেশ করতে অনীহা প্রকাশ করে সব সময়ে। কোনো বিচারবিতর্কের পথ ধরে নয়, ইসলামি জীবনাদর্শের মহত্ত্বে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে ভর করে তাঁর কাব্যভাবনা অগ্রসর হয়েছে সব সময়ে। আদর্শ ও বাস্তবের বিশেষ কোন দ্বন্দ্বও তাঁর রচনায় উপস্থিত নয়। আদর্শের অনুধ্যানেই তিনি বিভোর সে আদর্শের চেতনা বাস্তব জীবন-ভাবনাকে প্রায়শই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাঝে-মাঝে স্বপ্নভঙ্গে তিনি বাস্তবের সমভূমে জেগে উঠে বিভ্রান্তবোধ করেছেন, বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রায় সব মুহূর্তেই পরমনির্ভরতার ভঙ্গিতে 'হেরার রাজতোরণের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সংশয়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি। জীবনবাস্তবের রূঢ়তার সম্মুখীন না হয়ে তিনি 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাথেয় অবলম্বন করে বাস্তবজগৎ থেকে স্বপ্নভাবনার ও রোমান্টিকতার জগতে পাড়ি জমিয়েছেন।

মাইকেল থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত সব মহৎ কবিই রোমান্টিক চেতনাবশে ঐতিহ্যের চর্চা করেছেন, সেই সাথে ফররুখ আহমদও ঐতিহ্যচেতনায় তাঁদের মতো প্রাগ্রসর মনের ছাপ অনুভব করেছেন। তবে ঐতিহ্যের অনুধ্যানে এদের সার্থকতা সর্বত্র সমান ঘটেনি। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ ঐতিহ্যসম্পদকে প্রায়শই নবমূল্যে উদ্ভাসিত করতে পেরেছেন। ফররুখ আহমদও 'হাতেমতা'য়ী' ও 'সাত সাগরের মাঝি'তে ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরণ ঘটানোর ক্ষমতা দেখিয়েছেন। দেশজঐতিহ্য ও জীবনসূত্রের সম্পন্নতার অভাবেই তার ঐতিহ্যসাধনা বাংলা কাব্যের মূলধারার অন্তর্গত হয়েও অনেকটাই অসংলগ্ন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকে গৌণ করে ইসলামি গৌরব স্মৃতি বিজড়িত মধ্যপ্রাচ্যের স্বপ্নই তার মনকে প্রভাবিত করেছিল অনেক বেশি। এটা তাঁর কাব্যের রসাবেদন বৃদ্ধিতে নিশ্চিতরূপে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তথাপি প্রেম, প্রকৃতি ও বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভাবনায় তিনি দেশজসূত্রের সাথে যোগ রেখে এ সীমাবদ্ধতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। যেখানে তিনি নিশ্চিতরূপেই বাংলা কাব্যের মূলভাব-প্রবাহের সাথেও যুক্ত। এ প্রসঙ্গে ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি উত্তর তিরিশের কবি হলেও তাঁদের জটিল জীবন-ভাবনার কাছ দিয়েও যাননি। যদিও কাব্যদেহের পরিমার্জনায় তিনি যুগের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে চলেছেন, মনোভঙ্গিতে তিনি মাইকেল থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত রোমান্টিক কবিদেরই সাথে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন বেশি।[৪৫]

তাই লিরিক কবির অন্তরাবেগের অধিকারী হয়েও ফররুখ আহমদের রসচেতনা আদর্শভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে অনেকটাই ক্লাসিক কাব্যের সংহতি লাভ করেছে। ভাবনার এক স্বতন্ত্রবৃত্তে আবর্তিত হলেও ফররুখ আহমদ অতি স্বাভাবিকভাবেই নিজ শিল্পাত্মার পুষ্টির উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন

---

[৪৪] তবেদ, পৃ. ৩৯৬।

[৪৫] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০০০), পৃ. ৩৯।

মাইকেল থেকে জীবনানন্দ ও তারও পরে প্রসারিত বাংলা কাব্যের বিচিত্র ধারায়। তিরিশোত্তর আধুনিক কবিরা যেমন ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে পূর্বযুগ থেকে ব্যতিক্রম ঘটিয়েই আপন-আপন মহাত্ম্য ঘোষণা করেছিলেন, ফররুখ আহমদও ঐ অর্থে একটা ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ভাবচিন্তার ক্ষেত্র প্রাগ্রসরণের পথ না ধরে, তিনি ঐতিহ্যের পথ ধরে বর্তমান থেকে নিজকে অপসৃত করে আধুনিক জীবন-বিকাশের প্রতি বিমুখতাই প্রকাশ করেছেন। যদিও কাব্যের শিল্পসম্ভাবনাকে নিত্য নতুন পরীক্ষায় ফেলে দেখতে তাঁর আপত্তি কখনোই দেখা যায়নি। লক্ষ করার বিষয় অতি আধুনিক কবিদের মতো তাঁর কাব্যের শব্দ সমাবেশেও একটা সঞ্চরণশীল মনোভাবের প্রকাশ রয়েছে। এ সঞ্চরণশীলতা সম্ভব হয়েছে কাব্যে তদুপযুক্ত অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমির আশ্রয় গ্রহণে। ফররুখ আহমদের কাব্যের উপমার জগৎ জুড়ে রয়েছে প্রধানত দরিয়া, আকাশ, মরুমাঠ, অরণ্য। ফররুখের কৃতিত্ব এখানে যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে হলেও তাঁর কাব্যে শব্দ ও উপমার বিচ্ছুরণ স্বভাব আছে। আর তাই তাঁর সীমিত কাব্যবৃত্তকে কিছুটা তাৎপর্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে। তাই ভাব ও ভাষায়, শব্দ ও উপমায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবির সাথে ফররুখ আহমদের সুস্পষ্ট যোগ লক্ষিত হয়। এদের প্রত্যেকেরই কল্পজগতে আকাশ, সমুদ্র, অরণ্য, বন্দর, নাবিক ইত্যাদির উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। এর দৃষ্টান্ত 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষযোগ্য :

পাহাড়ে, পাথরে দেখে 'লোহ্ জারি' অজানা বিস্ময়ে
হাতেমতা'য়ীর মন কেঁপে ওঠে অনিশ্চিত ভয়ে,
পাহাড় পেরিয়ে ফের দেখে চেয়ে সমুদ্র রক্তের,
বুঝিল হাতেম তা'য়ী এ দরিয়া হবে কহরের।
রক্তের সমুদ্র আর দেখে তার তরঙ্গ উত্তাল
গায়েবী কিশ্‌তীতে ফের পার হ'ল দরিয়া বিশাল।[৪৬]

গবেষণার প্রকৃতি ও সত্যের আলোকে দেখলে দেখা যায়, একদিকে 'আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাণকথা এবং কোরানে উল্লিখিত কাহিনীর ঐতিহ্য এবং অপরদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তার কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।'[৪৭] তাঁর প্রেম, সৌন্দর্য ও উদ্বোধনমূলক কবিতার ক্ষেত্রেও এ সত্যের খুব একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য ফররুখ আহমদের ঐতিহ্যভিত্তিক কাব্যসাধনার উপরোক্ত দুটি ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাত. প্রকৃতি ও নিসর্গভাবনা

বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারায় প্রকৃতিচেতনা বা নিসর্গভাবনা একটি পুরনো ঐতিহ্য। তিরিশোত্তরকালে প্রকৃতির এক স্বভাব ও শক্তির রোমান্টিক আর্তি নিয়ে কাব্যসাধনায় প্রবেশ করলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। ফররুখ আহমদের কবিতার একটি বিপুলতার অংশে ইসলামি নবজাগরণের বাণী প্রতিফলিত হলেও মানবতা, প্রেম ও প্রকৃতিও তাঁর কাব্যে মোটেই অনুপস্থিত নয়। ফররুখ আহমদের রচনায় মরুদুলাল হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর উত্তরসাধকদের কীর্তিগাথা বিশিষ্ট স্থান লাভ করায় পরিমণ্ডল সৃষ্টির তাগিদে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের শিল্পসম্মত ব্যবহারের প্রয়োজন যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি আরব আজমের প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। এ সব সত্ত্বেও কবি যে এই বাংলারই সন্তান তা তিনি

---

[৪৬] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ৩৮৫।

[৪৭] হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫), পৃ. ১৯৫।

মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। আসলে কোন কবির জীবনদর্শন যাই হোক, কবি তার রূপায়ণ অবশ্যই প্রথমত দেখতে চান 'স্বদেশের মাটিতে; তার জন্মভূমির প্রভাব থেকে তাঁর স্বপ্ন কখনোই বিমুক্ত বা নিযুক্ত হতে পারে না।[৪৮] আর ফররুখ আহমদও সেই একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে কামনা করেছেন এরূপ চিত্র :

হাতেম তা'য়ীর চোখে (শুনেছে যা সহস্র বৎসর
মরুচারী যাবাবর অসমান বালু রুক্ষ মাঠে
রাত্রির ডেরায়, কিম্বা সমতলে পাতার কুটিরে
সংখ্যাহীন নারী-নর যে কাহিনী উৎকর্ণ বিস্ময়ে);
খোদার রহম চেয়ে সে কাহিনী শোনাবে আবার
'দীপ্ত চিরাগের' পথে জেগে আছে তনু-আত্মা যার।[৪৯]

বস্তুত এটাই স্বাভাবিক। আর এজন্যেই মূলত ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের কবিতায়ও আমরা দেখি বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মাঝে-মাঝেই অপরূপ মনোহারিত্ব নিয়ে ধরা দিয়েছে। ফররুখ আহমদের একাধিক কবিতায় ও কাব্যে এ সত্যের স্বাক্ষর পরিস্ফুট। কবির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'হাতেমতা'য়ী'তে এর প্রচুর নমুনা লক্ষযোগ্য।

নিসর্গ বর্ণনাকে কবি ফররুখ আহমদ আধুনিক কবিদের মতো জটিল মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখেননি। সমসাময়িকদ ইংরেজ কবিরা যে অর্থে নিসর্গকে ব্যবহার করেছেন বা তারো আগে এলিয়ট, অডেন যেভাবে ব্যবহার করেছেন বা তাঁর সমসাময়িক বাঙালি কবিরা যে সূক্ষ্ম ও দূরবর্তী অর্থে নিসর্গকে ব্যবহার করেছেন, তিনি সেই জটিল মানসিক বা আধ্যাত্মিক অর্থে নিসর্গকে চিত্রিত করেননি। ফররুখ আহমদের কবিতায় নিসর্গ বা প্রকৃতি প্রধান উপস্থিত বিষয় নয়, যেমন জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ও কবিতায় উপস্থিত। তাঁর কবিতায় নিসর্গ বর্ণনামূলক এবং সহজ ও সরল অর্থে বর্ণিত। এজন্য তাঁর উপমা-চিত্রকল্প নিসর্গকেন্দ্রিক হলেও পুরোপুরি নিসর্গনির্ভর নয়। সমসাময়িককালের অনেক বাস্তবচিত্রও তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তথাপি এ কাব্যে তাঁর কুশলতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। ফররুখ আহমদের কবিতার একটি বিশেষ গুণ হলো তিনি যে মেজাজে লিখতে শুরু করেন, যে অবস্থা বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেন, রূপক-উপমা-চিত্রকল্পের স্রোতে কোথাও তা স্খলিত হয় না, নষ্ট হয় না। অভিজ্ঞতা, অনুভূতির এই সম্পূর্ণতা তাঁর কাব্যকে যথেষ্ট স্থিরতা, ব্যাপ্তি বা গভীরতা দিয়েছে। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে এর দৃষ্টান্ত :

মধুগন্ধী মেওয়াজাত
আঞ্জির, আনার, সেব পূরে ওঠে রসের সঞ্চয়ে,
গন্দম, ধানের ক্ষেতে স্বর্ণশীষে জমা হয় এসে
মুক্তা দানা ফসলের; শেষ হলে সোনালী মৌসুম
ঝরে যায় এ মাটিতে।[৫০]

রূপ-রস-গন্ধময় নিসর্গ বর্ণনায় ফররুখ আহমদ জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তুলনীয়। জীবনানন্দ দাশ যেমন তাঁর ইতিহাস-ভূগোল চেতনায় সুদূর মিশর ব্যবিলনের চিত্র বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত রোমান্টিক মেজাজে, ফররুখ আহমদও আরব-ইরানের যে কোনো বর্ণনায় তেমনি সাবলীল, রোমান্টিক। কিন্তু সর্বত্র একটি জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হলো, ফররুখ আহমদ নিসর্গ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত নন

---

[৪৮] অধ্যাপক আবদুল গফুর, "ফররুখ-মানস : তাঁর কবিতা" *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৩৪৫।

[৪৯] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ২৩৮।

[৫০] তদেব, পৃ. ৩৬৫।

কখনো। বরং একটি মৃদু বেদনা, কোমল অনুভূতি তাঁকে ঘিরে রেখেছে সব সময়ে। এই বেদনা কি তাঁর সহজাত অর্থাৎ যুগ-দেশ-কালের প্রতি সচেতন অনুভূতিসমূহের ভিতর প্রকাশ? তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই বিষাদ বাতাস। একটি অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট এবং ধরাছোঁয়ার বাইরের কোন জগৎ থেকে যেন তিনি উঠে এসেছেন। পৃথিবীর সব দিগন্তে আবিষ্কার করেছেন নামহীন এই বিষাদ অনুভূতিকে। তাই তাঁর প্রকৃতি নিথর, নীরব এক মহাকল্পনার দুঃখভারাক্রান্ত জীবনচিত্র। এ প্রসঙ্গে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে প্রকাশ :

মনের প্রশান্তি, স্বপ্ন, মাধুর্য, প্রীতি ও মুহব্বত
ঝরে যায় যার স্পর্শে, পুড়ে যায় সকল সুষমা;
জ্বলেছি জিন্দেগী ভর আমি সেই হিংসার আগুনে।
পাইনি কখনো শান্তি।[৫১]

কবি ফররুখ আহমদের অনুভব নিশ্চিতভাবে সর্বসাধারণের জীবনে প্রোথিত। তাঁর কাব্যে সেই সাহসেরও পরিচয় বিধৃত। এই অনুভব আর সাহসের উজ্জীবনই কবিকে অবিচল আদর্শবাদিতা, স্বদেশের মৃত্তিকা ও প্রকৃতিসংলগ্ন করে তোলে। ইসলামকে তিনি শুধুমাত্র একটি ধর্ম, একটি মূল্যবোধ কিংবা অনুভব হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং এর অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শকে তিনি জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মুক্তির কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে মনে করেন।[৫২] পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে তার নাড়ির গভীর সম্পর্ক সুপ্রকাশিত হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আঙ্গিক প্রকরণে। তাই কবির কণ্ঠে শোনা যায় বিচিত্র বিষয় ও প্রকৃতির মহামিলন সমারোহ। একই সাথে ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রকৃতি ও সংগ্রাম উঠে এসেছে অবলীলায় বিভিন্ন প্রকরণে, নানা অভিব্যক্তি নিয়ে। তাঁর আদর্শিক কবিতা কৃতিত্বে তিনি নিপুণতার সঙ্গে সংস্থাপিত করেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উপকরণ। এই প্রক্রিয়ায় তিনি অন্বেষণ করেন অফুরন্ত সৌন্দর্য। তাই অনাহারী, হরিজন, আর শোষণের শিকার যারা তাদের কাছ থেকে নতুন সংগ্রামের উপমা খুঁজে পান কবি ফররুখ আহমদ। প্রত্যয় দৃঢ়কণ্ঠে কাব্যে আহ্বান জানান :

দেখে নাকি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্র বেড়াজাল শোষকের? দেখে নাকি চার পাশে
অনাহার ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি, মাঠ
কিংবা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়ে নি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে।[৫৩]

১৯৪৭-পরবর্তী সাহিত্যে বাংলার জীবন ও প্রকৃতিতে কবি ফররুখ আহমদ রূপে ও সত্তায় অম্লান থেকে অপর বিশ্বের সৌন্দর্যালোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন অতি সহজে। মরুচারী দিগ্বিজয়ী, শৌর্য-বীর্য ও রূপচেতনা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়েছে এবং সত্য-মিথ্যার দ্বান্দ্বিকতা নিষ্ক্রান্ত করে দিতে যথেষ্ট নির্দেশক হিসেবে কার্যকর হয়েছে। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে এর চিত্র যেমন :

মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন সেই অন্তহীন বেবাহ ময়দানে
ঘুরিল হাতেম তা'য়ী; অন্ধকার রাত্রির আসমানে
কক্ষচ্যুৎ উল্কা এক ছুটে চলে যেমন আঁধারে,
পায় না পথের দিশা, কিংবা এক অরণ্য-কিনারে
সামান্য আলোক নিয়ে ঘুরে মরে জোনাকী যেমন

---

[৫১] তদেব, পৃ. ৪০৯।
[৫২] ফাইজুস সালেহীন, "ফররুখ মানস : তাঁর কবিকৃতি", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ৫৩০।
[৫৩] ফররুখ আহমদ, *হাতেমতা'য়ী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬), পৃ. ৭৪।

পায়না বনের শেষ সীমান্ত।[৫৪]

ফররুখ আহমদ 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে পুরো বাংলার প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও আমেজকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক রূপের মোহনায় দাঁড় করিয়েছেন। ফলে তাঁর বাংলা একটা নিজস্ব স্বভাব ও শান্তির আঙিনায় দাঁড়িয়ে কখনো-কখনো আরব-ইরানির চিত্রকল্পে ভাসমান হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে বিচিত্র ফুল ও ফলের, স্থান ও কালের, জীব-জন্তু, পশু-পাখি ইত্যাদির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। দেশীয় বিষয় ও পরিবেশের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন ভিন্নদেশির আর এক নতুন বিষয় ও সংস্কৃতির স্বরূপ। ফলে তাঁর 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের বিষয় ও চেতনার মান আরো শক্তিশালী হয়ে বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক প্রকৃতিসত্তায় নিমজ্জিত হয়েছে। ফররুখ আহমদের কাব্যে বিভিন্ন স্থানের নাম যেমন: সাহারা, কেনান, হেরা, মক্কা, মদিনা, আরব, ইরান, হাবেদা, পাহাড়তলী, কোহেনেদা, ইয়েমন, খরজম, বরজখ (দ্বীপ), কাতান (দেশ), বাগগর্দ হাম্মাম (যাদুপুরী), মাজেন্দ্রান ইত্যাদি। চীনদেশ ফররুখ আহমদের কবিতায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিচয় যেমন:

ক. চীন মুলুকেতে যাব যদি থাকে জিন্দেগী আমার।[৫৫]

খ. 'হাতেমতা'য়ী'র চোখে জাগে চীন সফরের খাব।[৫৬]

বৃক্ষ-তরুলতা, লতা-গুল্ম, ও বিভিন্ন ধরনের কাঠের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের মধ্যে। যাতে বাংলার রূপ ও গ্রামীণচেতনার এক রোমান্টিক পরিবেশ কবি উপহার দিয়েছেন। বিচিত্র ধরনের বৃক্ষ-লতা ও গুল্ম-প্রকৃতি যেমন – নুরপেজগাছ, নুররেজ ফুল, জলপাই, খেজুর, নার্গিস, আঙুর, গন্ধরাজ গুলমোহর, গুবাক, গোলাপ, চামেলি, রক্তকরবী প্রভৃতি। ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী'র "সফর-নামা" অংশে উল্লেখ আছে:

ফোটে ফুল
নার্গিস, গোলাব, লালা (সাকী যারা নওবাহারের),
হেনার সুরভি ক্ষরে গ্রীষ্মতপ্ত বনের সীমায়;
নামে সন্ধ্যা স্বর্ণচামেলির।[৫৭]

এখানে ফররুখ আহমদের মাটি, গাছ, ফুল ও প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। বাংলার মা, মাটি ও নিসর্গ কবি ফররুখ আহমদের জীবনাভিজ্ঞতার এক নির্যাস ফসল। ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন ও অভিজ্ঞতার মর্মমূলে কবি ফররুখ আহমদের প্রকৃতিসত্তা এক জীবন্ত দিক নির্দেশনা বহন করে।

আট. চরিত্র রূপায়ণ

ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে বিভিন্ন চরিত্রের সমাগম লক্ষ করা যায়। জীবন ও জগতের বিষয় নির্বাচনে চরিত্রনির্ভর ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞানানুশীলন, চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ও কোনো লক্ষ্য প্রচারের অভিবাসন, এমনকি সেইসাথে সত্যনিরূপণের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি, সাহস ও অভিযাত্রার প্রয়োজন হয় 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে তা চারিত্রিক সমভিব্যহারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুথির রসলোক থেকে কাব্যবস্তু গ্রহণ করে, তাকে নতুন কাব্যিক মহিমাদানের প্রয়াসে ফররুখ আহমদ নিঃসঙ্গ পথিক একথা অবশ্য সর্বজনবিদিত। সৈয়দ আলী আহসানের 'চাহার দরবেশ' এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তথাপি এ ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টা যেরূপ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী, অপর কারোই

---

[৫৪] তদেব, পৃ. ২১২।

[৫৫] তদেব, পৃ. ৭১।

[৫৬] তদেব।

[৫৭] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ৩৬৫।

সেরূপ নয়। বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যকে দৃঢ় ভিত্তিভূমি দানের উদ্দেশ্য নিয়েই ফররুখ আহমদ পুঁথির রসলোকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবের এক কিংবদন্তির খ্যাতির অধিকারী মহাপ্রাণ মানুষ হাতেমতা'য়ী কেমন করে এবং কবে দেশকালের সীমান্ত পেরিয়ে উপমহাদেশীয় জনচিত্তে বিশেষত মুসলিমমানসে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসন চেপে বসেছিল তা কে জানে? পুঁথিরচয়িতা মুসলিম কবিদের হাত দিয়ে হাতেম চরিত্র বাংলা কাব্যের অন্তর্গত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণ হাতেমের কিস্‌সা শুনে আরও কতকাল আগে থেকেই পেয়ে এসেছিল অপরিসীম পরিতৃপ্তি তা কে নির্ণয় করবে? আধুনিক জীবনভাবনায় ও জীবনজিজ্ঞাসায় এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বস্তুত হাতেম চরিত্র যে মুসলিম কবিদের দৃষ্টিতে অনেকটা মহিমান্বিতরূপে দেখা দিয়েছিল, তা পুথিকার সৈয়দ হামজার উক্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে। হাতেম মুসলমান ছিলেন না, এ কথা ভেবে পুথিকার আফসোস করেছেন। সৈয়দ হামজা এ চরিত্র সম্পর্কে এমন সশ্রদ্ধ উক্তিও করেছেন যে মুসলমান হলে এ চরিত্র পেত নবীর আসন। কবির সেই আবেগময় উক্তি :

হামজা বলে হাতেম হইলে দিনদার
পয়গম্বরি দরজা দিত পরওয়ারদেগার।[৫৮]

মূলত হাতেম-চরিত্র বহুশত বছর পূর্ব থেকেই মুসলিম জনমানসে এক অপরূপ প্রীতি ও ভালোবাসার মূর্তি নিয়ে উপস্থিত। প্রাক-ইসলামি যুগের মানুষ হলেও তিনি আপন উদার মানবিক জীবনাদর্শের দৃষ্টান্তেই বিশ্বমুসলিমের জীবনে এক উজ্জ্বল ঐতিহ্যের বিভারূপেই গৃহীত হয়েছেন। পুথির নহর বেয়ে সেই বার্তা কবির প্রাণের মোহনায় এসে মিশেছে। কবিও নির্দ্বিধায় তাঁকে আদর্শ মুসলিম চরিত্রের প্রীতিরূপ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। এতে ইতিহাস কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও কবির কাব্যাদর্শের তেমন কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং তা ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শকে ব্যাপকভিত্তিক করে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন। আরব্য উপন্যাসের অবিস্মরণীয় কাহিনীগুলোর মতোই অজস্র রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরপুর 'হাতেমতা'য়ী' আখ্যায়িকাকাব্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনাজালের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হাতেমতা'য়ী। তাঁরই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রে অজস্র টুকরো কাহিনী একটি কাব্যদেহে বিধৃত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে হাতেমকে মনে হবে রূপকথার নায়কের মতোই অসম্ভব ও অদ্ভুতের জগতে বিচরণশীল এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বীরপুরুষ রূপে। তবু বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কবি পুথিকারদের মতো হাতেমের আশ্চর্য কেরামতির কাহিনি বর্ণনা কীর্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি হাতেমের সমগ্র কার্যধারাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যদানের প্রয়াস পেয়েছেন। ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে হাতেম পুঁথির কল্পকাহিনীর নায়ক মাত্র নন; তিনি মানবপ্রেমিক ও সত্যসাধক।

'হাতেমতা'য়ী কাব্যে হাতেমকে আমরা পাই জীবনরহস্য সন্ধানী এক মহাপথিকরূপে। সত্যসন্ধানী মানুষের জীবনসাধনার দুরূহতা ও মহিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চরিত্রে। ঈশ্বরের মহিমায় অটুট বিশ্বাসে, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের বলে, পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারে এবং অহংবোধবর্জিত জ্ঞানসাধকের মান বৈশিষ্ট্যের বলে পৌঁছিতে পেরেছিলেন জীবনের সে দুর্গম রহস্যলোকে। যাদু, তেলেসমাত ও অলৌকিকের জগতেও তাঁকে পথ দেখিয়েছে তাঁর আত্মার আলোক। তাই কবি বলেন :

আল্লার সৃষ্টিকে তুমি ভালবেসে জানাও স্রষ্টাকে
ভালবাসা। যে খালেস্ মুহব্বতে পয়দা হল এই
দুনিয়া জাহান, জ্বিন, প্রাণীকুল আর আশ্‌রাফুল
মুখলুকাত এ মানুষ ; ভালবাসো, ভালবাসো তাকে;

---

[৫৮] ছৈয়দ হামজা, *ছহি হাতেমতাই* (ঢাকা: সোলেমানিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ. ৬২।

প্রেমের সান্নিধ্যে যেন দূরে যায় সব সঙ্কীর্ণতা।[৫৯]

বীরত্ব, ধীরত্ব, মানবপ্রেম, জ্ঞান যা কিছু মানবচরিত্রের মহিমাদ্যোতক সবই হাতেম চরিত্রকে দিয়েছে একটা অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য। হাতেমকে তাই অনেকটাই মহাকাব্যের নায়কের লক্ষণযুক্ত চরিত্র বলে মনে হয়। সাত সওয়ালের সরণি অবলম্বন করে জীবনরহস্যের সন্ধানে দুর্বার অভিযান চালিয়ে যেভাবে তিনি বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে অবশেষে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছেছেন, তা কোনো মহাকাব্যের নায়কের বিজয় অভিযানের চেয়ে কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়। বোধহয় হাতেম চরিত্রের এ মহিমা ও তার এক ব্যাপক প্রতীকীতাৎপর্য লক্ষ করেই কোন-কোন সাহিত্য সমালোচক 'হাতেমতা'য়ী'কে মহাকাব্যরূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসেঙ্গ আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন :

> ফররুখ আহমদের 'হাতেমতা'য়ী'কে প্রাচীনকালের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে যারা এর বিচার করবেন তাদের পক্ষে 'হাতেমতা'য়ীকে মহাকাব্যের মর্যাদাদেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু কালে কালে যুগে যুগে অন্য সবকিছুর মতো সাহিত্যে কাব্য মহাকাব্যের ধারণাও বদলেছে-বদলে যেতে বাধ্য।[৬০]

'ফাউস্টে'র সাথে 'হাতেমতা'য়ী'র মিল দেখিয়ে সাহিত্য সমালোচক বলেন, – "ফাউস্টে'র মতো এতেও নানা ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন আছে। তাছাড়া প্রতীকধর্মী চরিত্রসৃষ্টি 'হাতেমতা'য়ী'-তে সুপ্রচুর। মানবতা বা Humanism হচ্ছে 'হাতেমতা'য়ীর মূলসুর। এ গ্রন্থের নায়ক হাতেমতা'য়ী একটি গগনস্পর্শী মহান চরিত্র। জীবন রহস্যের বিজয়াভিযানের চাইতে কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়।"[৬১]

'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের অপর দুটি প্রধান চরিত্র হুসনাবানু ও মুনীর শামীর চরিত্রও অনেকটা একমাত্রিক। কাব্যমধ্যে এদের ভূমিকা অনেকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। যা কিছু সক্রিয়তা হাতেম চরিত্রেই দেখা যায়। হুসনাবানু এ কাব্যে মূলত নেপথ্যে থেকেই আপন ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি শুধু প্রশ্ন করেই আপন কর্তব্য শেষ করেছেন। অবশ্য কাব্যের প্রথমে কবি জীবনের তিক্তবঞ্চনায় ক্ষুব্ধ হুসনাবানুর মানসিক দ্বন্দ্বের কিছুটা আভাস দিয়েছেন। মুনীর শামীর প্রতি ভালোবাসার অপর পৃষ্ঠেই জীবনের সে বঞ্চনার স্মৃতি তাঁকে সংশয়িত করে তুলেছিল। প্রশ্নের শিখায় তিনি জীবনের নতুন পাঠ নিতে চেষ্টা করেছেন। হাতেম তাঁর অন্তরের সংশয়কে দূর করে দিয়েছেন সওয়ালের সুষ্ঠু জবাব এনে দিয়ে। হাতেমের অনুরোধে মুনীর শামীরকে তিনি শেষপর্যন্ত স্বামীরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার ভালোবাসার মূল্যও দিয়েছেন। তাই কবির কণ্ঠে শুনি :

> যাবে ওরা এক সাথে যুক্ত প্রাণ খরজমের পথে
> পরিপূর্ণ নীড়ের সন্ধানে (দুই স্রোত এক হয়ে
> যেমন জীবন্ত নদী যায় পূর্ণ প্রাণের সায়রে,
> দুই শিখা এক হয়ে রওশন যেমন শামাদানে
> বিলায় উজ্জ্বল আলো; —পেল ওরা পূর্ণতা তেমনি
> সাত সওয়ালের শেষে প্রতীক্ষার তীরে)।[৬২]

কিন্তু হুসনাবানুর মনে মুনীর শামীর প্রতি ভালোবাসাজনিত কোন ব্যাকুলতারই প্রকাশ আমরা কাব্যে দেখি না। হুসনাবানু ধাত্রীপ্রদত্ত প্রশ্নমালার দুর্ভেদ্য রক্ষা কবচের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে জীবনের

---

[৫৯] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ৪১২।

[৬০] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, "ফররুখের হাতেমতা'য়ী", *ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি*, পৃ. ২৭৫।

[৬১] তদেব।

[৬২] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ৪৬৫।

সম্ভাব্য বঞ্চনা এড়াতে চেয়েছেন। প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর যতটা না ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল প্রেমপ্রার্থীদের সুকঠিন প্রশ্নবানে জর্জরিত করে বিদায় দিতে পারার একটি স্বস্তিবোধ। সবার কাছেই তিনি প্রাণহীনভাবে প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করে গিয়েছেন মাত্র। যথার্থ উত্তর পাওয়ার সম্ভাব্যতার কথাও তাঁর মনে বড় একটা জাগেনি। হাতেমের কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছেন বটে, কিন্তু কোথাও তা নিয়ে কূট প্রশ্ন তোলেননি। কেবল দেখতে পাই, ষষ্ঠ সওয়ালের সূচনায় পঞ্চম সওয়ালের সফর কাহিনী সম্পর্কে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছেন। মুনীরের জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। কাব্যের শেষে হাতেম তাঁকে আশিক মুনীরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন; তাই বুঝি বা তাকে করুণা পরবশ হয়ে গ্রহণ করেছেন। তবু হুসনাবানুর চরিত্রে কিছুটা সজীবতার আভাস পাওয়া যায়।

'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের আর একটি চরিত্র মুনীর শামীর। হতাশ প্রেমিক মুনীর শামীর চরিত্রটি নানা কারণে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। মুনীর শামী সৌন্দর্যপ্রিয় এবং প্রেমব্যাকুল মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্যে যে সাধনার প্রয়োজন তাতে তিনি বিমুখ। শুধু দেওয়ানার হালে ঘুরে বেড়িয়েছেন বনে-বনে। যে হুসনাবানুকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাঁকে পেতে হলে, তাঁকে চলতে হবে প্রশ্নের ভয়ংকর জটিল পথে, যেখানে 'পায়ে পায়ে হতাশার দেখা; মৃত্যুর স্বাক্ষর'।[৬৩] অথচ সে পথে চলতে তাঁর আদৌ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়না। নিজের অক্ষমতা তাঁকে লজ্জিত করেনি, তাই প্রেমের পথে হাতেমের সাহায্য নিয়ে নিজের পৌরুষকে উপহাস্যস্পদ করতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করেন নি। হাতেম যখন তাঁকে ভরসা দেন, তখনও তিনি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহকার্যে সার্থকতা অর্জন সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। বড় ভীরু, দুর্বলপ্রাণী মুনীর শামীর; অথচ হুসনাবানুর প্রেমে তিনি যথার্থই পাগল। বস্তুত এ চরিত্রের মেরুদণ্ড নিয়ে নানারকম সন্দেহ ও সংশয় জাগে। হাতেমের অনুগ্রহে তিনি শেষপর্যন্ত হুসনাবানুকে পেয়ে ধন্য হয়েছেন ঠিক, কিন্তু তাঁর চরিত্রের কোনো মহিমাই শেষপর্যন্ত প্রকটিত হয়নি।

'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে হাতেমতা'য়ী, মুনীর শামীর ও হুসনাবানু ছাড়াও আরো অসংখ্য খণ্ড-ক্ষুদ্র চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ খণ্ড-ক্ষুদ্র চরিত্রগুলোর ভূমিকায় মানবজীবেরই আধিপত্য লক্ষ করি। সাপ, জিন, দেও, পরী ও নানা বন্যপশু এ সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রায়শই শুভ বা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সব চরিত্র প্রায়ই একমাত্রিক। এরই মধ্যে কোনো-কোনো চরিত্র মানবিক ভাবানুভূতির স্পর্শে কিছুটা সজীবতা লাভ করেছে। প্রসঙ্গত হাতেমের প্রণয়াসক্ত হাসনাপরীর কথাই মনে করা যেতে পারে। হাসনাপরী মানব-মানবীর প্রেমের যে নিগূঢ়সত্য বা হৃদয়ের নৈবেদ্যতায় ভালবাসার অপরিসীম বাসনাকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে এবং তা দৃঢ়তর শক্তিতে রূপান্তরিত করে হাতেমতা'য়ীকে বিচিত্র আঙ্গিকে সত্যের শিখায় চিনেছিল এবং জেনেছিল। এ মর্মে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে প্রকাশ :

> 'প্রেমের পন্থা মানে নি তো বাধা জগদ্দলে,
> মাশুকের পথ চেয়েছে জাহানে আশিক যদি
> পারেনি কখনো বাধা দিতে তারে পাহাড়, নদী;
> পারেনি কখনো থামাতে সে গতি গিরি ও দরি।'
> হাতেম তা'য়ীকে চিনেছিল শুধু হাস্‌না পরী।[৬৪]

তথাপি এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে হাতেম চরিত্র ব্যতীত কোন একটি চরিত্রও আপন

---

[৬৩] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯।

[৬৪] ফররুখ আহমদ, 'হাতেমতা'য়ী', *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), পৃ. ২৯৮।

সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। হাতেম চরিত্রে যদিওবা সমগ্রতার আভাস আছে, আদর্শবাদের মাত্রাতিরিক্ত অনুরঞ্জনে তাও অতি মানবিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মোটকথা 'হাতেমতায়ী' কাব্যে হাতেমের একক ভূমিকাই প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রেখেছে। মুনীর শামীর ও হুসনাবানুর বিড়ম্বিত প্রেমকে সাত সওয়ালের দুরধিগম্য পথ বেয়ে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিয়ে হাতেম যে অসাধ্য সাধন করেছেন তারই বিস্তৃত কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'হাতেমতা'য়ী'তে। মুনীর শামীর ও হুসনাবানুর প্রেম এখানে উপলক্ষমাত্র।

নয়. উপসংহার

বাংলা কাব্য সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখ্য ও স্মরণীয়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে সব কবিরা কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) অন্যতম। 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যের আদর্শিক ডানায় ভর করে এবং প্রায় একই মানসভাবনায় যে সব উদার মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নে ঐকান্তিক কবির মধ্যে আহসান হাবীব, সিকানদার আবু জাফর, আবুল হোসেন, এবং সৈয়দ আলী আহসান অন্যতম। প্রথমোক্ত তিনজন কবি সমাজ ও জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণির সংকট, অবক্ষয়ের স্বরূপ অনুধাবনে সমর্থ হন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সমাজজীবনের অনুভব সিকানদার আবু জাফরকে যতটা সোচ্চার করেছে, অন্যদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়না। পক্ষান্তরে, আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) তাঁর 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭) কাব্যের সমাজ ও স্বকালনিষ্ঠাকে বিভাগপরবর্তী পর্যায়ে নতুন কাব্যভাবনায় রূপান্তর করতে সচেষ্ট হলেন। 'নববসন্ত'-এর (১৯৪০) প্রগতিপন্থা আবুল হোসেনের কাব্যে অন্যতর অভিব্যক্তি লাভ করল। সমাজ-অন্তর্গত অসঙ্গতি, মধ্যবিত্তের সঙ্কট ও অবক্ষয় নতুন সমাজ-কাঠামোর অন্তবর্তী বিন্যাসে বাঙ্ময় হয়ে উঠল তাঁর কবিতায়। সৈয়দ আলী আহসান 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫) কাব্যে দোভাষী পুঁথির আদলে বক্তব্য ও প্রকরণ নিরীক্ষার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ পর্যায়ে তিনি একটা অভিজাত মননশীলতায় তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্যে অতিক্রম করে গেলেন। সমকালীন কাব্যিক চেতনার আঁধারে আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, সিকানদার আবু জাফর এঁরা সবাই মা, মাটি, প্রকৃতি, জীবন ও শিল্পের ক্ষেত্রে অভিজাত ও মননসমৃদ্ধ কবিচেতনা ও হৃদয়াবেগ সেই সাথে মেধা ও মননকে অধিকতর আকর্ষণ করে। আর কবি ফররুখ আহমদ এদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে ইসলামের জয়গানে মুখরিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবন ও রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয় নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাব্যিক জগতে পদার্পণ করেছিলেন। যার জন্য বাংলা সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদ বরাবরই মৌলিক ও একক বিশেষত্বের কবি হিসেবে সুপরিচিত। দর্শনের আভিজাত্য নয়, শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য নয়, চেতনার অহমিকা নয়, জীবন ও জগতের মধ্যে সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন ইসলামি রীতি-নীতি ও ঐশ্বর্যের ধারাবাহিকতায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় চল্লিশের দশকের এক মর্মস্পর্শী ও সাত্ত্বিক প্রেরণার অভিযাত্রিক কবি ফররুখ আহমদ এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা চলে। আর এই অভিযাত্রিক, রোমান্টিক ও সত্যের অগ্নিশিখায় বার বার ফররুখ নিজেকে 'হাতেমতা'য়ী' কাব্যে বিচিত্ররূপে মানুষ ও মানবতাবদীর জয়গানে বরাবরই মুখরিত।

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ মোরশেদুল আলম*

Abstract: Liberation war is a memorable phenomenon in the history of Bangladesh. Many novelists have written novels about the liberation war of Bangladesh. Syed Shamsul Haq is one of them. He wrote novels, plays, essays, poems, stories, memories etc. with the theme of liberation war. His novels *Nil Dangshan* (1981), *Nishiddha Loban* (1981), *Mrigayay Kalakshep* (1986), and *Antargata* (1984) are examples of the novels which directly deal with liberation war as their subject matter. In this article the author examines how the liberation war of Bangladesh is reflected in these novels of Syed Shamsul Haq.

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), দেশ বিভাগ (১৯৪৭), ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), শিক্ষা আন্দোলন (১৯৬২), ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯), নির্বাচন (১৯৭০) প্রভৃতি এ যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। ঢাকা সেনানিবাসে তৈরি করা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নীল নকশা অনুযায়ী পাক হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক অভিযান শুরু করে। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্বকে চিরতরে মুছে ফেলার নীল নকশা নিয়েই তারা এ নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ এই বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করতে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে।[১] দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বদৌলতে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এটি নিঃসন্দেহে বাঙালির এক মহত্তম প্রাপ্তি। মুক্তিযুদ্ধের এ গৌরবদীপ্ত চেতনা ঔপন্যাসিকের সৃজন প্রেরণা, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের দিগন্ত সুবিস্তৃত হয়।[২] তাঁরা যুদ্ধকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাস রচনা করেছেন। সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম: ১৯৩৫) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান বলেন, "মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি সৈয়দ শামসুল হক। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে রূপায়িত করেছেন। শিল্পস্বভাবে অন্তর্মুখী ও মনোবিশ্লেষণপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র অবয়বে মুক্তিযুদ্ধকে রূপদানের ঐকান্তিকতায় তিনি অনন্য।"[৩]

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), পৃ. ৪১৯।

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৪৫।

[৩] রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ৯৫।

সৈয়দ শামসুল হকের পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতি রচনায় তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ডাঃ সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন এবং মাতার নাম সৈয়দা হালিমা খাতুন। সৈয়দ শামসুল হকের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে নিজ বাড়িতেই। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৫০ সালে মাধ্যমিক এবং ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়ন করেন।[৪] তবে পাঠ্য বইয়ের তুলনায় পাঠ্য বহির্ভূত বইই তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করে তোলে। তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয় স্কুল জীবন থেকেই। ১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী আনোয়ারাকে বিবাহ করেন। সৈয়দ শামসুল হক কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তবে ১৯৫৩-'৫৫ সালের মধ্যে বামপন্থি রাজনীতির সাথে তাঁর পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি ছয় মাস ঢাকায় থেকে সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে যান। সেখানে ১৯৭২ সালে বিবিসি-তে চাকরি নেন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হচ্ছে: *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *দেয়ালের দেশ* (১৯৫৯), *অনুপম দিন* (১৯৬২), *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪), *খেলারাম খেলে যা* (১৯৭৩), *নীল দংশন* (১৯৮১), *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *ত্রাহি* (১৯৮২), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪), *অন্তর্গত* (১৯৮৪), *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* (১৯৮৬), *এক যুবকের ছায়াপথ* (১৯৮৭), *বালিকার চন্দ্রযান* (১৯৯০) ইত্যাদি।[৫] তবে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে *নীল দংশন*, *নিষিদ্ধ লোবান*, *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* ও *অন্তর্গত* অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনের প্রধান ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা আমার শুধু সাহিত্যিক কর্তব্যই নয়, সামাজিক কর্তব্য।''[৬] তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), অলক্ত স্বর্ণপদক (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৮৩), লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪), জেবুন্নেসা-মাহবুবউল্লাহ স্বর্ণপদক (১৯৮৫), পদাবলী কবিতা পুরস্কার (১৯৮৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০), টেনাশিনাস পদক (১৯৯০) ইত্যাদিতে ভূষিত হন।[৭]

_নীল দংশন_ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর *নীল দংশন* উপন্যাসটি ১৯৭৬ সালে ঈদ সংখ্যা *বিচিত্রায়* প্রথম প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এটি তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কাজী নজরুল ইসলাম। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দী কাজী নজরুল ইসলাম নামক একজন বাঙালির বন্দী জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ''সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' নতুন প্রকাশভঙ্গি নিয়ে ১৯৭১ সালের

---

[৪] *বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ২১৬।

[৫] শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ৫৫৫-৫৫৬।

[৬] সাযযাদ কাদির, ''সৈয়দ শামসুল হক উৎসের সন্ধান'', *বিচিত্রা*, ৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.৩২।

[৭] *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ২০০।

পটভূমি আশ্রিত একটি উপন্যাস। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক এ ভূখণ্ডের জনগণের লাঞ্ছনার একটি দলিল।"[৮] ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গুলি চালায়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেন, ''নিজের জামাকাপড়ে হঠাৎ নতুন একটা ঘ্রাণ সে পায়। বারুদের ঘ্রাণ। গত দু'দিনে সমস্ত নগরী জুড়ে একতরফা একটা যুদ্ধ হয়ে যায়। গোলা ফাটে। গুলি চলে। বাতাস ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। জামা-কাপড়ে সে ঘ্রাণ এখনও তার শরীরে বিবমিষার উদ্রেক করে।"[৯] ফলে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ঢাকা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাদেরই একজন। সে ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারের এক নম্বর গোবিন্দ দত্ত লেনের বাসিন্দা। সওদাগরি অফিসের সে একজন সামান্য কেরানি। স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে দেখা করার জন্য ২৭শে মার্চ ঢাকা ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি জাফরগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

কিন্তু পথিমধ্যে মিরপুর ব্রিজে টহলরত পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে সে ধরা পড়ে। জামার পকেটে থাকা খবরের কাগজের একটি টুকরা পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে করে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, ''খবরের কাগজের কাটা অংশটুকুতে বাংলাদেশের পতাকা – ওপরে লেখা জয় বাংলা, নীচে ইংরেজি অনুবাদ লেখা, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড় – আরো কতগুলো লাইনের পড়ে, বড় হাতের হরফে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম।"[১০] জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যরা জানতে পারে তার আদি নিবাস ভারতের বর্ধমান জেলায়। ১৯৪৮ সালের দেশ বিভাগের পর তারা ঢাকায় চলে আসে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে নাম ও জন্মস্থানের মিল থাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। ''মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে যায় নজরুলের কাছে। এরা তাকে সেই বিখ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম ঠাউরেছে। বর্ধমানের সেই বিখ্যাত সন্তানের নামে বাবা তার নাম রেখেছিলেন। গোলমালের শুরু সেখান থেকেই। কিন্তু সে তো কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তার সঙ্গে ঐ বিদ্রোহী কবিকে কেউ গুলিয়ে ফেলতে পারে।"[১১] এরপর তার উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। চড়, কিল, ঘুষি, লাথি ছাড়াও জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে হাতের চামড়া পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের চিত্র ঔপন্যাসিককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ''নইলে কী করে মিলাবে সে পঁচিশ তারিখ রাত থেকে শুরু এই ঘটনাগুলো? কী করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত, সংগঠিত এক সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ঘুমন্ত নাগরিকদের ওপর? কী করে তারা জ্বালিয়ে দিতে পারে নগরীর সমস্ত বাজার? কামান দেগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে বসতি?"(পৃ. ১১১)

নির্যাতনের এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে একটি বিবৃতিতে দস্তখত করতে বলে। দস্তখত করলেই তাকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। ঐ বিবৃতিতে লেখা ছিল, ''আমি, কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে বাঙালির দেশদ্রোহিতায় আমি ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত। বাঙালি অস্ত্র সংবরণ করো। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করো সর্বশক্তি দিয়ে। চাঁদ-তারা খচিত

---

[৮] ফরিদা সুলতানা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা (১৯৪৭-১৯৮৭)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৮।

[৯] সৈয়দ শামসুল হক, *উপন্যাস সমগ্র* ৩ (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৯২।

[১০] তদেব, পৃ. ১১০।

[১১] তদেব।

পতাকা তুলে ধরো এবং বুক দিয়ে তা রক্ষা করো।"[১২] নজরুল ইসলাম এ বিবৃতিতে দস্তখত করে সহজেই মুক্তি পেতে পারত। কিন্তু সে দস্তখত দিয়ে মুক্তি পেতে চাইনি। কারণ এখন সে আর সওদাগরি অফিসের সাধারণ কেরানি নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিনিধি, জাতীয়তাবাদের উজ্জীবক, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার উৎস বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলামে সে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও তার জন্ম বর্ধমানে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের প্রতি তার মমত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রী কুমকুম আর সন্তানের মুখচ্ছবি দেখার অপরিমেয় আগ্রহ নিপতিত হয় অন্তরের প্রজ্বলিত বিদ্রোহে।

লেখকের বর্ণনায়, ''সমস্ত শহরের ওপর দিয়ে গুলির ঝড় বয়ে গেল, ট্যাংক গড়িয়ে গেল, বাড়ি ধসে পড়ল, লাশের পাহাড় জমে উঠল রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তারপর দেখলাম বড় বড় সব দালানের মাথায় ওরা ওঠাচ্ছে ওদের পতাকা। ছিঁড়ে ফেলছে আমাদের পতাকা। তখন হঠাৎ বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল।"[১৩] পাকিস্তানি সৈন্যরা দস্তখত আদায় করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করে। তারা নজরুলের উপর অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা তার কাছ থেকে দস্তখত আদায় করতে পারেনি। নজরুলের উপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন,

> তার ডানহাতের জোড়টিও ভেঙে দেওয়া হয় তখন। ওদের পায়ের চাপে মুখ দিয়ে কয়েক ঝলক রক্তবেরিয়ে আসে তার। দারুণ তৃষ্ণায় নিজের রক্ত সে জিহ্বা দিয়ে চুকচুক করে টেনেনেবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিহ্বা সাড়াদেয় না। মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ ফলের মতো জিহ্বাটা গহ্বর পূর্ণ করে রাখে। লোকগুলোর মুঠোয় মুঠোয় উঠে আসে তার দীর্ঘ চুলের গুচ্ছগুলো।[১৪]

এভাবে তাকে হত্যা করে একটা গর্তে ফেলে দেয়া হয়। লেখকের ভাষায়, ''কখনোই কোনো কবিতা না লিখে কবি, কাজী নজরুল ইসলামকে আরো একটি কবিতা না লেখার জন্যে ঠেলে ফেলে দেয়া হয় সেই গর্তে।"(পৃ. ১৪১)

এ উপন্যাসের নজরুল চরিত্র সম্পর্কে আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ''সৈয়দ হকের 'নীল দংশন' উপন্যাসের কাজী নজরুল ইসলাম এক অসাধারণ চরিত্র। অভাবিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন নজরুল ইসলামের ব্যক্তিসত্তা এমন এক নতুন আয়তনে বিস্তৃতি পায় যা বস্তুত তাঁর নিজের কাছেও ছিল অপরিচিত।"[১৫] পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের বাস্তব চিত্র প্রতীকীরূপে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

> নজরুল চরিত্রের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক চৈতন্যের নির্মাণ এই উপন্যাসের মূল বিষয় হলেও, উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের শুরু, বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও আন্দোলন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র প্রভৃতি বিষয়গুলোও উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে স্থান পেয়েছে নজরুল ও পাকিস্তানি সৈন্যদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে।[১৬]

এ উপন্যাসের সমালোচনায় কেউ কেউ বলেছেন, "তাঁর উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্রের উপস্থাপনা এবং নিরীক্ষা কখনও কখনও কারও কারও কাছে আপাতদৃষ্টিতে অতিমাত্রিক ও আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনে

---

[১২] তদেব, পৃ. ১১৬।

[১৩] তদেব, পৃ. ১৩৪।

[১৪] তদেব, পৃ. ১৪০-১৪১।

[১৫] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ১০৯।

[১৬] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৯০।

হয়।"[১৭] কিন্তু তবুও এ উপন্যাসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ''*নীল দংশন* উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিসত্তার দর্পণে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।"[১৮] এ উপন্যাসের প্রশংসায় শহীদ ইকবাল বলেন, ''ছোট্ট পরিসরে, ছোট একটি বিষয়কে সৈয়দ শামসুল হক খুব শক্তিশালী শৈলীতে বাধেন। ফলে তা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যময় তত্ত্ব।"[১৯]

নিষিদ্ধ লোবান উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

নিষিদ্ধ লোবান সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়। এটি ১৯৮১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সে ঢাকা থেকে জলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জলেশ্বরীতে তার মা, ভাই, বিধবা বোন আর তার সন্তানরা থাকত। কিন্তু ট্রেন জলেশ্বরী পর্যন্ত না গিয়ে নবগ্রাম গিয়ে থেমে যায়। কারণ জলেশ্বরীর পথে ব্রিজটি ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন,

> চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। বিলকিস দেখতে পায় জলেশ্বরী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখতে পায় সে আগুন নিভে গেছে। জলেশ্বরীর বাড়িগুলো বীভৎস ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা শহরে একটিও প্রাণী নেই। বিকট জন্তুর মতো স্তব্ধতা হামা দিয়ে শহরটিকে খাবলে খাবলে খেয়ে চলেছে।[২০]

বিলকিসের স্বামী আলতাফ পত্রিকা অফিসে কাজ করত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সে নিখোঁজ হয়। ''আলতাফ কি বেঁচে আছে? যে খবরের কাগজে আলতাফ কাজ করত, পঁচিশে মার্চ রাতে মিলিটারি সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতের শিফটে ছিল আলতাফ। সে আর ফেরেনি। যে দুটি লাশ পাওয়া গেছে, আলতাফের বলে সনাক্ত করা যায় নি।"[২১] বাঙালিরাও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। বিলকিসের মনে হয় তার স্বামীও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। "যদি এমন হয়, যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সে? এই যে শোনা যায়, ছেলেরা এখানে পুল উড়িয়ে দিয়েছে, ওখানে গ্রেনেড ছুঁড়েছে, এক গাড়ি সৈন্য খতম করেছে – যদি তার কোনো একটি আলতাফের কাজ হয়? ঢাকায় রাতে যে প্রায়ই গুলির শব্দ শোনা যায়, তার সবই কি মিলিটারির? কোনো একটি কি আলতাফের নয়?"

মুক্তিযোদ্ধা মনসুরের নির্দেশে সিরাজ নামের এক ব্যক্তি বিলকিসকে জলেশ্বরী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। সিরাজের প্রকৃত নাম প্রদীপ। সিরাজ তার ছদ্মনাম। জলেশ্বরী পৌঁছে বিলকিস আলেফ মোক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তিনি বিলকিসকে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের কাহিনি বর্ণনা করেন।

> মিলিটারি আসবার পর বিহারীরা দলেবলে বেরোয়, প্রতিটা বাড়ি ঢুকে তছনছ করে, লুট করে। একদল এসে দেখা পায় মোক্তার সাহেবের। তারপর অন্ধ দেখে বদমাশগুলোর ফুর্তি হয়। আলেফ মোক্তারের গলায় জুতোর মালা দিয়ে, বুকের ওপর জয় বাংলার নিশান লাগিয়ে কোমরে গরু বাঁধার দড়ি বেঁধে সারা শহর তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অন্ধ মানুষ, হাঁটতে পারে না,

---

[১৭] আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১২৬।

[১৮] রফিকউল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৩।

[১৯] শহীদ ইকবাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬।

[২০] সৈয়দ শামসুল হক, *উপন্যাস সমগ্র ৪* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১৮৫।

[২১] তদেব, পৃ. ১৯০।

বার বার পড়ে যায়, বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে খাড়া করে, লাথি মারে, টেনে নিয়েবেড়ায়।[২২]

পাকিস্তানি সৈন্যরা বিলকিসের ভাই খোকাকেও হত্যা করে। তারা আলেফ মোক্তারকে খোকার লাশের উপর প্রস্রাব করতে নির্দেশ দেয়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন, ''বোধহয়, গান গাইত, খোকা ভাই এখানে সবাইকে 'আমার সোনার বাংলা' শিখিয়েছিল। মার্চ মাসের মিছিলগুলোতে খোকা ভাই সবার আগে থাকত, একেকটা মোড়ে দাঁড়িয়ে সকলে 'আমার সোনার বাংলা' গাইত। সবার চোখে পড়ে গিয়েছিল খোকা ভাই।" কেউ এ লাশ নিয়ে যেতে পারবে না, এমনকি দাফন পর্যন্ত করতে পারবে না বলে মিলিটারিরা নির্দেশ দেয়। আলেফ মোক্তারের বর্ণনায়, ''এত বড় পাষাণ, মানুষের অন্তঃকরণ নেই, হুকুম দিয়েছে, লাশ যেখানে আছে সেখানে থাকবে। কেউ হাত দিতে পারবে না। কচি ছেলেগুলোকে কাক শকুনে ছিঁড়ে খাবে, দাফন হবে না।"

বাজারের খোলা ময়দানে খোকার লাশ পড়ে আছে এবং তা দাফন করতে পারবে না – এ বিষয়টি বিলকিসের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন সে সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক তার ভাইয়ের লাশ দাফন করতে হবে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, "বাজারের খোলা চত্বরময় ছড়িয়ে আছে লাশ! বেড়াহীন উলঙ্গ দোকানের খুটি আঁকড়ে পড়ে আছে লাশ। আলোর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে গলিটা, তার ওপরে উপুড় হয়ে আছে লাশ। লাশের পর লাশ।"[২৩] খোকার মুখে প্রস্রাব করে দেওয়ার কথা শোনার মুহূর্ত থেকে যে ক্রোধ তার ভিতরে তলোয়ারের মতো খাড়া হয়েছিল, এখন তা ঝলসে উঠে। খোকার লাশ দাফন করার জন্য বিলকিস এবং সিরাজ পাকিস্তানি সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মধ্যরাতে বাজারে যায়। খোকার লাশ না পেয়ে তারা সবগুলো লাশ দাফনের সিদ্ধান্ত নেয়। নদীর তীরে টিনের টুকরা দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে কয়েকটি লাশ মাটি চাপা দেয়। ভোর হয়ে আসলে তারা পাটগুদামে আশ্রয় নেয়। মাটিতে পড়ে থাকা লাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন, ''গলিটা চত্বরে গিয়ে পড়বার মুখেই একটা লাশ কাৎ হয়ে পড়েছিল। মধ্যবয়সী গরীব কোনো রমণী। খাটো শাড়ি হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। বুকখোলা। নিচের চোয়াল বিকৃত হয়ে এক পাশে ঠেলে সরে গেছে। রুক্ষ চুলে আধখানা ঢেকে আছে তার মুখ।"এভাবে রাতে বের হয়ে তারা মাটিতে পড়ে থাকা লাশ জড়ো করে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কিন্তু একদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর চারজন বিহারী সৈন্যের হাতে তারা ধরা পড়ে। তাদেরকে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তারা জানতে পারে সিরাজ অমুসলিম। তার আসল নাম প্রদীপ। তারা প্রদীপ ও বিলকিসকে ভাইবোন বলে মনে করে। এক পর্যায়ে সিরাজ নামধারী প্রদীপকে তারা গুলি করে হত্যা করে।

পাকিস্তানি মেজর বিলকিসকে ভোগ করতে উদ্যত হয়। পাকিস্তানি মেজরের উক্তি,

> কেন করবে না ? আমার বীজ ভালো। আমার রক্ত শুদ্ধ। রমণী স্বয়ং উদ্যোগী হলে অবশ্যই আমাতে তৃপ্ত হতে পারবে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি ? আমি তোমায় সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানি হবে, চাও না সেই সন্তান? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, শ্লোগান দেয় না, কমিউনিস্ট হয় না। জাতির এই খেদমত

---

[২২] তদেব, পৃ. ২০১-২০২।

[২৩] তদেব, পৃ. ২১৩।

আমরা করতে এসেছি। তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানি রেখে যাব, ইসলামের নিশান উড়িয়ে যাব।[২৪]

বিলকিস প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়। তাকে ভোগ করার জন্য শর্ত হিসেবে প্রদীপের লাশ সৎকারের ব্যবস্থা করতে বলে। পাকিস্তানি সৈন্যরা সকল আয়োজন সম্পন্ন করে তাদেরকে নদীর তীরে নিয়ে যায়। লাশের মুখে অগ্নি সংযোগ করলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। বিলকিস হঠাৎ মেজরকে আলিঙ্গন করে জলন্ত চিতার আগুনে ঠেসে ধরে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

ঠিক তখন বিলকিস তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পর মুহূর্তেই বিস্ফারিত দুই চোখে সে আবিষ্কার করে, রমণী তাকে চিতার ওপর ঠেসে ধরেছে, রমণীর চুল ও পোশাকে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রমণীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু রমণীকে আগুন দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরণ হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি। জাতিস্মর আতঙ্কে সে শেষবারের মতো শিউরে ওঠে। মশালের মতো প্রজ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে রাখে বিলকিস।[২৫]

বিলকিসের আত্মোৎসর্গ ও মেজরকে পুড়িয়ে মারার মধ্য দিয়ে তার প্রতিশোধ স্পৃহা পূর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে সারোয়ার জাহান বলেন,

পাকিস্তানি সৈনিকেরা বাঙালিদের মৃতদেহ দাফন না করার ঘোষণা দিয়ে অজস্র মৃতদেহ শেয়াল কুকুরের জন্যে ফেলে রাখে, পশু আর বাঙালি জাতিকে এক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কেননা পশুদের দাফন হয় না। বিলকিস এই অপমানের প্রতিবাদ জানায় অসম্ভব এবং অভাবনীয় এক প্রতিক্রিয়ায়, প্রতিশোধ নেয় আরো অসম্ভব পদ্ধতিতে- 'মশালের মতো প্রজ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে'।[২৬]

সমগ্র দেশব্যাপী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র জলেশ্বরীর প্রতীকে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ''জলেশ্বরীর প্রতীকে সমগ্র বাংলাদেশকেই যেন এ-উপন্যাসে ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। পঁচিশে মার্চ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, ব্যক্তি ও সমষ্টির টেনশান, নিরস্তিত্বের যন্ত্রণা এবং অস্তিত্বময় জীবন-অভীপ্সা রতির তীব্রতাকে শেষ পর্যন্ত ম্লান করে দেয়। বিলকিস এবং আগুনের মধ্যে নির্দেশিত হয় গভীর প্রতীকী তাৎপর্য।"[২৭] এ উপন্যাসের সমালোচনায় বলা হয়েছে, ''নিষিদ্ধ লোবানে লেখক সংগ্রাম আর বিজয়ের চিত্র নয় বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের রিরংসাবৃত্তির উল্লাস অংকনেই অধিক উৎসাহী।"[২৮]

মৃগয়ায় কালক্ষেপ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

সৈয়দ শামসুল হকের *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* উপন্যাসটি ১৯৮০ সালে ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক *রোববারে* প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং এ নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে লেখক স্বয়ং ইংল্যান্ডে অবস্থান করার কারণে খুব কাছ থেকেই দেখেছেন প্রবাসে অবস্থানকারী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে

---

[২৪] তদেব, পৃ. ২৩৪।

[২৫] তদেব, পৃ. ২৪১।

[২৬] সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস: সেকাল-একাল* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯১), পৃ. ১৪৫।

[২৭] রফিকউল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৪।

[২৮] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ. ৩৭।

মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। এ উপন্যাসের কাহিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ ছিল যারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে দেশের বাইরে অবস্থান করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের তৎপরতা ও দেশভক্তির অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে শহীদ ইকবাল বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধ-বর্ণিত হয় তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* অর্থে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে বিলাসী জীবনে; বাংলাদেশের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে; ঝড় তুলেছে চায়ের কাপে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে লিখিত।"[২৯]

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আবদুল হাদী। ঢাকার একটি কলেজে সে বাংলার অধ্যাপক। পাবনার এক সাধারণ পরিবারে তার জন্ম। তার বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে বিলেতে গিয়ে খ্যাতিমান পুরুষ হয়ে দেশে ফিরে আসবে। দেশের লোকজন গলায় মালা দিয়ে তাকে সংবর্ধনা দিবে। বিলেতে সে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিদ্বান হওয়ার আশায় নয়। মুক্তিযুদ্ধের দুর্বিষহ পরিবেশ থেকে নিজেকে বাচাঁনোর জন্য। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

> কেউ যদি আবদুল হাদীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিগ্যেস করে, আপনি কি শত্রুকবলিত দেশ থেকে পালাবার অছিলায় পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত রঙিন জীবন উপভোগ করার জন্যেই লন্ডনে আসেন নি ? তাহলে কী উত্তর দেবে সে ? আবদুল হাদী জানে, এই জীবনের স্বাদ নেবার জন্যে তার যে সঙ্গতি, চিত্তের যে স্থিরতার দরকার- তা নেই, নির্মমভাবে নেই।[৩০]

দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও অস্ত্র হাতে নেওয়ার মতো সাহস তার নেই। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন, ''দেশের জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে কিছু করতে চায়, অবশ্যই চায়, কিন্তু সে জানে না কী সে করতে পারে। অস্ত্র হাতে নেবার মতো সাহস তার নেই, সে জানে; রক্ত দেখলে তার শরীর হিম হয়ে যায়।" ঢাকায় ফিরে যাওয়ার মত সাহসও তার নেই। কারণ সে ভীরু ও দুর্বল চিত্তের লোক। এজন্য সে শত্রুকবলিত দেশ ছেড়ে পালিয়ে লন্ডনে গিয়েছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, ''কোথায় ফিরে যাবে সে? ঢাকায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। স্বীকার করে তার সাহস নেই, সে কাপুরুষ, সৈন্য দেখলে তার ভয় করে।" ঢাকায় থাকা অবস্থায় মাঝে মধ্যে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে সে বলেছিল, ''দোহাই আপনাদের এসব বন্ধ করুন, আপনাদের জন্যে আমরা মারা যাব, আমাদের কাউকে ওরা বাঁচাবে না।"(পৃ. ২৫৩) অন্যান্য বাঙালির মতো সেও মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তির জন্য কষ্ট করতে সে ভয় পায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, ''অথচ আবদুল হাদী মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে, আদৌ তা নয়। সেও প্রতিটি বাঙালির মতো চায় মুক্তি, স্বাধীনতা; কিন্তু মুক্তির জন্যে কষ্ট করতে সে ভয় পায়, স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দেবার সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে পড়ে।"[৩১]

লন্ডনে এসে আবদুল হাদী তার দূর সম্পর্কের মামাত ভাই বাহাউদ্দিনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ঘরে ঢুকেই শেখ মুজিবের ছবি দেখে তার মনে হয়েছিল এখানে অন্তত স্বাধীনতা আছে।

> ঘরে ঢুকেই মনে হয়েছিল, এখানে বাতাস কী মুক্ত, বর্ণ কী উজ্জ্বল, এখানে স্বাধীনতা আছে, তাই শেখ মুজিবের ছবি আছে। ঢাকা থেকে এসেছে সে, যে ঢাকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেনাবাহিনী, যে ঢাকার দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে সমস্ত শ্লোগান আর প্রতীক, যে ঢাকায় বাঙালিরাই লুকিয়ে ফেলেছে শেখ মুজিবের ছবি, মাটিতে পুঁতে ফেলেছে বাংলাদেশের

---

[২৯] শহীদ ইকবাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬।

[৩০] সৈয়দ শামসুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০।

[৩১] তদেব, পৃ. ২৫৩।

নিশান।[৩২]

কিন্তু আবদুল হাদীর উপস্থিতি বাহাউদ্দিন ও তার স্ত্রীরোজি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। লন্ডনে এসে তার সাথে পরিচয় হয় ব্রিটিশ নাগরিক নিকোলা, লিসবেট, মরিন, মেরভীন, টিম, পল, বিবিসি'র বাংলা বিভাগের মাবুদ খান সহ বেশ কয়েকজনের সাথে। একসময় সে ব্রিটিশ তরুণী নিকোলার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

> নিকোলার হাতের ভেতরে হাত রেখে তার নিজেকে তখন সহসা জ্যোতির্ময় বলে বোধ হয়েছিল। তার ইচ্ছে হয়েছিল সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, কিন্তু কেবল নিকোলাকেই সে ফিসফিস করে বলতে পেরেছিল, তুমি দুঃখিত হইও না, নিকি। আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়াছি, আমি মৃত্যু দেখিয়াছি; কাহারো পরিহাস আমাকে কাবু করিতে পারিবে না। যে হাত তুমি স্পর্শ করিয়া আছ, আমি সেই হাতে বন্দুক ধরিয়াছি। দেয়ালে যে যোদ্ধার চিত্র রাখিয়াছ, সেই যোদ্ধা আমার ভাই।[৩৩]

সপ্তাহ খানেক থাকার পর আবদুল হাদী জানতে পারে বাহাউদ্দিনের পিতা পাকিস্তান সরকারের শিল্প সচিব সালাহউদ্দিন মুস্তাফা জিনিভা থেকে লন্ডনে আসছেন। তিনি বাহাউদ্দিনের বাসায় কিছুদিন অবস্থান করবেন। যে কারণে আবদুল হাদীকে বাসা ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হবে। বিষয়টি সে তার কলেজের সহপাঠী লন্ডনের বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির নেতা শরীফ আলীকে জানায়। লন্ডনে মি. মুস্তাফার উপস্থিতি বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির নেতারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেয়। তাকে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাতে পারলেই মুক্তিযোদ্ধারা উৎসাহিত হবে ভেবে আবদুল হাদীকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা ও নির্যাতন এবং বাঙালিদের দ্বারা প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলার বিবরণ পাওয়া যায় আবদুল হাদীর বর্ণনায়।

> সারাদেশ এখন থম থম করছে। মানুষ যে কী করে বেঁচে আছে, সে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি ধারণা করতে পারেন, যে বাঙালি বন্দুকের আওয়াজ শুনলে ভয়ে মরে যেত,সেই বাঙালি এখন কোথাও যদি বন্দুকের শব্দ শোনে, হাতবোমার আওয়াজ পায়, খুশি হয়ে ওঠে। মনে করে, এই বুঝি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পাকিস্তানিদের আক্রমণ করল! ঢাকার ফার্মগেটের মতো প্রকাশ্য মোড়ে, ইন্টারকন্টিনেন্টালের মতো হোটেলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অপারেশন করছে, আপনি জানেন? দেশের লোক এখন হাত তুলে দোয়া করছে, মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী করেছে পাকিস্তানিরা, হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে, মেয়েদের ধরে ধরে বেইজ্জত করেছে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।[৩৪]

কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শিল্প সচিব মি. মুস্তাফা আবদুল হাদীর বর্ণনাকে ভারতের অপপ্রচার বলে উল্লেখ করে।

> বল, তোমার পাড়ায় ক'জন মারা গেছে, ক'জন ধর্ষিত হয়েছে, ক'টা বাড়ি পুড়েছে? সব ইন্ডিয়ার প্রপাগান্ডা। ভারত হয় আমাদের শত্রু, ভারত এই গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত। ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ভারত জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে, এখনো করিতেছে। আমরা বাঙালিরা তাহাদের খপ্পরে পড়িয়াছি। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবে, আমাদিগকে হিন্দুর দাসত্ব করিতে

---

[৩২] তদেব, পৃ. ২৫৬।
[৩৩] তদেব, পৃ. ২৭২।
[৩৪] তদেব, পৃ. ২৭৯।

হইবে।[৩৫]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এই নির্যাতন বাঙালির প্রাপ্য ছিল বলেও তিনি মনে করেন।

> এই মার বাঙালির প্রাপ্য ছিল। এমন কীইবা মার দেওয়া হয়েছে? তোমরা ষড়যন্ত্র করবে, বিদ্রোহ করবে, আর্মিতে আনুগত্য ভাঙাইবার চেষ্টা লইবে, সরকার বসিয়া থাকিবে? বরং অপরাধের তুলনায় অনেকখানি কম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাণ লওয়া হইয়া থাকিলে ভারতীয় দালালগণেরই প্রাণ লওয়া হইয়াছে। কেহ বলিতে পারিবে না, বিনা দোষে শাস্তি পাইয়াছে। বাঙালি কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়াই নারী ধর্ষণ, লুটপাটের কথা ছড়াইতেছে। না, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি করে নাই। তাহারা আইন-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্যে, এবং বৈধ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তাহাই করিয়াছে।[৩৬]

বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির নেতা শরীফ আলী একদিন মি. মুস্তাফার সাথে দেখা করতে আসেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের প্রতি তার সহানুভূতির কথা জানান। বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন কি না এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি মিসেস মুস্তাফার সাথে আলাপ করে জানানোর কথা বলেন। মিসেস মুস্তাফা এ প্রসঙ্গে বলেন, ''তাঁর কতদিনের চাকরি জান ? কত টাকা পাবেন রিটায়ার করবার সময়, খোঁজ নিয়ে দেখেছ? এখন চলবেন কী করে কিছু বলেছ ? তারপর, বাংলাদেশের পক্ষে চলে এলেই তো হলো না। তোমরা তাকে কোথায় রাখবে, কীভাবে রাখবে, কিছুই বল নি। উনি আসবেন, তোমরা পাকা কিছু না বললে কী করে আসেন?" ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ অভিযানের কাছে পাক বাহিনীর পরাজিত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃটেনের সংবাদ মাধ্যমের তৎপরতার দিকটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

> বিবিসি অতিরিক্ত সংবাদ বুলেটিন প্রচার করতে শুরু করল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরপরই; স্থানীয় প্রবাসীদের জন্যে বাংলা আর হিন্দিতে রেডিও লন্ডন প্রতি সন্ধ্যায় সংবাদ প্রচার শুরু করল। হিন্দিওয়ালা-উর্দুওয়ালা-ইংরেজ-অবাঙালি যত সংবাদ পাঠক বিবিসি-র বাঙালি ধরে ধরে জিগ্যেস করতে লাগল, ভাই, জায়গাটার নাম চুয়াডাংগা, না কুয়াডাংগা? যশোর থেকে ঢাকার দূরত্ব তিনশ' তিপ্পান্ন মাইললেখা হয়েছে- এটা তো সম্ভব মনে হচ্ছে না, কী হবে বলুন তো? মুজিবুর রহমান না মুজিবউর রহমান? যোই বাংলা, না জয় বাংলা? বাঙালিদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল যেন চারদিকে। আবদুল হাদীর মনে হতে লাগল, যুদ্ধের ঢেউ এসেলেগেছে বিবিসি-র বুশ হাউসেও। সারা লন্ডনে এখানেই যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা রণাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে।[৩৭]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সংবাদটি বিবিসি থেকে প্রচারিত হলে প্রবাসী বাঙালিরা ক্যান্টিনে সমবেত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। সেখানে মি. মুস্তাফাকেও সবার সাথে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায়।

মি. মুস্তাফার চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ বলেছেন, ''মি. মুস্তাফার চরিত্র দ্বারা বাঙালি মধ্যবিত্তের একাংশের সুবিধাবাদী শ্রেণি চরিত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে, যারা সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান না করেও স্বাধীনতার পর দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"[৩৮] মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের যাপিত জীবন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা চেতনাকে

---

[৩৫] *তদেব*।

[৩৬] তদেব, পৃ. ২৮০।

[৩৭] তদেব, পৃ. ৩১৩।

[৩৮] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩০।

ঔপন্যাসিক প্রতীকীরূপে এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ''সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোর মধ্যে *'মৃগয়ায় কালক্ষেপ'* ভিন্ন স্বাদের নিরীক্ষাধর্মী বিশিষ্ট উপন্যাস। বিষয়-প্রেক্ষিত নিরূপণের পর্বেলেখক মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের যাপিত জীবন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাচেতনার স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।"[৩৯]

অন্তর্গত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

সৈয়দ শামসুল হকের *অন্তর্গত* উপন্যাসটি ১৯৮০ সালে ঈদ সংখ্যা *বিচিত্রায়* প্রথম প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। এটি রচিত হয়েছে কবিতার আকারে। এটি একটি কাব্যোপন্যাস। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক এর নাম দিয়েছেন 'কথাকাব্য'।[৪০] প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার পরিণতি, মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী দশ বছরের প্রতিক্রিয়া, যুদ্ধোত্তর মূল্যবোধের বিবর্তন, তরুণ সমাজের প্রবণতা প্রভৃতি এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আকবর হোসেন। সে মান্দারবাড়ির একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন,

> গুলি বেঁধা, বেয়োনেট-চেরা লাশের সেই সমাবেশ,
> হাত পা চোখ বাঁধা লাশের ভেসে যাওয়া,
> ভেসে যায় বাংলাদেশ,
> জীবিতের চেয়ে মৃতের সঙ্গে সাক্ষাতের অধিক সম্ভাবনায় ভরা
> সেই ন'টি মাস – [৪১]

আকবর হোসেনের অসাধারণ বীরত্বে মান্দারবাড়ি আট দিন আগে শত্রু মুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েকজন সাংবাদিক আকবর হোসেনের সাক্ষাৎকার ও মুক্তিযুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানার জন্য মান্দারবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। একজন তরুণ সাংবাদিকদের নিকট মুক্তিযুদ্ধে আকবর হোসেনের বীরত্বের ঘটনা বর্ণনা করে। আকবর ভাই এর মত বড় গেরিলা আর নেই বলেও সে উল্লেখ করে।

> শোনেন, শোনেন, আকবর ভাইয়ের মতো বড় গেরিলা
> আর নাই।
> কে পারে খালি হাতে পাঞ্জাবির গর্তে ঝাপেয়া পইড়তে?
> আকবর ভাই পারে।
> সে তা প্রমাণ কইরেছে।
> একবার দুইবার না, বহুবার।

মিলিটারির ভয়ে যখন সবাই মান্দারবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন আকবর হোসেন একা অশ্বত্থ গাছের আড়াল থেকে দু'জন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করেছিল।

> মিলিটারির ভয়ে মান্দারবাড়ি থেকে সবাই চলে যাবার পর
> যখন আর কেউ এ মুখো হতে সাহস পায় নি,
> তখন আকবর একা এক অমাবস্যা রাতে
> ক্ষেত মাঠ ভেঙে,

---

[৩৯] শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ১৫৭।

[৪০] আমিনুর রহমান সুলতান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭।

[৪১] সৈয়দ শামসুল হক, *উপন্যাস সমগ্র ৬* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১৭২।

গোক্ষুর সাপের পরোয়া না করে-
জানেন তো, এখানে গোক্ষুর সাপের রাজধানী?-
চলে আসে;
মান্দারবাড়ি ঢুকতেই দেখবেন এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ,
সেই গাছের ওপর উঠে
ডালপালার ভেতর লুকিয়ে থাকে সে, তিন দিন তিন রাত,
দেখা যায় অশ্বত্থের নিচে দু'জন হানাদার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে,
প্রবল দুপুরের রৌদ্র প্রবাহের ভেতরে মানুষের ,
যারা জীবিত,
যারা মৃত,
সমস্ত মানুষের ঘৃণা একটি বিপুল ধস হয়ে নিঃশব্দে খসে পড়ে,
অশ্বত্থ গাছের পাতা থেকে বিশাল এক বাদুরে রূপান্তরিত হয়ে
আকবর
তার তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে শত্রুর দু'টি দেহ;
তার হাতের চাপে মোমের মতো বেঁকে যায় বন্দুকের নল,
পায়ের চাপে মাটির ভেতর পুঁতে যায় তাদের মাথা।[৪২]

জলেশ্বরীর স্কুল ঘরে মিলিটারির আস্তানায় আকবর হোসেন সাতটি সাপ ছেড়েছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

জলেশ্বরীর ইশকুল ঘরে মিলিটারির আস্তানায়
সাত সাতটা গোক্ষুর সাপ ছেড়েছিল কে?
জনতা একসঙ্গে উত্তর দিয়ে ওঠে- আকবর ভাই, আকবর ভাই। (পৃ. ১৮১)

নদীর পাড়ে খান সেনাদের কামান পাতা ছিল। কেউ ভয়ে সেই পথ দিয়ে হাঁটত না। কিন্তু আকবর হোসেন একা হেঁটে যেত।

ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

নদীর পাড়ে খানসেনাদেরট্রেঞ্চ খোঁড়া ছিল,
সেখানে কামান পাতা ছিল,
ভয়ে কেউ সে-পথ মাড়াত না।
সেদিন খেয়াঘাটের যাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে যায়,
তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়,
তারা দেখতে পায়
ট্রেঞ্চের দিকে একা আকবর হোসেন হেঁটে যাচ্ছে।[৪৩]

সাংবাদিকরা আকবর হোসেনের বাড়িতে পৌঁছে বুঝতে পারে সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে না। তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। কারণ মান্দারবাড়ি মুক্ত হওয়ার দিনে আকবর হোসেন দু'জন পাকিস্তানি সৈন্যকে বন্দী করে সহযোদ্ধা বাবুলের কাছে রেখে যায়। কিন্তু বাবুলের অক্ষমতায় তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরদিন মান্দারবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তারা খান সেনাদের সহায়তায় পাড়ার চব্বিশ জনলোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। আকবর হোসেনকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে এ অপপ্রচার ছড়িয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জুট মার্চেন্ট আবদুর

[৪২] তদেব, পৃ. ১৭৮-১৭৯।
[৪৩] তদেব, পৃ. ১৮৯-১৯০।

রহমান এবং তার বান্ধবী সেফালী। গ্রামবাসীর এ ভুল বাবুল ভেঙ্গে দিতে পারত, কিন্তু তা না করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সে সুযোগটা গ্রহণ করে। বাবুলের বর্ণনায়,

আপনারা দূর থেকে অনেক কিছুই শোনেন।
দূর থেকে অমন অনেক কিছুই মনে হয়।
ঘটনার জায়গায় আমরা ছিলাম, আপনারা নয়।
আর কে না জানে, গ্রামের লোক কথা বেশি কয়?[৪৪]

স্বাধীনতাবিরোধী এ সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আকবর বাবুলকে আহ্বান করে। কিন্তু বাবুল তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ বাবুল তখন স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়,

''মান্দারবাড়ির শ্মশানের পথে দাঁড়িয়ে আকবর বাবুলকে বলবে,
'আয়, আবার আমরা বন্দুক হাতে নিই তবে।'
'বন্দুক?' বাবুল পিছোবে।"(পৃ. ২১২)

আকবর তখন আফসোস করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল,

নয় বছরের যুদ্ধ
আমরা নয় মাসে শেষ করেছিলাম বলেই
বড় সুলভ হয়ে গিয়েছিল সব।
করতাম ন'টি বৎসর ধরে যুদ্ধ,
ঘুরে বেড়াতাম ন'টি বৎসর ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে,
হত্যা করতে পারতাম একটি একটি করে সব শত্রু,
দখল করতে পারতাম ইঞ্চি ইঞ্চি করে সম্পূর্ণ মাটি,
তাহলে
সেই ঘাম, সেই রক্ত, সেই আগুন থেকে
আমরা নতুন হয়েবেরুতে পারতাম।[৪৫]

আকবর হোসেনের পরিবারে ছিল তার মা আর ছোটবোন টুনটুনি। গ্রামের এক উঠতি তরুণ তার বোন টুনিকে ধর্ষণের পর হত্যা করে। তার লাশ মান্দারবাড়ির এক ডোবায় ভাসতে দেখা যায়। আকবর হোসেনও সেই তরুণকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। এ হত্যার দায়ে আকবর হোসেনের ফাঁসি হয়। এভাবে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মান্দারবাড়ির জনগণ মুক্তিযুদ্ধে আকবর হোসেনের অবদানের কথা ভুলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ ও জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলেও স্বাধীন দেশে সে যথার্থ স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায় নি। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন,

আমরা আশ্চর্য হই ভেবে, যে-আকবর হোসেনের গেরিলা তৎপরতা
ও সাফল্যের কাহিনী এ অঞ্চলে অচিরকালের মধ্যে পরিণত হয়েছে
উপকথায়,সেই আকবর হোসেন তার চরম শত্রু দু'জন সৈন্যকে
ছেড়ে দিয়েছে বা পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে-
এমন একটি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসকে
মান্দারবাড়ির লোকেরা প্রশ্রয় দিল কী প্রকারে?
অথচ এখন তো আমাদের কল্পনা করবার কথাও নয়, যে,
বছর পাঁচেক পরেই, মাত্র দেড় কী পৌনে দু'হাজার দিনের ব্যবধানেই

---

[৪৪] তদেব, পৃ. ২০০।
[৪৫] তদেব, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

এর চেয়ে অনেক মারাত্মক পরস্পর বিরোধিতা আমরা নির্মল চিত্তে
মেনে নেব,
বহু দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী এবং বহু দেশদ্রোহীকে দেশপ্রেমিক বলে
আমরাই চিহ্নিত করব।[৪৬]

মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চনার ইতিহাস ঔপন্যাসিক কাব্যময় বিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। অন্তর্গত উপন্যাসের কাব্যময় বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের বঞ্চনার ইতিহাস। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনা, বাঙালির গৌরবময় আত্মত্যাগের কাহিনি ও ইতিহাস; কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদন পরেই মানুষ ক্রমশ বিস্মৃত ও দূরবর্তী করে তোলে সেই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত প্রদান করেছেন উপন্যাসে।[৪৭]

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এর মতে,

> তাঁর 'অন্তর্গত' উপন্যাস দুটি কারণে বিশিষ্ট। এখানে উপন্যাস কবিতার শরীরে উপস্থাপিত। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন-মুক্তিযুদ্ধের সে চেতনা কোথায় গেল? কোথায় সেই ক্রোধ? কোথায় আমরা? কোথায় এখন এই দেশ? এই সব তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সামনে আছে প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের বর্তমান অসহায়তা ও রিক্ততা। রক্তের টান, নাড়ীর টান এখানে মিশেছে তীব্র গভীর দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের প্রবাহে, যাতে চোখ ভিজে যায়।[৪৮]

এ উপন্যাসের রচনারীতির প্রশংসায় রফিকউল্লাহ খান বলেছেন, ''কবিতার অবয়বে সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসের শিল্পরীতির সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।"[৪৯]

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিকরা সাহিত্যের নব নব দ্বার উন্মোচন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের উপাদানকে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিকগণও বিভিন্ন উপন্যাস রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, লুণ্ঠন ও নৃশংসতার বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি বাঙালির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। *নীল দংশন*, *নিষিদ্ধ লোবান*, *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* ও *অন্তর্গত* প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময় পরম্পরাকে অবলোকন করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলে কেবল তাঁর শিল্পীসত্তারই নয়, বাঙালি জাতিসত্তার ক্রমরূপান্তরের ইতিহাসও অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত তাঁর এ উপন্যাসগুলো ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

[৪৬] তদেব, পৃ. ২৩৭।

[৪৭] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২।

[৪৮] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১), পৃ. ৩১০।

[৪৯] রফিকউল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৯।

মমতাজউদদীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধের নাটক : প্রতিবাদী চেতনার শিল্পিত প্রকাশ

শামীম আরা*

Abstract: The Bangladeshi Artists are one of the worst victims of the Pakistani military assassins during the liberation war of 1971. The Bangladeshi Artists wrote drama inspired by the spirit of the movement for freedom. Although, living in the region of terror, they played role as a sound-solder. In the drama of Momtazuddin, we observe vision of freedom, post freedom movement, evaluation crisis, political autocracy, reminiscence of freedom fight and slogan to overcome. This positive soul vision is the distinguishing fundamental source of Momtazuddin in Bangladeshi drama culture.

ষাটের দশকের শেষ লগ্নে বাংলা নাট্যাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে তিন দশকের নিরন্তন সাধনায় যিনি নির্মাণ করেছেন স্বকীয় এক শিল্পভুবন,একজন প্রতীভাদীপ্ত নাট্যকার, অভিনেতা, প্রাবন্ধিক, সংগঠক ও কথক হিসেবে বাংলাদেশের নাট্যভুবনে যাঁর স্বগৌরবে পদচারণা, তিনি মমতাজউদদীন আহমদ (জ. ১৯৩৫)। আন্তরিকতা, শ্রমনিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, স্বদেশপ্রীতি এবং মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর এ পরিচিতিকে করেছে অধিক সমৃদ্ধ। ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং স্মৃতিগৌরবে অমলিন ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যরূপায়ণে তিনি কুশলী কারিগর। তাঁর রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলো হলো: *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, বর্ণচোরা, এই সেই কণ্ঠস্বর, বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল*, এবং *সাতঘাটের কানাকড়ি*।

শৈল্পিক মানদণ্ডে এসব নাটক বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক নাটকগুলো অবশ্যই নাট্যকারকে পৌঁছে দিয়েছে সফলতার শীর্ষে। এ পর্যায়ে মমতাজউদদীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটকগুলো আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশের জনগণের মনে পুঞ্জীভূত ক্রোধ, ক্ষোভ বিদ্রোহ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। লেডি গ্রেগরির *দি রাইজিং অব দি মুন* অবলম্বনে রচনা করেন *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)[১] নাটকটি। চারটি চরিত্র-নির্ভর এ নাটকে নাট্যকারের দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে তীক্ষ্ণ সংলাপের মাধ্যমে। বিদেশি নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত হলেও রূপান্তরে নাট্যকার এতবেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন যে নাটকটি নিজস্বতায় পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন – 'রূপান্তরে নির্বিচার স্বাধীনতা নিয়ে এ নাটককে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্পৃহায় সংস্থাপন করতে চেয়েছি।'[২]

ছোট্ট একটি গঞ্জের নদীর ফেরিঘাটে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃষ্টিভেজা রাতে সরকারের সামান্য বেতনভুক্ত নিষ্ঠাবান দারোগা নুর মোহাম্মদ দুইজন সিপাই দলিলুর রহমান ও আব্দুল বারেক মণ্ডলকে

---

* ড. শামীম আরা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

[১] মমতাজউদদীন আহমদ, "স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা" *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার* (ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, দ্বিতীয় প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৯), পৃ. ৫৯।

[২] মমতাজউদদীন আহমদ, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল ১৯৭৭), "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"

নিয়ে সরকারের নির্দেশে দেশের শীর্ষস্থানীয় জনপ্রিয় নেতা বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে গ্রেফতার করার জন্য টহল দিচ্ছে। এই পথে শত শত রাহী পারাপার করলেও পায়ের চিহ্ন দেখে সহজেই বিপ্লবীকে চেনা যাবে কারণ দারোগা নুর মোহাম্মদ মনে করেন বিপ্লবী সাবধানে পা ফেলবেন, সুতরাং বেমানান পায়ের চিহ্ন দেখে খুব সহজেই তাঁকে ধরতে পারবেন তিনি। সরকার ঘোষণা করেছে, তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে পুলিশের চাকরিতে পদোন্নতি। কিন্তু তাঁকে ধরা কি সহজ, যতটা অশঙ্কা করছি তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর সে। এত বড় বিশাল নেতা, যার নাম শুনলেই দেশের কোটি কোটি মানুষ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, আনন্দে নেচে ওঠে নতুন উদ্দীপনায়, এমনকি স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর জনতা পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেয় সে জাদুকরী নেতার নামে তাকে দু'হাজার টাকা কেন দশ বিশ হাজার টাকার লোভেও কেউ ধরিয়ে দেবেনা বলে মনে করে সিপাই দলিলুর রহমান। তাই হঠাৎ দলিলুর রহমানের কণ্ঠে "বিপ্লবী" শব্দটি শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে পাকিস্তানি সরকারের হুকুমের গোলাম নূর মোহাম্মদ দারোগা।

ধর্মের নামে শাসন আর শোষণকারী পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সেবা দাস নূর মোহাম্মদ দারোগা ২৪ বছর যাবৎ সততা আর নিষ্ঠার সাথে পুলিশের চাকরি করতে গিয়ে সরকারের ভাষাতেই কথা বলতে অভ্যস্ত, তাহলে এটা কী সত্য নয় যে পাকিস্তানি সরকারের কেনা গোলাম, যাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ধর্মের নামে ভণ্ডামির তত্ত্ব তাঁদের হৃদয়ে কী দেশপ্রেমের রক্ত নেই, হৃৎস্পন্দনে কী কখনও মাতা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমির জন্য ভালবাসা নেই ? তার বিশ্বাস –

'বিপ্লব'-কে তুচ্ছ মনে করলেও 'বিপ্লবী'কে বড় ভয় নূর মোহাম্মদের, তাইতো সিপাই দলিলুর রহমানকে উত্তেজিত হয়ে বলে :

> বিপ্লবী ? তুমিও শিখে নিয়েছ বিপ্লবী। পুলিশের মগজে বিপ্লবী ঢুকে গেছে। দলিলুর রহমান তোমার কেস তুমি নিজেই কামড়ে খাচ্ছ। ও সব ভুলে যাও। বিপ্লবী নয়, বল বিদেশী চর, দেশের দুশমন, জাতির শত্রু। পুলিশের লাইনে থাকলে ফর্মা মাফিক কথা বলতে, অর্ডার মাফিক লাঠি ঘুরাবে, বুঝলে।[৩]

এরপর বিপ্লবী নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন যখন মাথায় লম্বা চুল ও মুখে দাড়িসহ গায়েনের ছদ্মবেশে খেয়াঘাটে এসে নদী পার হতে চায় তখন নূর মোহাম্মদ পুলিশের স্বভাবসুলভ ভাষায় 'কুত্তার বাচ্চা' বলে গালমন্দ করে অথচ দেশের জন্য যে গভীর প্রেম তার বুকে লুকিয়ে আছে সে কথা প্রথম উদ্ধার করেন বিপ্লবী মোয়াজ্জেম। ছাত্র অবস্থায় দেশের জন্য তার চোখে জল আসতো কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে নূর মোহাম্মদ বলেছে :

> এখনো কাঁদে। যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালবাসি গরীবুল্লাহ।[৪]

নূর মোহাম্মদ ব্রিটিশ আমলের ছাত্র, এদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে এক সময় সেও সংগ্রাম করেছিল। অথচ পাকিস্তান সরকারের অন্ন ভক্ষণ করে, মেয়েকে পাত্রস্থ করার আশায় দেশপ্রেম মলিন, ধূসর হয়ে পড়েছে। হৃদয়ের গভীরে সুপ্তোত্থিত দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তুলল বিপ্লবী মোয়াজ্জেম। নূর মোহাম্মদের কণ্ঠে ভেসে উঠল 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, কে তাকে আশা দিবে, কে তাকে ভরসা দিবে, কেমন সুন্দর কথা, যতবার শুনি মনে হয় বুকের মধ্যে

---

[৩] মমতাজউদদীন আহমদ, "স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা" *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

[৪] তদেব, পৃ. ৭৪।

ধরে রাখি'।[৫]

নূর মোহাম্মদ সেই প্রতীকী চরিত্র যে চরিত্রগুলোর অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি জালেম শাসকগোষ্ঠী ধর্মের নামে দীর্ঘ ২৩টি বছর শোষণ করেছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। দারোগা নূর মোহাম্মদ বিপ্লবী মোয়াজ্জেম বা গরীবুল্লাহকে দুনিয়ার পরিবর্তে বেহেশ্‌তে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশ্বাস দেয়। সে বা তারা ভাবতেই পারে না পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আল্লাহ্‌র নামে কমল বিশ্বাস অর্জন করে তাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে কিন্তু নূর মোহাম্মদের মতো মানুষের উপলব্ধি করার সাহস তো দূরের কথা বরং কপালে দুঃখ আছে বলে গরীবুল্লাহ্‌কে সাবধান করে সে।

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী নেতা মোয়াজ্জেম হোসেনের নূর মোহাম্মদ দারোগার হৃদয়ে গ্রন্থিত ভালবাসাটুকু আবিষ্কার করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। অবশেষে বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে চিনতে পারে নূর মোহাম্মদ। যাকে ধরার জন্য এতো চেষ্টা, যাকে ধরতে পারলে প্রমোশন নিশ্চিতসহ দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, সেই সুযোগকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিপ্লবীকে পালাতে সাহায্য করল নূর মোহাম্মদ। সিপাই দলিলুর রহমান হঠাৎ রাইফেল তোলে বিপ্লবীকে হত্যা করার জন্য, নূর মোহাম্মদ তাকে সেই সুযোগ আর দেয়নি। নাট্যকার নূর মোহাম্মদের কণ্ঠে যে সংলাপ তুলে দিয়েছেন তা একজন স্বাধীনতাকামী দেশ প্রেমিককে চিনিয়ে দেয় :

> বড় সাহেবকে বলব, জ্বি হাঁ আমি নূর মোহাম্মদ ছোট দারোগা, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছি আর আমার সিপাহী দলিলুর রহমানকে গুলী করেছি। আর কী বলব আমি শালা একটা আবার কে যে আমাকে এত কথা বলতে হবে ? ঐ যে চাঁদটা জানে আমার আর কোন কথা বলার দরকার নাই। ডিউটি ইজ ডিউটি।[৬]

ইতিহাস-সচেতন নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাস-রাজনীতি, ভূগোল, সঙ্গীত-সাহিত্য, ভাষা, সংগ্রাম প্রতিটি বিষয়ের উপস্থিতির সুযোগ সৃষ্টি করছেন *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* নাটকটিতে। তিনি মূলত পূর্ব বাঙলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করেছেন এ নাটকের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কয়েকদিন পূর্বে মমতাজউদদীন আহমদ রচনা করেন দ্বিতীয় নাটক *এবারের সংগ্রাম* (১৪ মার্চ,১৯৭১)।[৭] পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করার দালিলিক প্রমাণ-স্বরূপ বাদশা, উজির, সিপাহী ইত্যাদি চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার যার আড়ালে ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকের অত্যাচারের কাহিনি। ১৯৬৯ সালে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব-বিরোধী তীব্র গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিলে জেনারেল আইয়ুব খান আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। ক্ষমতা লাভের পর জেনারেল ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগ্রামী জনতাকে আশ্বস্ত করতে চান।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা আর অবজ্ঞা-অবহেলার শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত মানুষ। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের পক্ষ থেকে কোনরকম সাহায্য-সহযোগিতা আসেনি। সেই বাস্তব বিষয়টি উজির রূপী ভুট্টোর সংলাপে স্পষ্ট

---

[৫] তদেব, পৃ. ৭১।

[৬] তদেব, পৃ. ৭৭।

[৭] মমতাজউদদীন আহমদ, "এবারের সংগ্রাম", *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

হয়েছে:

> পূর্ব দেশে ঝড় তুফানে যখন দশ লাখ লোক সমুদ্দুরের পানিতে মরে গেল, আমরা কেউ দেখতে যাইনি, ওদের পেটে খাবার নাই, আমরা খেতে দেই নি, ওদের ছাত্রদের গুলী করে মেরেছি। ওদেশে কল কারখানা করিনি, বন্যাতে সয়লাব হয়ে গেল, আমরা এখানে শুকনাতে বসে ফিক ফিক করে হেসেছি হুজুরে হাম রাহি।[৮]

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা সাতচল্লিশ পরবর্তী সময় থেকে একাত্তর পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার নিয়ে ছলনা করেছে, তাদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ নাট্যকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন, সেই ছয় দফার একটি দফাও ছাড়বে না পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ফলে উজির ও বাদশা বড়ই উদ্বিগ্ন। নির্মম, নিষ্ঠুর, টিক্কা খানের হাতে ভুট্টোর কুপরামর্শে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন বাদশাহরূপী ইয়াহিয়া খান। এ নাটকে সমকাল এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, নাটকের বাস্তবতা, চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা ও চরিত্রের সম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা জানি আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ৮৪টি আসনে বিজয়ী পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো এসেম্বলিতে বসতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারই কুপরামর্শে জেনারেল ইয়াহিয়াও এসেম্বলি আহ্বান করতে টালবাহানা করে যা ঐতিহাসিক সত্য।

নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, সিপাহশালাররূপী টিক্কা খান পূর্ব বাংলায় এসে কাজীরূপী প্রধান বিচারপতির কাছে আসে এবং শপথ পাঠ করানোর জন্য তার সদর দপ্তরে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু কাজী তাতে সম্মত হননি। সেদিন বাস্তবেও তাই ঘটেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি-এ-সিদ্দিকী লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে বাংলার গভর্নর হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাননি।

সেই 'মানুষ'টির হাজারো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কী সেই নর পিশাচদের আছে ? কতগুলোর জবাব দেবে তারা ? ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ব্রিটিশ রাজত্ব, দু'দুটো মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভাষার জন্য রক্ত, বন্যার জন্য দুর্ভিক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছাস, লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় মৃত্যু, রাত্রির ভয়ার্ত আর্তচিৎকার– –জবান তখন বন্দী তাইতো না শোনার ভান করে থাকে তারা। কিন্তু 'মানুষ',যিনি জাতির বিবেকরূপী,স্বাধীনতাকামীর প্রতীক হিসেবে জানতে চায়:

> দেশের কোটি কোটি মানুষের রক্ত ধীরে ধীরে শুষে নিয়ে কি করে বাইশটা পরিবার কোটিপতি হয়েছে দ্যাখনি, কঙ্কালের সারি, মানুষের মিছিলকে পথে ঘাটে মরে থাকতে দ্যাখনি ?[৯] ... আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ আকাশ এ মাঠ আর সমুদ্রকে বলে দিচ্ছি, ভাইসব, এদের চিনে রাখ, এরা ধর্মের নামে, সংহতির নামে, নানা ফন্দির জাল বিস্তার করে আমাদের শোষণ করছে। আর এদের ছেড়ে দিওনা। এবার এরা ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের সন্তানকে হত্যা করবে। এরা খুনী। মানুষের রক্তের বিনিময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে আনে, তোমরা এদের নির্মূল কর।[১০]

নাটক পাঠে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জনতার প্রতিনিধি এই 'মানুষ'টি আসলে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে

---

[৮] তদেব, পৃ. ৮২।
[৯] তদেব, পৃ. ৯৩।
[১০] তদেব, পৃ. ৯৪।

বাংলার সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। শহর-বন্দর-গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ যেন ১৯৭১ সালের ১৪ই মার্চ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইয়াহিয়া খানের সেই পালিয়ে যাওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তবে 'মানুষ'টির আশাবাদ সুদূরপ্রসারী ছিল:

> আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব। ভাই সব, সূর্যের আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এস, ঘর ছেড়ে বাইরে এস, শ্যামল ঘাসের দেশে।
> এবারের সংগ্রাম
> স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১১]

স্বাধীনতার দাবিতে তীব্র গণ-আন্দোলন চলাকা ন রচিত এই নাটকে বক্তব্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়, আর এটাই হওয়া স্বাভাবিক কারণ শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং জনগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাই সমকালীন নাট'কের উদ্দেশ্য ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মমতাজউদদীন আহমদের তৃতীয় নাটক *স্বাধীনতার সংগ্রাম* (২১ মার্চ, ১৯৭১)।[১২] ২৪শে মার্চ লাখ লাখ জনতার সামনে মঞ্চস্থ এই নাটকটি স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী জনতাকে সেদিন সাহসী করে তুলোছল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য। আট চরিত্র-বিশিষ্ট দুটো দৃশ্যে বিন্যস্ত এ নাটকটির প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রাজপথের মোড়, অকস্মাৎ সান্ধ্য আইন ঘোষিত হয়েছে। বর্গীওয়ালা হুকমত খাঁকে সঙ্গে নিয়ে পর্যবেক্ষণে বেড়িয়েছেন। ওরা যেদিকে তাকায় সে দিকেই দেখতে পায় স্বাধীনতার পোস্টার 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

এ নাটকে বর্গীওয়ালা চরিত্রটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বাঙালি হত্যার নীল নকশা বাস্তবায়নে বেশ কৌশলী এই চরিত্র। একদিকে পশ্চিমা নেতারা বাঙালি নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় ব্যাপ্ত রাখবে, অপর দিকে এই সুযোগে ওরা জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করবে। এবং এ অঞ্চলের মালামাল সব পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করে দেবে। তারপর সময়মতো হত্যাযজ্ঞ শুরু করবে। 'এদের মাটির মতন এমন সোনার মাটি কোথায় পাবে? পাট আর ধান।' বর্গীওয়ালার এই উক্তির মাধ্যমে শুধু যে তাদের কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়, আমাদের দেশের মাটির মতো পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যে যাবে না, এই গৌরবের মর্যাদাও প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে, ঈমানের দোহাই দিয়ে এরা এদেশের ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানকে দীর্ঘ তেইশ বছর শোষণ করেছে। বাঙালি জাতির কাছে এদের ধর্মের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে বারবার। তাই হুকমত খাঁ যখন ফিল্ড মার্শাল এর কেতাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তখন বাঙালি দুখু প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এরপর নাটকে দেখা যায় বর্বর হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের এক বীভৎস চিত্র। বাঙালি সুইপার ঝকড়ু দারু পান করে ট্রাকে লাশ তোলার কাজ নিয়েছে। মানুষের রক্তাক্ত লাশ টানতে টানতে ঝকড়ুর হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে, সে অস্বীকৃতি জানায় – তার দ্বারা এ কাজ হবে না।

ওরা ঝকড়ুকে দিয়ে আর লাশ উঠাতে পারেনি। এর মধ্যে সান্ধ্য আইনের নিয়মে ধরা পড়লেন এক বৃদ্ধ। অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে ঔষধ কিনতে বেরিয়েছিলেন। শিকারির থাবায় এসে পড়েছেন, জানতেন না সান্ধ্য আইন জারির কথা। বৃদ্ধের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এই কথা জানিয়ে তিনি হুকমত খাঁর সহানুভূতি পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঘটনাটা উল্টো ঘটে গেল। প্রফেসর শব্দটি শুনেই হুকমত খাঁ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বৃদ্ধ পিতাকে বারবার অপমানিত করার পরও তাদের

---

[১১] তদেব, পৃ. ৯৫।
[১২] মমতাজউদদীন আহমদ, "স্বাধীনতার সংগ্রাম", *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

আশা মেটে না। পুত্র ফারুক পিতার খোঁজে আসা মাত্রই তাকে গুলী করে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ছেলে বাবাকে দেরী না করে তাড়াতাড়ি ঔষধ নিয়ে যেতে বলে মৃত্যু পথযাত্রী মায়ের জন্য। চোখের সামনে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে মরতে দেখে বাবা চিৎকার করে বলে 'তোর জন্যে যে আমি কলম কিনেছি বাবা, তুই যে বলেছিলি কবিতা লিখবি, বাংলাদেশের কবিতা।'

পিতার আকুল ক্রন্দনের জবাব দিয়েছে সেই সন্তান, বলেছে – 'বাবা, এ কলমে আমার বুকের রক্ত ভরে নাও। রক্তভরা কলমটা ছোটভাই মতিউরকে দিও। রক্ত দিয়ে মতিউর দেশের গান লিখবে।' সত্যিই তাই হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে হাজারো মতিউর দেশের গান লিখেছে, এদের কলমের কালি যে কখনই ফুরোবে না। কাল থেকে মহাকাল পর্যন্ত তারা লিখেই যাবে। কত ফারুক যে তাঁদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে, তার কি শেষ আছে।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যটি গভীর রাতের বধ্যভূমির। পাকিস্তানি বর্বর হিংস্র হানাদার বাহিনী এ দেশের নিরীহ বাঙালি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলে দিত সেই বধ্যভূমিতে। এমনি এক বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে একজন স্বাধীনতাকামী গায়ক, একজন সংগ্রামী যুবক জহুরুলকে আর সেই বৃদ্ধকে। গায়ককে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বৃদ্ধ আল্লাহ'র দোহাই দিচ্ছে তাকে হত্যা না করার জন্য কিন্তু গায়ক বলছে:

> আপনি দুঃখ করবেন না। এইতো আমরা চেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলাদেশের জন্য আমি যে জীবন দিতে পারছি, এ আমার কত আনন্দ ![১৩]

এরপর পালা আসে সংগ্রামী যুবক জহুরুলের। যুদ্ধ চলাকালে যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ে তাহলে তার মৃত্যুটা হয় অন্য সকলের থেকে আলাদা। জহুরুল চরিত্রের পরিণতির মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপিত হয়েছে। জহুরুলকে বর্গী জিজ্ঞাসা করে 'মরবে না বাঁচবে'? অথচ মৃত্যুর আগেই তার আঙ্গুলের মধ্যে চারটা করে মোটা মোটা সুঁই গলগল করে ভরে দেয়া হয়েছে, দশ হাজার পাওয়ার লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন - তিন রাত বসিয়ে রেখে চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়েছে । বুকে আর পিঠে শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে তবুও তার বাঁচার সাধ জাগে স্বাধীন দেশ দেখবে বলে। বর্গী তাকে গায়কের মতো হত্যার হুকুম দিলে জহুরুল উদ্দাত্ত কণ্ঠে বলে – 'আমি আবার বেঁচে উঠব। যতবার মারবে ততবার বাঁচব।[১৪] অবশেষে জহুরুলকে হুকমত খাঁ নিয়ে গিয়ে কানের মধ্যে নল ঢুকিয়ে হত্যা করে। অতঃপর বৃদ্ধের পালা, কিন্তু দুখু এবার বৃদ্ধকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। নিরস্ত্র দুখুর শরীরে রক্ত টগবগ করে কিন্তু কিছুই করার নেই যেহেতু পাকিস্তানিরা অনেক আগেই কৌশলে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল বাঙালিদের।

এ তিনটি নাটকের সময় ও বিষয় একই সূত্রে গাঁথা। বস্তুত একজন নাট্যকারের সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বীভৎসতা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবার অবকাশ নেই। অকুতোভয় নাট্যকার রূপকের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণকে, পাশাপাশি পূর্ব বাঙলার মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রকাশিত হয়েছে শিল্পিতভাবে। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা বিকাশে এসব নাটক ঐতিহাসিক নাট্য দলিল হিসেবে মর্যাদা পায়।

মমতাজউদদীন আহমদের *বর্ণচোরা* (ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)[১৫] নাটকটি *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* গ্রন্থের সর্বশেষ নাটক। ২৫ মার্চ ১৯৭১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এ নাটকের সময়পট। এই

---

[১৩] তদেব, পৃ. ১০৮।

[১৪] তদেব।

[১৫] মমতাজউদদীন আহমদ, "বর্ণচোরা", *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

নাটকে নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী বাঙালি দালালের মুখোশ উন্মোচন করেছেন গোলাম সাদেক চরিত্রের মাধ্যমে। শেরওয়ানি ও মুজিবকোটের প্রতীকী বর্ণের আড়ালে আপন পুত্রবধূকে পাকিস্তানি সেনার কাছে নিজে তুলে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ তিনি করেছেন। কারণ 'আপন বংশে পবিত্র রক্ত' তার কামনা ছিল। বর্ণচোরার মতো বর্ণ ধারণ ও লুকিয়ে রেখে অসম্ভব চারিত্রিক ধৃষ্ঠতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন কতিপয় সংলাপের মাধ্যমে সহজেই বিষয়টি অনুমেয়:

১. দেশপ্রেমিক যুবক জহুরুল :

> ... ইনি গোলাম সাদেক; আমাদের জাতীয় আন্দোলনে এবং প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক চেতনায় অতীতে বেশ কয়েকবার আঘাত হেনেছেন। ইনি পশ্চিমাদের সঙ্গে আঁতাত করে আমাদের জাতীয় সম্পদ ও সুযোগ বিনষ্ঠ করেছেন। ইনিই ভাষা আন্দোলনের সময় আমাদের ভাইদের হত্যা করেছেন।[১৬]

২. দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে গোলাম সাদেক বলে:

> ... ক্ষমা চাই ভাইসব। যদি বিশ্বাস না হয় দেখুন, আপনারা দেখুন, আমি নিজের হাতে আমার চল্লিশ বছরের পোশাক খুলে ফেলছি। দেশের খাঁটি পোশাক পরছি। আজ থেকে এই আমার [শেরওয়ানী খুলে মুজিবকোট পরল] পরিচয়।[১৭]

৩. আহত যুবক স্বপন এসে যখন বলে পাক বাহিনী আমাদের আক্রমণ করেছে ঠিক তখন:

> আমি চল্লিশ বছর ধরে রাজনীতি করি। যতসব সেন্টিমেন্টাল আর উজবুকের দল। স্বাধীনতা নিব? কিসের স্বাধীনতা কায়েদে আযম সাহেবের পবিত্র দেশ ভেঙে খান খান করবে আর বসে বসে আমি তামাশা দেখব ? না। তা হবে না।[১৮]

বর্ণচোরা সাদেক নিজের বিপদের আশঙ্কা বুঝে মুহূর্তেই তার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলে। দেশপ্রেমিক জহুরুলকে ক্যাপ্টেনের কাছে 'এনিমি' বলেই ক্ষান্ত হয় না, নিজের হাতে দেওয়া এক লাখ টাকার চেক জহুরুল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এমন মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করেনি সে। পঁচিশে মার্চ রাতে সভা চলাকালীন পুত্রবধূ বর্ণালীকে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে পাগল পুত্র মতিউরকে ঘুম পাড়াতে বললেও সেই সাদেকই পাকবাহিনীর হঠাৎ আগমনের পর বর্ণালীকে বলে:

> আমি শেষ বারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি এখানে কেউ রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারবে না। ঐ ছোট লোকের মেয়েটা রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। বর্ণালী, সবধান। দরকার হলে আমি খুন করতে পারি তা তুমি নিশ্চয় জান। এখন প্রয়োজন হলে তোমাকেও আগুনের মধ্যে ফেলে পুড়িয়ে মারব। বাংলাদেশ ? বাঙালি ? জুতো মেরে দেশ ছাড়া করব পাকিস্তানের দুশমনদের।[১৯]

একাত্তরের পূর্বে আইয়ুব সরকারের শাসনামলে পূর্ব বাংলায় যে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সাদেকের সংলাপে সে বিষয়টিই উঠে এসেছে স্পষ্টভাবে। পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে ক্যাপ্টেনের গাড়িতে পুত্রবধূ বর্ণালীকে উঠিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখে পাগল পুত্র মতিউর পিতার গলা টিপে ধরে। নিজের পুত্রবধূকে নরঘাতকদের হাতে তুলে দিয়েও সাদেক তৃপ্ত হয়নি। তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। যা ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড – জাতির বিবেককে

---

[১৬] তদেব, পৃ. ১১৬।
[১৭] তদেব, পৃ. ১১৭।
[১৮] তদেব, পৃ. ১২০।
[১৯] তদেব, পৃ. ১২২।

হত্যা করার সামিল। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী আলবদর বাহিনী এইসব হত্যাকাণ্ড চালায়। গোলাম সাদেক ও তার সহযোগী আলবদর রাজাকারদের প্রতীক বাতেনের সংলাপের মধ্যে উঠে এসেছে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা ও বীভৎস চিত্র। বাতেন জানায়:

> বন্দোবস্ত খুব পাকা ছিল হুজুর। কারো দুটো চোখ উপড়ে নিয়েছি, কারো মুখের মধ্যে গরম লোহার রড আহিস্তা আহিস্তা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কোন কোন কাফেরের সিনা চিড়ে কলিজা টেনে আনলাম। মাগীগুলোকে হাত পা বেঁধে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম। কারো শরীর থেকে চামড়া চড় চড় করে টেনে নিলাম, তারপর মরিচ আর নূন ছিটিয়ে দিলাম চর্বিতে। ... ওরা যখন পানি খাবার জন্য মুখ খুলছিল, আমরা ছড়ছড় করে পেচ্ছাব করে দিয়েছি।[২০]

গোলাম সাদেক বাতেনকে অভয় দেয় যে, বিশ্বেও সেরা শক্তি মার্কিনিরা সপ্তম নৌবহর নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য আসছে, অতএব জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু বাতেনের ভয় হয় কারণ সে জানে পরাজয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে 'শুনেছি মুক্তিবাহিনীরা রাজধানীর মধ্যে আজ সকালেই ঢুকে পড়বে হুজুর।' নাটকের শেষ দৃশ্যটি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ভোরবেলার। পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে ফিরেছে বর্ণালী। মুখমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত, আপাদমস্তক পাকবাহিনীর নখরাঘাতের চিহ্ন নিয়ে যখন সে গোলাম সাদেকের সামনে এসে দাঁড়ায় – ভীত সন্ত্রস্ত গোলাম সাদেক মুহূর্তেই আবার নিজের পরিচিত রূপে ফিরে আসে। বলে :

> বৌমা কী দেখছ ? আমি তোমার শ্বশুর।... আমি মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি। কসম আল্লার আমি একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে হাজার হাজার ফুল নিয়ে যাব। গান গাইব : আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো গাও মা সেই গানটা গাও তো।[২১]

গোলাম সাদেকের একমাত্র পুত্র মতিউর। সে পাগল তার একমাত্র ছেলে এক বছর বয়সী পলাশকে যেদিন হত্যা করা হয় সেদিন থেকে। পলাশের অপরাধ সে ২১শে ফেব্রুয়ারি জন্মেছিল। শেষ পর্যন্ত মতিউর তার নরপিশাচ বর্ণচোরা পিতাকে ক্ষমা করতে পারে না। পিস্তল তুলে দেয় লাঞ্ছিত স্ত্রীর হাতে আর এভাবেই তার পতন দেখানো হয়।

একজন স্বাধীনতাবিরোধী ঘৃণ্য দালালের চরিত্রকে এ নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবে। মঞ্চ সফল এসব নাটকের আবেদন ছিল মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতিগুলোর ভাজ খুলে উন্মোচন করা। *বর্ণচোরা* কেন লিখলেন বা বিশেষ কোন ঘটনাকে তিনি ক্ষমা করতে পারছেন না এধরনের প্রশ্ন যদি নাট্যকারকে করা যায় তাহলে *বর্ণচোরা* সম্পর্কিত তথ্য থেকেই তা সহজেই বোঝা যাবে। নাট্যকার বলেছেন :

> স্বাধীনতা-বিরোধী শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে তখন দারুণ ক্ষোভ। প্রতারকদের চেহারা অসহ্য লাগত। সেই যন্ত্রণা, ক্রোধ এবং জ্বালা নিয়ে বর্ণচোরাকে চিহ্নিত এবং বর্ণালী নামের বাংলার রমণীর যুদ্ধ ক্ষতকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি। অপরাধ গোপন করার জন্য বর্ণচোরা প্রগলভ বলেই এ নাটকে বর্ণালী নিঃশব্দ নীরব। মঞ্চে যখন বর্ণচোরা এল দর্শক তাকে ক্রোধ দিয়ে তিরস্কার করেছে। বাংলাদেশে ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক বর্ণচোরা শ্রবণ করে একজন চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, বর্ণচোরাকে মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু যারা বর্ণচোরাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয় তাদের জন্য আপনার নাটকের শেষ দৃশ্যে একই পরিণাম থাকবে তো ? পত্র লেখকের সে চিঠির উত্তর আমি এখনও রচনা করিনি।[২২]

---

[২০] তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬।

[২১] তদেব, পৃ. ১২৮।

[২২] মমতাজউদদীন আহমদ, *আমার নাট্য ভাবনা* (ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, প্রথম প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১০৭।

দীর্ঘজীবনের বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মমতাজউদদীন আহমদের বিচরণ আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এমন এক কালের সামীপ্যে যে কাল দ্রোহ ও দহনের, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। শ্রম, মেধা ও মননের ত্রয়ী বন্ধনে তিনি যে শিল্প রচনা করেছেন তা মানুষের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, কামনা-বঞ্চনা, আশা-নিরাশা ও সংগ্রামে-সংঘর্ষের অবিরাম প্রতিঘাত। তিনি তাঁর সৃজনশীল জীবনের নানান বাঁকে বাঁকে যে ক্রুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণ করেন সেই সংলাপের ক্রোধাগ্নি যেন সকল সময় সেইসব দানবদের দাহ করে যারা দেশ এবং জাতির রক্তপান করে কুৎসিত উদ্‌গার তোলে বিবমিষায় ভরিয়ে দেয় আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমি। এ প্রসঙ্গে ড. আফসার আহমদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সৃষ্টিশীল মানুষরূপে তিনি বড় বেশি মানুষের কাছাকাছি। তাঁর এই 'কমিটমেন্ট' রাজনীতির কানাগলির অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা কারো কারো কাছে একপেশে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শিল্পের নিরপেক্ষতায় বিচার করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেন হাজার বছরের বাঙালির সংগ্রামের, আনন্দের, গানের, নাট্যের, উপাখ্যানের ধারাবাহিকতায় একজন প্রকৃত বাঙালির প্রতিকৃতি। আর খাঁটি বাঙালি বলেই তো তিনি জীবনের আনন্দকে কষ্ট ও বেদনার করুণ তানে বাঁধতে পেরেছেন তাঁর জীবনমুখি সকল সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে।[২৩]

উল্লিখিত ও আলোচিত চারটি নাটকের সমন্বয়ে লেখকের শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থ *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* প্রকাশ করেছিল বাংলা একাডেমি। নাট্যকার এই গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> এ নাটকগুলো আমার ভাবনার উদ্ভাবন নয়, ভালোবাসার ও বিশ্বাসের সমগামী। সে একাত্তর, সে সমুদ্র, সে জনপথ এবং দিন রাত্রির উজান পবন আমাকে যে ভাবে আনন্দে উল্লসিত, দুঃখে ক্ষুব্ধ এবং যন্ত্রণায় অস্থির করেছে, আমি নির্বিবাদে সেই হর্ষ বিষাদ ধারণ করেছি। এখনকার কোন এক সুমজ্জিত মঞ্চের পাদ প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার নাটকগুলো সে জ্বালাকে তেমনভাবে উদ্ভাবন করতে পারুক বা নাই পারুক আমার কাছে সেই একাত্তর এবং তার অনল পবন সত্য হয়ে থাকেবে।[২৪]

মমতাজউদদীন আহমদের শ্রেষ্ঠ নাটক *বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল* (১৯৮৫)। *বিবাহ* নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় ভাষা আন্দোলন হলেও ইতিহাসের ক্রমধারায় তা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক *কী চাহ শঙ্খচিল* নাটকের সঙ্গে একীভূত ও একাত্ম। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নাট্যকারের ভাষ্য:

> স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে কি চাহ শঙ্খচিলের বিষয় নির্ধারিত। বিবাহ নাটকের সখিনা এবং কি চাহ শঙ্খচিলের রৌশন আরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন স্বাধিকার এবং একাত্তরের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত তেমনি বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ।[২৫]

বিবাহ নাটকের সখিনার যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নকে লালন করেই মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 'সে যখন গায়ে হলুদ আর হাতে মেহেদী মেখে বধূবেশে বসেছিল, তখন তার হবু বর বায়ান্নর উত্তাল মিছিলে ছুটে গিয়ে নিজ রক্তের বিনিময়ে ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। সখিনার চেতনায় সেই

---

[২৩] আফসার আহমদ, "কালের শঙ্খে বাজে তাঁর সৃজনের ক্রোধ ও বেদনার সুর ॥" নিলুফার বানু সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ নাট্য এবং* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন ও থিয়েটার এর যৌথ প্রকাশনা, ২০০৪), পৃ. ২৮০-২৮১।

[২৪] মমতাজউদদীন আহমদ, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত।

[২৫] মমতাজউদদীন আহমদ, *বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), ভূমিকা।

হলুদের রঙ রক্তের মতোই গভীর। মোছা যায় না।'[২৬]

সখিনার বাবাকেও মমতাজউদদীন আহমদ বাংলা ভাষা, স্বাধীনতা ও মানবতার পক্ষের একজন দরদি মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, 'ঢাকাতে শুনছি ছাত্ররা খুব ক্ষেপে গিয়েছে আতিয়া। মিছিল করবে হরতাল করবে। করবেই তো। বাংলাভাষাই যদি না থাকে তো কিসের দেশ, কিসের স্বাধীনতা।' এবং 'আমার মেয়ের জামাই জালেমের গুলিতে শহীদ হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। এতো একটা ঘটনা না। এতো ইতিহাস, এতো একটা অগ্নিগিরি । আমি বলছি, আমার দেল বলছে – 'ঐ ছেলেকে আমরা মাটির নীচে রাখব না। আমার ছেলেকে হরগিজ কবরে যেতে দেব না।' এ প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি মন্তব্য :

> আন্দোলন কিংবা যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গের কবরে না যাওয়া অথবা যেতে না দেয়া Irwin show এর Bury The Dead, মুনীর চৌধুরীর কবর এবং মমতাজউদদীন আহমদের বিবাহ নাটকে প্রতিবাদ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত নন ; বরং তিনজনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।[২৭]

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিরাজমান সামাজিক বাস্তবতায় *কী চাহ শঙ্খচিল* নাটকে ধৃত বিষয়টি স্বাধীন। মুক্ত বাঙালির সামূহিক সচেতনতায় রীতিমতো এক দ্বিধাকবলিত সংকীর্ণ মনোবৃত্তির প্রকাশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ সেই স্পর্শকাতর, ভীতিকর বিষয়টি নিয়ে নাটক রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'বীরাঙ্গনা' 'বীরশিশু', 'যুদ্ধশিশু' এসব অতিমহৎ অতি মানবিক কিছু নামকরণ, উচ্চারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের ঔদার্য ও মহত্ত্বের চূড়ান্ত প্রদশর্নীর সুযোগ করে দিয়েছে কিন্তু মূল সত্য এই যে তখনও প্রকৃত বাস্তবতাকে গ্রহণ করার মানসিক অবস্থা ছিল প্রমাণিতভাবেই সংকীর্ণ।

'রৌশন আরা' দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র বার দিন পূর্বে – সে অপেক্ষায় ছিল স্বামী ঘরে ফিরে এলে জানাবে আগত সন্তানের সপ্নসংবাদ কিন্তু তা আর জানা হয়নি পাকিস্তানি সেনাকর্তৃক প্রথমত অপহৃতা ও পরে ধর্ষিতা হয়ে পুনরায় সংসারে তার জায়গা হলো। স্বামী বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য 'বীরাঙ্গনাকে' গ্রহণ করেছে সঙ্গে 'যুদ্ধশিশু'কেও। প্রকৃতপক্ষে সন্তান 'লালন' স্বামী আলী নেওয়াজেরই ঔরসজাত কিন্তু আলী নেওয়াজের বিশ্বাস ছিলনা তাতে। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রবকে হত্যা করে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। উদ্ধৃত আখ্যানের ভেতর দিয়ে *'কী চাহ শঙ্খচিল'*নাটকে নাট্যকার সদ্য স্বাধীন একটি জাতির অর্জিত মূল্যচেতনার কাছে বিশুদ্ধ মানবিক অস্তিত্বের জঘন্যতম পরাজয়সূত্র চিহ্নিত করেছেন। একটি শিশুর মানবিক জন্মপরিচয়ের চেয়েও তার রক্তের বর্ণপরিচয় অনেক জরুরি, এই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠার মনুষত্ত্ব হয়ত মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি করতে পারেনি তার জন্য যে চেতনাসংস্কারের প্রয়োজন তা ভয়ঙ্করভাবে প্রমাণিত হয় *কী চাহ শঙ্খচিল* নাটকে। এক্ষেত্রে নাটকের আবেদন :

> যুদ্ধ মহৎ সত্যগুলোকে ধবংসও করে। ঐ ছেলে লালন তো ওদের যুদ্ধোত্তর জীবনে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব। লালন তো যুদ্ধের ক্রোধ। লালন কে ধারণ করা যায় কিন্তু আপন করা যায় না। লালনকে আমরা কেউ চাইনা। এই অবাঞ্ছিত অভিশপ্ত মানব সন্তানের মা হয়ে পরিচিত হবার দুঃসাহস হবে কেন ? প্রথমেই ওরা এই শিশুকে পরিত্যাগ করেনি কেন ? তাহলে তো-তখন স্বাধীনতার উল্লাসে মাঠঘাট মুগ্ধ, মহিমায় আকাশ নন্দিত। কখনো আবেগের তাড়নায় লালনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, কখনো করতালি মুখরিত জনপদের মোহে লালনকে

---

[২৬] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, একুশের নাটক, সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ*, ৪ ফাল্গুন, ১৩৯৫।

[২৭] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, "অকুতোভয় নাট্যজন", নিলুফার বানু সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ নাট্য এবং*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

স্লোগানের জন্য ব্যবহার করছে। লালন রাজনীতি আর অর্থনীতির সফল সমাচার ।[২৮]

স্বাধীনতার ৪২ বছর কেটে গেলেও আমরা 'বীরাঙ্গনা'দের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিতে পারি না। 'যুদ্ধশিশু'কে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতে চাই না। শঙ্খচিলেরা যুদ্ধশিশুকে ব্যবহার করে বিত্তবান হলো, আমরা এর প্রতিবাদ করিনি। সাহিত্যিকরা কলমের মাধ্যমে সেই আর্তি প্রকাশ করেছেন কিন্তু বাস্তবে তা অন্যপথে পরিচালিত হয়েছে তাইতো একজন 'যুদ্ধশিশু'র প্রতিবাদী কণ্ঠ আমাদের চেতনাকে আন্দোলিত করে :

> ১৯৭১ সালে সশস্ত্র পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের পথ চাই। পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর অপরাধের চিহ্নের সংরক্ষণ চাই। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্বে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্বের উল্লেখ চাই।[২৯]

মমতাজউদদীন আহমদের *এই সেই কণ্ঠস্বর* প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এটিও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নাটক। এখানেও আছে দালাল শিরোমণি। তাসাদ্দুক স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ফেলে দেয় তার খান উপাধি। পাকিস্তানি সেনারা রাস্তায় নামতেই কুড়িয়ে নেয় সেটা। পঞ্চম দৃশ্যে শেরওয়ানী জিন্নাহ টুপি পরে তার আবির্ভাব। সঙ্গে ছেলে মোজাম্মেল বাপের মতোই দুর্বৃত্ত। আলী হায়দার একজন শিক্ষক। তাসাদ্দুক, আলী হায়দারকে সতর্ক করে বলেছে – খবরদার জান গেলেও মিলিটারির সামনে প্রফেসর বলবেন না। ... বলবেন আলী হায়দার খান। তাসাদ্দুকের ছেলে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আলী হায়দারের মেয়ে কণাকে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কাজল আর ফেরেনি। তার জন্যে এবং কণার জন্যে আজো অপেক্ষমাণ রাবেয়া। আলী হায়দার জানেন কণাও ফিরবে না কাজলও না। কিন্তু রাবেয়া তা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এই সেই কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায় নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে রাবেয়া। অবশেষে সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পায় রাবেয়া :

> রাবেয়া, তুমি ক্রোধ করো না, কেঁদ না, বেঁচে থাকব বলেই স্বাধীনতা এনেছি। আমাকে কখনো মৃত বলে ঘেষণা করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে নদীতে, অরণ্যে ঘরে উঠানে সব জায়গায় বেঁচে আছি তোমার ভালবাসা ছেড়ে কোথাও যাব না সোনিয়া। তুমি আমার বাংলাদেশ।[৩০]

নাট্যকার স্বাধীনতার চেতনাকে এভাবেই ব্যক্তি থেকে ব্যষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন। মমতাজউদদীন আহমদের হাতে নাট্যরূপ পেয়েছে বাঙালির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাস। 'শোষকের বিরুদ্ধে সমুত্থিত বাঙালির রুখে দাঁড়ানোর এক বিশ্বস্ত নাট্য-দলিল তাঁর *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৯১)।[৩১]

যুদ্ধোত্তর কালে স্বৈরাচার-শাসিত অসহনীয় এক কুৎসিত সময়ের কিছু নষ্ট চরিত্রের সঙ্গে সরল নির্ভীক মানুষের সংগ্রাম আর সাহস আর আত্মত্যাগের ইতিকথা *সাতঘাটের কানাকড়ি* নাটকটি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পর ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১ সময়ে ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। উত্তরকালে ছাত্রসমাজের গৌরবদীপ্ত লুণ্ঠিত হয়েছে স্বার্থবাজ রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের দুষ্ট কবলে পড়ে। জাতীয় রাজনীতির নানা মেরুকরণ, জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব-জটিলতা, জাতীয় রাজনীতির অঙ্গসংগঠকের ভূমিকায় ছাত্ররাজনীতির গভীর বিস্তার, নগদ প্রলোভনের মাধ্যমে ছাত্রদের বৃহৎ একটি অংশকে দলীয় ক্যাডার বাহিনী হিসেবে ব্যবহার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হল দখল

---

[২৮] মমতাজউদদীন আহমদ, "কী চাহ শঙ্খচিল", *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।
[২৯] সাজিদ হোসেন, *একাত্তরের যুদ্ধশিশু* (ঢাকা : সময় প্রকাশনা, ২০০৯) পৃ. ১৬১।
[৩০] মমতাজউদদীন আহমদ, "এই সেই কণ্ঠস্বর", *নির্বাচিত নাট্য সম্ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।
[৩১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫৬।

তথা নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের নামে, সংঘবদ্ধ, খোলামেলা মাস্তানি – এসবই ৭৫ উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মৌলিক ছবি।[৩২] আবার ছাত্রদের পাশাপাশি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একইসাথে বিকশিত হয়েছে শিক্ষক-রাজনীতিও। জাতীয় রাজনীতির বর্ণানুকূল্যে বেড়ে ওঠা সাদা, নীল, গোলাপী দলধারী শিক্ষকসমাজ ছাত্রদের অনুরূপ রূপেই বিভাজিত হয়েছেন, জড়িয়েছেন পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে। নগদ প্রাপ্তির লোভ স্বাধীনতার অহংকৃত অর্জন থেকে, অর্জিত মূল্যমান থেকে, অনেক লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবীকেও টেনে নিয়ে গেছে সামরিক সরকারের উজ্জ্বল ভবনতলে।[৩৩]

নাটকটিতে ৭১-এর সম্ভ্রম হারা দুঃখিনী মায়ের কান্না যেমন আছে, তেমনি সমাজের অতিপরিচিত ঘৃণ্য ও গণধিক্কৃত মানুষগুলিকেও দশর্কদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। মায়ের আহ্বানে জীবিত মৃত সকলেই হাজির হলে মা ঘোষণা করে – 'এইবার, এইবার যুদ্ধ/স্বাধীনতার যুদ্ধ/সর্বক্ষণের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এ ঘোষণা লক্ষ লক্ষ বীরাঙ্গনা মায়ের ঘোষণা যা প্রতীকীভাবে উচ্চারিত হয়েছে এই নাটকে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এই নাটকের বিষয়বস্তু না হলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকের শ্রেণিবিভাগের আওতায় এই নাটকটির স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে এর মূল কারণ হলো যে অভীপ্সা নিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল স্বাধীনতার পর প্রকৃতঅর্থে সেই আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে সমকালীন বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে। এক্ষেত্রে সমালোচক আলী আনোয়ার- এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> যে আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। সে কাহিনী যেমন প্রতারণার তেমনি তিক্ততার। এই প্রতারণা ও প্রতিসারণের জটিল পর্যায়গুলিকে একটি নাটকের কাঠামোর মধ্যে ধরা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কাজটি অনায়াস দক্ষতায় সম্পন্ন করেছেন মমতাজউদদীন আহমদ তাঁর সাতঘাটের কানাকড়িতে। সংবেদনা, ও ব্যঙ্গের, ক্রোধ ও দ্রোহিতার এ অনন্য শিল্পরূপকে দর্শকরা অনেকদিন স্মৃতিতে ধারণ করবেন। দীর্ঘকাল তা তাঁদের চেতনাকে উজ্জীবিত করবে। নাট্যকার ও থিয়েটারকে অভিনন্দন।[৩৪]

মুক্তিযুদ্ধকালে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রচিত নাটকসমূহে স্বাধীনতার উত্তাপে মননের চেয়ে আবেগই বেশি প্রকাশিত। সংগত কারণেই শুধুমাত্র শিল্পের বিচারে এসব নাটক মূল্যায়ন করা যায় না। তবু স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস হয়েই শুধু কিছু রচনা নাটক হিসেবেই আজও অমলিন হয়ে আছে আমাদের স্মৃতিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুধু দেশকেই স্বাধীন করেনি, নাট্যকারদের এনে দিয়েছিল নাটক রচনার অবাধ স্বাধীনতা। নাটক রচনা করতে গিয়ে তাই তাঁদের নাটকের বিষয়-ভাবনায় বারবার উঠে এসেছে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের সেই দুঃসহ, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের চিত্র, উঠে এসেছে যুদ্ধকালীন লুণ্ঠন, অস্ত্রবাজি, ধর্ষণ, যুদ্ধ-পরবর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম, বর্ণচোরাদের ভণ্ডামি, যুদ্ধশিশুদের অনাথ-আশ্রম, বীরাঙ্গনাদের সংসার ত্যাগ ইত্যাদি নানা চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের নাটকে এসব বিষয়-ভাবনার পাশাপাশি প্রকাশ ঘটেছে অন্য সত্তার, যা জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে কঠিনভাবে।

---

[৩২] মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫) পৃ. ১১৫, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯।

[৩৩] সালাহউদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০০২), পৃ. ৪৬।

[৩৪] তদেব, পৃ. ২৭১।

বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চরিত্র

নূর-ই এলিস আকতার জাহান*

Abstract: During the Bangladesh liberation war in 1971, a systematic killing of the intellectuals, rape of religious minority were occurred by Pakistani military and their loyalist paramilitary forces, called the *Razakars*, *Al-Badrs*, *Al-Quds*, *Al-Sams,* etc. were a part of their systematic campaign by raping, murdering and looting the locals. All pro-Pakistani Bangladeshis, who helped Pakistan army and worked against the independence of Bangladesh, also kept numerous Bengali women as sex-slaves inside the Army's camps and Cantonments and they were captured from private homes. In this article the author tries to explore the violence, rape, terror and genocide activities caused by the loyalist paramilitary forces as depicted in Bengali novels.

১.১ ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উপন্যাস ও জীবন পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আধুনিককালের মানুষ স্বাতন্ত্র্যবোধের ও স্বাধীনসত্তার অনুসারী। জীবনকে জীবনের মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করার লক্ষ্যে ঔপন্যাসিককে প্রতিটি অক্ষরে সৃজন করতে হয় বাস্তব ও জীবনের মায়া।[১] যেহেতু দোষগুণের মধ্যে মানুষ তার মূল্যবান জীবনকে পরিস্ফুট করতে চায় তাই একথা বলা যায় যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে সময়, সমাজ ও জীবনের বহুমুখী সত্য সেখানে প্রতিফলিত হতে বাধ্য তাই উপন্যাসের কাছে জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু নেই।[২] উপন্যাস জীবন সম্পর্কে কতকগুলো সাধারণ ধারণা দিয়ে মানুষের সামাজিক, ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক জীবন-প্রণালীর বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বময় চালচিত্র ফুটে উঠে উপন্যাসের মধ্য দিয়েই।[৩] মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিকে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রকাশ ঘটায়। লাখ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস, বীরত্ব, মাতৃভূমির জন্য হৃদয় আলোড়িত করা প্রেম বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় যা বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের, অত্যন্ত অহংকারের। যে

---

* ড. নূর-ই এলিস আকতার জাহান, সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

[১] সরোজ বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮), পৃ. ১৯।

[২] তদেব, পৃ. ৮।

[৩] রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৫৩।

জাতি তার অতীতকে শ্রদ্ধা করতে জানে না, যে জাতি তার স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রজ্বলিত করতে শিখেনি, যে জাতি তার মহান সৈন্যদের আত্মদানকে স্মরণ করতে পারে না – সে জাতি কোনো দিন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগুয়ান হতে পারে না বলে অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ধারাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলা শুরুর পর পরই এ ধারাটি সাহিত্যের সকল মাধ্যমেই স্থান পেতে শুরু করে এবং ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে থাকে। উপন্যাস তাই আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প, যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত; শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ আর তার স্বদেশ-সমাজ-সমকাল-ভবিষ্যৎ।[৪]

১.২ বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম একদিকে যেমন বাঙালির সর্বাপেক্ষা শোকবহুল সংগ্রাম অন্যদিকে বাঙালির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু এ গৌরব অর্জন করতে বাঙালি জাতিকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। একাত্তরের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি পাক হানাদার বাহিনী গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায় তার তাণ্ডব খুব দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল। আর এই হত্যাযজ্ঞের সক্রিয় সহায়তার জন্য পাক হানাদার বাহিনী এদেশীয় উগ্রপন্থী ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলিকে দোসর করে নেয়। সে সব দল রাজাকার, আলবদর ও আল শাম্‌স নামে পরিচিত। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ,গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকা থেকে যে অপারেশন শুরু করেছিল তার তাণ্ডব দ্রুতই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সারাদেশে, এমনকি গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এর বীভৎসতার নগ্নরূপ কার্যকর করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের যেসব রাজনৈতিক সংগঠন সচেতনভাবে এ ব্যাপারে পাকিস্তানিদের সহায়তা করে তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রসংঘ, মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি. প্রভৃতি দল ও তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজাকার, আলবদর এবং শান্তিকমিটি ছিল অন্যতম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর, রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড একাধারে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও দালালরা যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর আচরণের পাশাপাশি এদেশীয় দালালদের যে ভূমিকা ছিল তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন ঔপন্যাসিকগণ তাদের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। যেমন, এ সময়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস (ঔপন্যাসিকের নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে) হলো আনোয়ার পাশার 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' (১৯৭৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'দেয়াল' (১৯৮৬), আবুবকর সিদ্দিকের 'একাত্তরের হৃদয়ভস্ম ' (১৯৯৭), ইমদাদুল হক মিলনের 'মহাযুদ্ধ', 'কালোঘোড়া', মিরজা আব্দুল হাই এর 'ফিরে চলো' (১৯৮১), রশীদ করীমের 'আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩), রশীদ হায়দারের 'খাঁচায়' (১৯৭৫), 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮০), রাবেয়া খাতুনের 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪), রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), বশীর আল হেলালের 'কালো ইলিশ'

---

[৪] বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের উপন্যাস", *সাহিত্য পত্রিকা*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১।

(১৯৭৯), শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩), 'জলাংগী' (১৯৭৪), শওকত আলীর 'যাত্রা'(১৯৮৫), শামসুর রহমানের 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১৯৮৫), সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' (১৯৮১), 'নিষিদ্ধ লোবান', (১৯৮১), হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১', 'আগুনের পরশমণি', হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তমা' (১৯৮২) প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণিস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক, মজুর মুটে সবার উপস্থিতি রয়েছে। চরিত্রগুলো শহরকেন্দ্রিক কিংবা গ্রাম কেন্দ্রিক যেটাই হোক না কেন সবার মধ্যে মুক্তি সংগ্রামের জাগ্রত রূপ লক্ষ করা যায়। আবার এমন কিছু চরিত্র আছে যারা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে বাঙালি হয়েও বাঙালি নিধনের মত জঘন্য অপরাধ করেছে। এরা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়ে নিজেদের নাম লিখেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর যে অত্যাচারী নিকৃষ্ট রূপ তা উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এদেশীয় রাজাকার, দালাল ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও শ্রেণি অনুযায়ী তাদের বিভিন্নমুখী অবস্থান লক্ষ করা যায়।

১.৩ উপন্যাসে রাজাকার, দালাল চরিত্র

যুগে যুগে বাঙালির মধ্যে যেমন বীর সন্তানের জন্ম হয়েছে তেমনি জন্ম হয়েছে মীরজাফরের মতো বেশ কিছু নিকৃষ্ট ব্যক্তির। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সময় এদেশে যেমন দালালদের অভাব ছিল না। ঠিক তেমন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশে অনেক মানুষ নিজেদের সুবিধার কারণে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

'রাইফেল, রোটি, আওরাত' (১৯৭৩) উপন্যাসের মি. মালেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। কবিতা লিখেন, প্রচুর আড্ডা জমাতে পারেন, বিস্তর মিথ্যা বলা তার অভ্যাস। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে চব্বিশ বছরের গ্লানিমাখা সময়টিতে এদেশীয় দালাল বুদ্ধিজীবীরা যে কেমন স্বার্থান্বেষী ছিল তা মি. মালেক চরিত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[৫] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ সকলকেই খুশি করা যায় এমন বিষয় ছিল কমিউনিস্ট বিরোধিতা। তাই মালেক সাহেব কমিউনিস্টদের গাল দিয়ে কবিতা লিখতেন। এ সুবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যখন মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো তখন পূর্ব-বাংলাকে নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করলেন মালেক সাহেব। একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে গান লেখেন। কিন্তু আইয়ুব খান যখন মার্শাল 'ল জারি করলেন তখন কবিতা লেখার জন্য তার অনুশোচনার শেষ ছিল না। নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলেন, দাড়ি গোঁফ রেখে নিজের রূপ-চেহারা পাল্টে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন। আইয়ুব খানের গুণকীর্তনে মেতে ওঠেন মালেক সাহেব। আইয়ুব খানের পছন্দের তালিকায় ছিল চরিত্রহীন, শয়তান, বদমায়েশ কিন্তু অতি ধুরন্ধর ও বুদ্ধিমান লোক। মালেক সাহেব আইয়ুব খানের সেই তালিকাতেই পড়েছিলেন। নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে পাকিস্তান সরকারের চাটুকারিতা করেছেন সবসময়। আইয়ুব খান বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালু করার নির্দেশ দিলে মালেক সাহেব আইয়ুব খানকে পরামর্শ দিয়েছেন:

> হুজুর, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কিছু চালাকির আশ্রয় নিতে হবে। প্রথমেই উর্দুর কথা বললে দেশে হট্টগোল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে। ... প্রথমেই ওদেরকে বাংলা ভাষা ভুলিয়ে দিতে হবে।

---

[৫] আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১৬৪।

তারপর একটু একটু করে দিতে হবে উর্দু।[৬]

এভাবেই মালেক সাহেব চাটুকারিতা করে আইয়ুব খানের আমলে উন্নতির মই বেয়ে উপরে ওঠেন। কিন্তু আবার যখন ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতন ঘটে তখন মি. মালেক নিজের চরিত্রকে পাল্টে ফেলেন:

> রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গদগদ কণ্ঠে বক্তৃতা করে প্রচার করেছেন- রবীন্দ্রনাথ আমাদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছাত্রদের এক সাংস্কৃতিক সভায় বলেছেন, দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও দেশের ভাষাই হচ্ছে জাতি-গঠনের মৌল উপাদান, জাতীয় সত্তার কোন অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধর্মের কোন স্থান থাকতেই পারে না। একদা প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান থেকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন। এবার তিনি বই লিখে তা জীবনানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। নজরুল ইসলাম হাজার হলেও গান লিখে মুসলমানিত্ব জাহির করেছেন, অতএব কঠোর ভাষায় তাঁর সমালোচনা করে সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। যে গোঁফ খুর দিয়ে চাঁছা শুরু করেছিলেন এবার আবার তাকে কিছুটা বাড়তে দিলেন কিন্তু এতো সব করেও হালে পানি পাচ্ছেন না দেখে আওয়ামী লীগ রিলিফ ফান্ডে এক হাজার টাকা চাঁদা দিলেন।[৭]

এতসব তিনি করেছেন ভাইস-চ্যান্সেলর পদ পাওয়ার আশায়। ছোট ভাই খালেকের সঙ্গে আলোচনার সময় বলেছেন, 'এখন থেকে পাকিস্তান, মুসলমান প্রভৃতি বুলি ভুলে গিয়ে বাংলা ও বাঙালির কথা বলতে হবে। নইলে আমাদের গোলামী ও দুর্গতি রোধ করা যাবে না।'[৮] পাকিস্তানের অনেক গোলামি করেছেন মি. মালেক কিন্তু শেষপর্যন্ত পাকিস্তানি জালিমদের হাত থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে শেষ রক্ষা করতে পারেননি। মি. মালেক হয়তো তার চরিত্রের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না কিংবা আপন স্বার্থে এতটা মশগুল থেকেছেন যে নিয়তির বিধান সম্পর্কে কখনো চিন্তাও করেননি। পাকিস্তানি দালালরূপে যার উন্মেষ, সেই মালেক সাহেব শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হলেন। ২৫শে মার্চ মালেক সাহেবের স্ত্রী ও দুই কন্যাকে মিলিটারিরা উঠিয়ে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে আর মি. মালেক ও তার পাঁচ বছরের ছোট ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। মালেক সাহেব সারাজীবন পাকিস্তান সরকারের গোলামি করেছেন, মৃত্যুর পূর্বেও নিজেকে খাঁটি মুসলমান ও তাদের সাগরেদ বলে পরিচয় দিয়েছেন তবুও শেষ রক্ষা হয়নি তার জীবনের।[৯] মি. মালেকের ছোট ভাই ড. খালেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হলের প্রভোস্ট। ব্যবসা ও রোটারী ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ড. খালেক সম্পর্কে সুদীপ্ত শাহিনের মন্তব্য:

> ড. খালেক আধুনিক পাকিস্তানি মুসলমান। সে জন্য কথায় কথায় ভারত -বিদ্বেষ প্রচার করে থাকেন। কখনো নামাজ রোজা করেন না তার বিনিময়ে হিন্দুদের মালাউন বলেন। এবং একাধিক রমণী-সংসর্গকে জায়েজ বিবেচনা করেন। এমনিতে লোকের সাথে মেশেন কম। কিন্তু মেয়েদের সাথে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও গল্প করতে পারেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে ক্ষেত্রে তিনি পরম অসাম্প্রদায়িক। মেয়েদের জাতি ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন কখনো তার মনে জাগে না। এবং কেবলি যে মেয়েদের সাথে তিনি গল্পই করেন এমন নয়। সেই সঙ্গে কুমারীত্ব মোচনের পটুত্বের

---

[৬] আনোয়ার পাশা, *রাইফেল, রোটি, আওরাত* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৭৩), পৃ. ১৫।

[৭] তদেব, পৃ. ১৬।

[৮] তদেব, পৃ. ১৭।

[৯] শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ১৩।

নাহি তার সীমা।[১০]

ড. খালেকের মতে, নবীরাও একাধিক নারী সম্ভোগ করেছেন। সে যুগে একাধিক বিবাহ রীতি ছিল আর এখন একাধিক নারীর সাথে গোপন প্রেম জায়েজ। তিনি মেয়েদের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ঠিকই কিন্তু ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব যখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব সন্তানকে তার আশ্রয়ে নিজের সন্তানের মত করে রাখেন তখন সেটাকে ধর্মের জগাখিচুড়ি বলে চালিয়ে দেন। ড. খালেকের ভাষায়:

> ঐ সবই হচ্ছে হিন্দুস্থানী চালবাজি। হিন্দু বা মুসলমানের ভেদাভেদটাই যদি না থাকল তা হলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের ভেদাভেদটাই বা থাকল কোনখানে? অতএব হিন্দু বা মুসলমানের ভেদাভেদ যারা মানবেন না তাঁরা পাকিস্তানি আদর্শের বিরোধী। পাকিস্তানের শত্রু তারা।[১১]

পাকিস্তান ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ড. খালেকের তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত করে রাখতে চান পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে। ড. খালেকের মতে, 'ইসলামের স্বার্থে, পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে দরকার হলে আমাদের সেনাবাহিনী একশো বছর পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখবে, দেশে সামরিক শাসন চালাবে। ইসলাম ও পাকিস্তানের স্বার্থে তা হবে বিলকুল জায়েজ।'[১২] ড. খালেকের কাছে নিজের সহোদর ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী সন্তানের চেয়ে পাকিস্তান ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বড়। তাই তার ভাই মালেককে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করলে এবং ভাবী ও ভাইয়ের মেয়েদের আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তিনদিন পর ফেরত পাঠালে খালেকের কাছে সে ঘটনা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ড. খালেক বলেন:

> যে কোনো দেশের সৈনিকদের তুলনায় আমাদের পাকিস্তানি সৈন্যদের নীতিবোধ অনেক উন্নত। ঐ একটা কাজ তারা বাইচান্স করে ফেরেছে। তাও দেখুন না, ঐ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আমার কাছে চিঠি দিয়েছে ওরা। এবং ক্ষমা চেয়েছে।[১৩]

ড. খালেকের ধারণা রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটেই থাকে। তবে পাকসেনারা কর্তব্যপরায়ণ তাই তার ভাবী ও ভাইয়ের মেয়েদের ফেরত পাঠানোর সময় কিছু টাকাও দিয়েছে। ড. খালেক, সুদীপ্তর সামনে বলেছেন, 'আর্মির জেনারসিটি দেখুন, মেয়েদের ফেরৎ পাঠাবার সময় চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকাও দিয়েছে। দে আর কোয়াইট সেন্সিবল ফেলো।'[১৪] মি. মালেক ও ড. খালেক দুই ভাই অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন আর তা কেবল নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যই। বর্ণচোরা আচরণ, স্বার্থসিদ্ধির তৎপরতা এবং সময় বুঝে নিরাপদ স্থান বেছে নিতে এরা তটস্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. মালেক, ড. খালেক ছাড়াও তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ওসমান গণিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দালালী করেছেন। গভর্নর মোনায়েম খানকে তোষামোদ করে ভাইস চ্যান্সেলর পদটি পেয়েছিলেন ওসমান গণি। সে কারণে অতি প্রতাপের সাথে ভাইস চ্যান্সেলরগিরি করেছেন। মোনায়েম খান, ভাইস চ্যান্সেলর ওসমান গণি সম্পর্কে বলেছেন,

> এই যে আপনারা ওসমান গনি সাবরে দেখতেছেন, আমি হ্যারে ভাইচ চ্যাঞ্চেলর বানাইলাম। হেইডা ল্যাখা পড়ায় বালো ছাওয়াল আছিল। আমি তার মতো পি-এইচ ডি, এম এইচ ডি কিছুই করবার পারি নাই। কিন্তু আল্লাহ আমারে গভর্ণর কইরা চ্যাঞ্চেলর বানাইয়া দিল। আর

---

[১০] আনোয়ার পাশা, পৃ. ২০-২১।
[১১] তদেব, পৃ. ২৬।
[১২] তদেব, পৃ. ১৮।
[১৩] তদেব, পৃ. ১৯-২০।
[১৪] তদেব, পৃ. ২০।

ওইটা আমার অধীনে ভাইস চ্যাঞ্চেলর হইল।[১৫]

এ উপন্যাসের আর একজন রাজাকার অধ্যাপক গোলাম কবির। নেজামে ইসলামের নেতা। কোন এক আলিয়া মাদ্রাসায় তিন বছর তালবিলিম পড়িয়েছেন তাই মৌলভি গোলাম কবীর নিজেই নামের আগে অধ্যাপক লেখেন। বাঙালি ও ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে তার ধারণা বাঙালি মুসলমানরা সব ধীরে ধীরে হিন্দু হয়ে যাবে। তবে তার মতে, 'যেখানে সবটাই ধ্বংস হয়ে যেত সেখানে কায়েদে আজম তবু অর্ধেকটা বাঁচিয়েছেন।'[১৬]

পাকিস্তানিদের হয়ে এদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী যেমন দালালি করেছে তেমনি কিছু রাজনৈতিক নেতারাও দালালী করেছে। ফিরোজের চাচা গাজী মাসউদ-উর রহমান জামাতে ইসলামের সমর্থক। নামাজ কালাম, মুখভরা, দাড়ি দেখলেই ভক্তি হয়। রাজারবাগ পুলিশের তিনজন পুলিশ আর্মির সাথে যুদ্ধ করে পালিয়ে গাজী সাহেবের বাসায় আশ্রয় নিলে পরম সমাদর করে তাদের আশ্রয় দেয়। গাড়ির গ্যারেজে তাদের আশ্রয় দিলে পুলিশ তিনজন সেটাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু মাসউদ-উর রহমান পরম সমাদর করে রেখে পরে পুলিশ তিনজনকে পাঞ্জাবি সৈনিকদের ডেকে এনে তাদের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তিনজনকে পাকসেনার হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাজী সাহেব ফিরোজের কাছে বলে:

> একটা দায় চুকল। উহ! কী যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম বাবা! ...তোমরা হয়ত ভাবছ, আমি বেঈমানী করলাম। আশ্রিতকে রক্ষা করা আশ্রয়দাতার কর্তব্য। হাঁ বাবা, আমি সে কথা একশো বার মানি। আশ্রিত যদি আমার নিজের জীবনের শত্রু হ'ত আমি তাকে জীবনের বিনিময়ে হ'লেও রক্ষা করতাম। কিন্তু এই পাক-ওয়া-তানের সাথে বেঈমানী কিছুতেই আমরা সইবোনা।[১৭]

পাকবাহিনী কর্তৃক বাঙালি হত্যাকে মাসউদ-উর রহমান ন্যায়সঙ্গত মনে করে। তার মতে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা মারা গেছে তারা দেশের দুশমন, তারা কাফের। সামরিক কর্তৃপক্ষ মাসউদ-উর রহমানকে চিঠি পাঠায় তার ভাই এর ছেলে ফিরোজকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ফিরোজ কথা শুনতে না চাইলে তাকে ভয় প্রদর্শন করে জোরপূর্বক তুলে নেয়ার কথাও লিখা হয় চিঠিতে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চিঠিটা গিয়ে ফিরোজের হাতেই পড়ে। তাই চাচার বাসায় আশ্রয়ের জন্য আসলেও শেষ পর্যন্ত ফিরোজের আর চাচার বাসায় থাকা সম্ভব হয়নি। চলে যাওয়ার সময় ফিরোজ চিঠিটা চাচাকে ছুড়ে দিলে চাচা মাসউদ-উর রহমান সেটা পড়ে। গাজী সাহেব যখন চিঠি পড়ে তখন ফিরোজ তার নাগালের বাইরে তাই তার আফসোসের শেষ নাই। সে মনে মনে আফসোস করে:

> একটা জাহেলকে ছেড়ে দিলেন তিনি? হায় হায়! মিলিটারি তো এসেই ছিল বাড়িতে। এক সঙ্গে দুই কাজ হয়ে যেত। লাভের মধ্যে গাড়িখানা মাঙ্না পেয়ে যেতেন। কিন্তু এখন যে পস্তানোই সার। এক কাজ করা যায়... কিন্তু ছাই ফোনও তো অচল। সচল থাকলেই বা হত কি? গাড়ির নম্বর জানা আছে? ওই দেখো, গাড়ির নম্বরটাও নেওয়া হয়নি। যা; সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশীয় রাজাকার, দালালরা ইসলামের নাম ভাঙিয়ে, খোদাভীতি দেখিয়ে অনেক কাজ করেছে। পাকিস্তানিদের কাজকে সঠিক জেনে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল কিছু ব্যক্তি

---

[১৫] তদেব, পৃ. ১৩৩।
[১৬] তদেব, পৃ. ৯৬।
[১৭] তদেব, পৃ. ১৫২।
[১৮] তদেব, পৃ. ১৫৭।

ফতোয়াবাজি করেছে।[১৯] এরকম স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ সোবহান মৌলভির চরিত্রে পাওয়া যায়। করিমন বিবির ছেলে যুদ্ধে যেয়ে মারা গেলে সোবহান মৌলভি তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'এ তো যেমন তেমন লড়াই না। এ হল জেহাদ। হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের জেহাদ। সেই জেহাদে মারা গেছে তোর ছাওয়াল।'[২০] এই সোবহান মৌলভি যখন করিমন বিবিকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়ে সম্ভ্রম নষ্ট করে তখন করিমন বিবিকে বলে, 'এ কামে ছওয়াব আছে তা জানিস। এক এক বারের কামে এক একটা কাফের কতলের ছওয়াব হয়।'[২১] গাজী মাস-উর রহমান, সোবহান মৌলভির মত সাবির চৌধুরীও একজন সুবিধাবাদী ব্যক্তি। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সাবির চৌধুরীর পূর্বনাম ছিল ছাবের আলী। বিএ ফেল করে প্রথম দিকে কেরানি ছিল। একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ফিরোজের বাসার পাশে বাসা হওয়াতে গর্ববোধ করতো, কিন্তু মোনায়েম খান গভর্নর হওয়ার পর আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে বি.ডি মেম্বার ওয়ার্কস প্রোগ্রামে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। ছাবের আলী পরে হয়েছে সাবির চৌধুরী। আইয়ুব খানের পতনে সত্যিই যাদের চোখে জল এসেছিল তাদেরই একজন সাবির চৌধুরী। সামরিক শাসনের আমলে রাতারাতি এমন সাবির চৌধুরী বনে যাওয়া অনেক চরিত্রই নজরে পড়ে।[২২] শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩) উপন্যাসের মখ্দুম মৃধা একজন প্রবীণ ব্যক্তি। বয়স ষাট বাষট্টি হবে। মুখে সাদা ঝোপ দাড়ি। হজ্ব করেছে, মাথায় জালি কিস্তি টুপি পরে। আইয়ুব খানের সময়ে মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান এবং প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক হয়েছিল। সুবিধাবাদী মনোভাব তার চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক। পুরাতন মুসলিম লীগার মখ্দুম মৃধা যখন উপলব্ধি করে আওয়ামী লীগ দেশে জাতীয়তার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তখন গোপনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের টাকা পয়সা চাঁদা দিয়ে সাহায্য করে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে সে রাজি হয়নি আবার নিজের বয়সের দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগের দাওয়াতও প্রত্যাখান করেছে। অতি সাবধানী ব্যক্তি মখ্দুম মৃধা। তার আসল পরিচয় জানা খুব কঠিন ব্যাপার, তাই:

> সত্তর সনের নির্বাচনের সময় সে কোন বাক্সে ভোট দিয়েছিল, জানা যায় না তবে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ মেজরিটি পাওয়ার পর সে স্থান বুঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। হ্যাঁ, মুজিব একজন বাপের ব্যাটা, এবার মিলিটারিদের দেখিয়ে দিলে বটে! কিন্তু গ্রামে রাত্রে আসত তার চর-অনুচর মোসাহেব বা ঐ জাতীয় কিছু। তাদের গলা খাটো করে বলত, 'বসো, মিয়া। দ্যাহো কোথাকার পানি কোথা যায়। অহন চুপচাপ থাকন-থাকান বালা। উপরে আল্লা আলেমুল গায়েব। তিনিই সব কাঠি নাড়েন. তোমার-আমার বুঝবার সাধ্যি নাই'।[২৩]

১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে অত্যন্ত হিসেবী ব্যক্তি মখ্দুম মৃধা সাতাশে মার্চ গ্রামবাসীকে ডেকে বলেছে, 'পাকিস্তান-রক্ষা করবেন। তাই তিনি ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এই মিলিটারিরা সাধারণ সিপাই নয়। ওরা আল্লার ফেরেশতা।'[২৪] পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্পর্কে তার মনের মধ্যে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিল। তাই পাকসেনারা গ্রামে প্রবেশ করে তার সাথে দেখা করতে এলে সে উল্লসিত হয়ে যায়। আবেগপ্রবণ হয়ে বলে, 'আল্লাতালা ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে সৈন্যবেশে যে ফেরেশতাদের

---

[১৯] আমিনুর রহমান সুলতান, পৃ. ১৬৭।
[২৩] আনোয়ার পাশা, পৃ. ১৮৭।
[২৪] তদেব, পৃ. ৮৮।
[২৫] শহীদ ইকবাল, পৃ. ১৩৩।
[২৬] শওকত ওসমান, *উপন্যাস সমগ্র*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ২৬৯।
[২৭] তদেব, পৃ. ২৭১।

পাঠিয়েছেন, মর্তবাসীর সঙ্গে হঠাৎ তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া ত এক পরম নসিবের ব্যাপার।'[২৫] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এককাপ চা না খাওয়ালে খোদার কাছে দায়ী থাকবে বলে মৃধা সাহেবের ধারণা। তাই তার কলেজ পড়ুয়া দুই মেয়েকে অতি যত্নের সাথে নাস্তার ব্যবস্থা করতে বলে। নাস্তা খেয়ে পাকসেনারা প্রশংসা করলে তাদের রাতের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। পাকসেনারা রাজী হলে মখ্দুম মৃধা মুরগী বিরিয়ানী খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। মৃধা পাকসেনাদের আপ্যায়নের জন্য এতটাই উতলা ছিল যে এত উতলা আর কখনো হয়েছে বলে কেউ বলতে পারবে না। বাঙালি যত তোষামোদী করুক আর যতই পাকসেনাদের আপ্যায়ন করুক না কেন, সুযোগ বুঝে পাকসেনা যে আঘাত হানবেই তার প্রমাণ মেলে 'দুই সৈনিক' উপন্যাসে। মৃধার দুই মেয়েকে যখন মদ-মত্ত মাতাল পাঞ্জাবি অফিসার বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন মৃধার মানসিক অবস্থার চরম বির্পযয় ঘটে। সে কোনভাবেই তার মেয়ের সাথে বিয়েতে রাজি হয়না। তাতে অফিসাররা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আওয়ামী লীগার বলে বেঁধে ফেলে এবং বাড়ি-ঘর লুট করে। তার দুই কন্যাকে জোর করে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যায়। 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের মখ্দুম মৃধাকে শেষ পরিণতি হিসেবে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃধার এ চরম পরিণতি তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী বাঙালির দালালির অভিনবরূপ পরিলেপন করেছে।[২৬] 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের একই গ্রামের মক্তবের মৌলবী সয়ীদ মাতব্বর। বয়স ষাটের মতো। কৃশ চেহারা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরহেজগার ব্যক্তি বলে মনে হয়। সে মুসলিম লীগের অন্ধভক্ত। সয়ীদ মাতব্বরের ধারণা 'দ্যাশে ইসলামি আর কিছু থাইকব না, এই আওয়ামী লীগ যদি শাসন চালায়।[২৭] গ্রামের মিলিটারি এলে মৃধার বাড়িতে স্ত্রীসহ এসে মিলিটারি আপ্যায়নে সহায়তা করে সয়ীদ মাতব্বর। সে সব সময় সতর্ক থেকেছে অফিসারদের সাথে যেন কোন ভুল আচরণ না হয়ে যায়। পাকসেনা যখন মখ্দুম মৃধার সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দেয় তখন স্ত্রীকে না নিয়েই পালিয়ে যায় সয়ীদ মাতব্বর। পরের দিন হারানো চটি জুতার খোঁজ করতে এসে যখন দেখে কাঁঠাল গাছের ডালে মৃত অবস্থায় মখ্দুম মৃধা ঝুলছে। তখন মানবিকতাবর্জিত মাতব্বর মৃধার পকেট থেকে পাওয়া অনেকগুলো দশ টাকার নোট নিয়ে পালিয়ে যায়। সয়ীদ মাতব্বরদের মতে মানুষের ঝুলন্ত মৃতদেহের প্রতি কর্তব্য করার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন সামান্য কিছু টাকা।

'জলাংগী' (১৯৭৬) উপন্যাসের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোসাহেব আলী। পাকিস্তানের বিরোধিতা করার কারণে গ্রামে যেন কোন গোলযোগ না ঘটে সেজন্য শান্তি কমিটি গঠন করে। মোসাহেবের মতে:

> পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ভারতের হিন্দুগণ এবং নামে মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের একদল দালাল। পবিত্র ইসলামের যে অপূর্ব বিকাশ পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাবে যদি পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যায় ... অতএব... ইত্যাদি।[২৮]

মোসাহেব আলীর নেতৃত্বে গঠিত শান্তি কমিটির সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ পেলেই খবর দিত পাকিস্তানি সৈনিকদের। তারাই মুক্তিযোদ্ধা জামিরালিকে পাকসেনার হাতে তুলে দেয়। মোসাহেব আলীর মতো মানুষের কারণেই জামিরালির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪) উপন্যাসের করিম সাহেবের বড় ছেলে খালেদ সরকারি অফিসার।

---

[২৮] তদেব, পৃ. ২৮৩।

[২৯] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ১৯৯৫), পৃ. ১৭৩।

[৩০] শওকত ওসমান, *উপন্যাস সমগ্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

[৩১] শওকত ওসমান, *উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৯২।

পাকিস্তানিদের তোষামোদ করে চলা তার স্বভাব। সাতাশে মার্চ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার খুশি হয়ে তার প্রমোশন দিয়েছে। ছোট ভাই আশেক ও আবেদ সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে দেশের জন্য কাজ করায় তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সময়। বোনের জামাই রকীব, ছোট ভাই আশেক, আবেদের দেশপ্রেম তার কাছে মঙ্গলময় মনে হয়নি। তাই খালেদ সাহেব রকীবকে বলেছে:

> বলি তোমরা সব দল বেধে স্বদেশী হলে নাকি। আবেদ তো বখাটে আগে থেকেই। পঁচিশের রাতে চলে গিয়ে ভুতটা দেখি তুলে দিয়ে গেছে তোমার আর আশেকের ঘাড়ে। অঘটন ছাড়া কি লাভটা হচ্ছে শুনি এই দেশ প্রেমে? [২৯]

মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে খালেদের ধারণা অত্যন্ত নিচুমানের। তাই রকীবকে সে বলেছে, 'বোঝ তো সো কল্ড মুক্তিফৌজদের একেবারে পছন্দ করে না আমাদের সরকার।'[৩০] পাকিস্তানের ধামাধরা খালেদ সাহেবকে চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছিল। তার স্ত্রীকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গেলে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে স্ত্রীকে। পাকিস্তানি বন্ধুর কাছে হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েও কোন সাহায্য পায়নি খালেদ সাহেব। তার স্ত্রীকে পাকসেনারা বেইজ্জত করে ফেরত পাঠায়। আর সে লজ্জা, অপমান সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী বকুল আত্মহত্যা করেছে। প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুতে খালেদ প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের তোষামোদী করার খেসারত। 'ফেরারী সূর্য' উপন্যাসে খালেদ সাহেবের স্বভাব ও পরিণতির সাথে 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' উপন্যাসের মালেক সাহেব ও 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের মখ্দুম মৃধার স্বভাবের ও পরিণতির মিল পাওয়া যায়।

'ফেরারী সূর্য' উপন্যাসের বাকের খান একজন পাকিস্তানি দালাল। রাশার দূর-সম্পর্কের চাচা। বাকের খান সম্পর্কে উপন্যাসের নায়ক আশেকের বক্তব্য:

> ভদ্রলোক মানুষ বেশি নেক্ড়ে। ... কখন আড়াল থেকে ঘাড়ে পড়ে রক্ত চুষতে চাইবে টের পাবার উপায় নেই। ওরা হানাদারের দালাল। ... ব্যক্তি স্বার্থ, টাকার লোভ, ক্ষমতার চাকচিক্য মানুষকে কোথায় নামায় ভদ্রলোক তার জ্যান্ত প্রমাণ।[৩১]

বাকের খান কৌশলে রাশার কাছে জানতে চায় রাশার ভাই মুক্তিযোদ্ধা কিনা। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার ধারণা এ যুদ্ধ আসলে যুদ্ধই না। সেয়ানে সেয়ানে ছাড়া যুদ্ধ হয় না। পাকিস্তানি আর্মি সম্পর্কে তার অতি উচ্চ ধারণা। তার মতে, 'কোথায় ওয়ার্ল্ড ফেমাস পাকিস্তান আর্মি আর কোথায় নাক টিপলে দুধ গড়ানো কটা অনট্রেইন্ড পুচকে ছোঁড়া।'[৩২] বাকের খান, পাঞ্জাবি অফিসার ক্যাপ্টেন ফারুককে খুশি রাখতে চায় তাই সে রাশার বাড়িতে নিয়ে আসে অফিসারকে আমোদ-প্রমোদের জন্য। যদিও শেষ পর্যন্ত বাকের খানের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। পাঞ্জাবি অফিসারসহ বাকের খান মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

'আগুনের পরশমণি' (১৯৮৬) উপন্যাসের নায়ক আলমের মামা শরীফ সাহেব। ছোট খাট মানুষ। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়। মাথায় চুল সব পেকে গেছে, মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আলম তার মা-বোনের খোঁজ নেওয়ার জন্য মামার বাসায় গিয়েছিল। শরীফ সাহেব তার ভাগনে আলমের যুদ্ধে যাওয়াটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তার মতে, মানুষের প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজের পরিবারের প্রতি। তাছাড়া শরীফ সাহেবের ধারণা আলমের মতো

---

[৩২] রাবেয়া খাতুন, *মুক্তিযুদ্ধের সাতটি উপন্যাস* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৪), পৃ. ২৫৭।

[৩৩] তদেব, পৃ. ২৫৮।

[৩৪] তদেব, পৃ. ২৬১।

[৩৫] তদেব, পৃ. ২৬২।

কিছু যুবক যুদ্ধ করলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে না। তাই তিনি আলমকে বলেছেন, 'তোর মত কয়েকজন চেংড়া ছোড়া দু-একটা গুলিটুলি করবে, আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?[৩৩] সুলেমান মিয়ার সহায়তায় পাকবাহিনী বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালায়। সে পাকবাহিনীদের বাড়িতে রেখে আদর আপ্যায়ন করে। এছাড়াও শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমুদ্দিনের নাম পাওয়া যায়। হাশিমুদ্দিন খুব ফলাও করে রেডিওতে বিবৃতি দেয়:

> ছাত্রছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষা বছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।[৩৪]

'কালো ঘোড়া' (১৯৮৩) উপন্যাসের সিরাজ চেয়ারম্যান শান্তি কমিটির সদস্য। মাঝে মাঝেই সে শহরে গিয়ে মিলিটারিদের সাথে দেখা করে আসে। গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আসলে মিলিটারিদের খবর দিতে হবে এই সচেতনতা তার মধ্যে সব সময় কাজ করে। নানা অপকর্মের সাথে জড়িত সিরাজ চেয়ারম্যান কিশোরী টুনটুনিকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করে। অত্যন্ত হীন চরিত্রের এই সিরাজ চেয়ারম্যান রতন লালের মেয়ে কালিকে বলাৎকার করে। কালি সে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। নয়না নামের কিশোর ছেলেটি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে এ খবর চেয়ারম্যান পেলে তাকে বাড়িতে এনে অমানুষিক অত্যাচার চালায়:

> দীর্ঘক্ষণ লাঠি চালিয়ে চেয়ারম্যান সাব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ... গ্যান ফিরুক নমোর পুতের। তার বাদে আবার পিডামু। পেডেত থনে কথা ক্যামনে বাইর করতে অয় জানা আছে আমার।[৩৫]

এভাবে অত্যাচার করে নয়নাকে মেরে ফেলে। স্ত্রী টুনটুনি তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বললে স্ত্রীকে মারধর করে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকার ও দালালরা না থাকলে বাঙালিদের অবস্থা এতটা শোচনীয় হতো না। পাকিস্তানিরা যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞে নেমেছিল তার নিশানা চিহ্নিতকরণে এদেশের রাজাকাররা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ধর্মের নাম ভাঙিয়ে বাঙালি কর্তৃক বাঙালি নিধনের ঘটনা একমাত্র পশু প্রকৃতির মানুষের দ্বারাই সম্ভব।

১.৪ রাজাকার, দালালদের সহায়ক চরিত্র

১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর সহায়তা করার জন্য রাজাকারদের যেমন ভূমিকা ছিল, তেমনি রাজাকারদের কিছু সহায়ক ব্যক্তিও ছিল। তারা যেমন বাঙালি ছিল আবার অবাঙালিও ছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুরের জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমান। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ অনেক আলেমই হয়ত পাকিস্তানের প্রতি মোহগ্রস্ত কিন্তু পাকিস্তানিরা এই বাঙালি আলেমদের সেদিন মুসলমানতো নয়ই, মানুষও মনে করেনি। মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের সেদিনের বাঙালি ইমাম লোকমান আহমেদ বলেন:

> ১৯৭১-এর ১৫ই জুন বাদ ঈশা তৎকালীন মসজিদ কমিটির তরফ থেকে মসজিদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির চরমপত্র পেলাম। পত্রবাহক বললেন: সত্তর জন অবাঙালীর দস্তখত সম্বলিত একটি দরখাস্ত মসজিদ কমিটির সেক্রেটারির নিকট পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,

---

[৩৬] হুমায়ূন আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র*, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ২১০।

[৩৭] তদেব, পৃ. ২১৭।

[৩৮] ইমদাদুল হক মিলন, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০০), পৃ. ৯৩।

বাঙালি ইমামের পিছনে নামায পড়তে তারা নারাজ।[৩৯]

রাজাকার, দালালদের সহায়ক ভূমিকায় এই অবাঙালি বিহারীরা বাঙালি মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' উপন্যাসের হাসমত খাঁ একজন বিহারী লোক। একটা অফিসে দিনে পিওনের চাকুরি করতো আর রাতে নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায় দারোয়ানি। চাকুরি ছেড়ে পরে ব্যবসা শুরু করে। সে ফিরোজের চাচা গাজী মাসউদ-উর রহমানের কাছে একটা চিঠি দিতে এসেছিল, চিঠিটা পাঠিয়েছিল মুসলীম লীগের এক নেতা। 'রাইফেল,রোটি, আওরাত' উপন্যাসের হরমুজ মিয়া একজন মুসলিম লীগার। সে মুসলিম লীগের নেতার নির্দেশে সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লীগের লোকদের এবং হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ও দোকান চিনিয়ে দিয়েছে। নিজেদের নিরাপদে রাখার জন্য রাজাকাররা কাজ করেছে অন্যায়কে অন্যায় জেনেও। হরমুজ মিয়াদের মতো দেশীয় শত্রুদের সহায়তার কারণেই পাকিস্তানি শত্রুরা এত সহজে বাঙালিদের অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত করতে সাহস করেছিল। রাজাকারদের সহায়ক ব্যক্তিরা বেশির ভাগ কাজ করেছে ন্যায়-অন্যায়বোধ না থাকার কারণে। এদের বেশিরভাগ মানুষ দেখা যায় অশিক্ষিত-মূর্খ শ্রেণির। 'দুই সৈনিক' উপন্যাসের হাজী মখ্‌দুম মৃধার ভৃত্য মনা। বয়স পনের মতো হবে। মৃধার আশ্রয়েই থাকত। মৃধার বাড়িতে মিলিটারিরা আসলে তাদের আপ্যায়নে সে সহায়তা করেছে। জারুমিয়া, মখ্‌দুম মৃধার গ্রামেরই ছেলে। পাকসেনাদের আপ্যায়নে সে ও সহায়তা করেছে মৃধা পরিবারকে।

'কালো ঘোড়া' উপন্যাসে সিরাজ চেয়ারম্যানের সাথে থাকতো আফাজদ্দি। সে সিরাজ চেয়ারম্যানের গোমস্তা। আফাজদ্দির সাথে বারেক থেকেছে চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বারেক আগে রতনলালের দোকানে কাজ করেছে পরে টাকা ও ক্ষমতার লোভে চেয়ারম্যানের কাজে যোগ দেয়। টাকা ও ক্ষমতার লোভ যে মানুষের ভাতৃ-হৃদয়কে নিষ্পেষিত করে তার দৃষ্টান্ত বারেক চরিত্রটি। নয়না বিশ্বাস করে বারেকের সাথে এসেছিল চেয়ারম্যানের কাছে কিন্তু সে বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়নি বারেক। মিথ্যা কথা বলে নয়নাকে ডেকে এনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে আফাজদ্দি ও বারেক দুইজনে মিলে অনেক নির্যাতন করেছে। শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলে নয়নার লাশ বিলের মধ্যে ফেলে এসেছে। দফাদার, মুক্তিযোদ্ধা খোকার বাবা। সে মুক্তিযোদ্ধার বাবা হয়ে চেয়ারম্যানের সাথে হাত মিলায়, শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। খোকা মুক্তিবাহিনীতে গেলে দফাদার চেয়ারম্যানের কাছে বলে, 'ঐ রকম পোলার মুক ঐ আমি দেহুম না।'[৩৬]

১.৫ উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নাড়া দিয়েছিল বিশ্ববিবেককে। তার ফলে এলেন্স গিন্‌সবার্গের মতো কবি রচনা করেছিলেন 'রোড টু যশোর'-এর মতো কবিতা। হ্যারিসন এবং রবিশঙ্করের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের কনসার্ট অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল আমেরিকাসহ বিশ্ববাসীর মধ্যে। যাদের কলমের কালি রক্তের বন্যার মতো প্রবাহিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্মকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল, তারা কেউ কবি, কেউ গল্পকার, কেউ ঔপন্যাসিক, আবার কেউ নাট্যকার কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাতা। অর্থাৎ প্রথাগত যুদ্ধের পাশাপাশি যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি সৈনিকদের বিধ্বস্ত করেছে তেমনি কবি-সাহিত্যিকরাও তাদের তরবারির মতো ধারালো কলমের দ্বারা রক্তাক্ত করেছে হানাদার বাহিনীকে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে যে বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র উপস্থাপন করা

---

[৩৯] মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী, "একাত্তরের ডায়রী থেকে", *দৈনিক খবর*, ২৮ মার্চ ১৯৯০।

[৪০] ইমদাদুল হক মিলন, পৃ. ৭৬।

হয়েছে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে কোন শ্রেণি কী রূপ ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকগণ শ্রেণিগত রেখায়ণ করেননি ঠিক কিন্তু উপন্যাস রচনার প্রয়োজনে অথবা কাহিনীর বিন্যাসগত কারণে বিভিন্ন শ্রেণিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। পাকসেনারা ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পেরেছে তাদের অবস্থানস্থলের কাছাকাছি পর্যন্ত কিন্তু রাজাকাররা ছিল জালের মতন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সর্বত্র। পাকসেনারা হত্যা করেছে ত্রাস সৃষ্টি ও লাম্পট্য চরিতার্থ করার জন্য কিন্তু রাজাকারদের লক্ষ্য ছিল আপন স্বার্থ চরিতার্থ করা, পাকবাহিনীর বাহবা অর্জন ও বিকৃত ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা যা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। লাখ লাখ বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হয়ে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা।

আইবিএস-এর কয়েকটি প্রকাশনা

১৯৯১ সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত। *বাঙালীর আত্মপরিচয়*।

১৯৯২ আবদুল করিম। *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*।

২০০৯ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*।

২০১০ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বিশ শতকের বাংলা*।

২০১২ মাহবুবর রহমান সম্পাদিত। *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*। ২ খণ্ড।

২০১২ শাহানারা হোসেন। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *জাগরণ ও অভ্যুদয়*।

২০১৫ মোহাম্মদ নাজিমুল হক সম্পাদিত। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*।

২০১৫ *বাংলাদেশ চর্চা দেশে বিদেশে: সটীক গ্রন্থপঞ্জি* সিরিজ (মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা, সাহিত্য)।

1983 S A Akanda edited. *The District of Rajshahi: Its Past and Present*.

1991 Abdul Karim. *History of Bengal: Mughal Period*. 2 Volumes.

2010 Md. Shahajahan Rarhi. *Index to the Journal of IBS* (1976-2009).

2011 Shahanara Husain. *History of Ancient Bengal*: Selected Essays on State, Society and Culture.

2015 *Bangladesh Studies Home and Abroad*: *Annotated Bibliography* Series (Economics, Society, Law, Statistics, Trade and Commerce, and Education).